RANGAKATHA
(A collection of essays on humorous Folktales)
by Birendranath Bhattacharya

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক
অব্যয় লিটারারি সোসাইটির পক্ষে রুণা চাকি

প্রচ্ছদ
তপনলাল ধর

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স, ৫১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

'চিত্রকল্পকথা'-র অন্যতম প্রাণপুরুষ

শিল্পীবন্ধু নিতাই ঘোষের

অ ম র স্মৃ তি তে

সূ চি প ত্র

তথ্যসূত্র

কমেডি অমনিবাস, সম্পাদনা তীর্থপতি দত্ত
কিরাতী কাহিনী সপ্তক, নলিনীকুমার ভদ্র,
খুশির খেয়া, কলিকাতা পৌরনিগম প্রকাশনা
গল্পসমগ্র (অখণ্ড), শিবরাম চক্রবর্তী
গোপাল ভাঁড়-রহস্য, সম্পাদনা এন. তালুকদার
টুনটুনির বই, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি
টেনিদা সমগ্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঠাকুরমার ঝুলি, ভাষ্যকার
দীনবন্ধু মিত্রের রচনাবলী, সম্পাদনা ক্ষেত্র গুপ্ত
নাটক সমগ্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়
বাংলার লোককথা, মহম্মদ আয়ুব হোসেন
বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইন্‌ডেক্স, দিব্যজ্যোতি মজুমদার
বাংলার লোকসাহিত্য (৪র্থ খণ্ড), আশুতোষ ভট্টাচার্য
বীরবলের গল্প, সুশীলকুমার দাশগুপ্ত
মধুসূদন রচনাবলী, সম্পাদনা ক্ষেত্র গুপ্ত
রুশদেশের উপকথা, সম্পাদনা পাভেন্তসেভা
লোককাহিনির দিক-দিগন্ত, আব্দুল হাফিজ
লোকশ্রুতি ১, সম্পাদনা আশুতোষ ভট্টাচার্য
লোকসাহিত্য (২য় খণ্ড), আশরাফ সিদ্দিকী
সমগ্র শিশুসাহিত্য : সুকুমার রায়, সম্পাদনা সত্যজিৎ রায়
সাঁওতাল লোককথা, পরিমল হেমব্রাম
সাঁওতালী লোককথা, নন্দলাল ভট্টাচার্য

মুখবন্ধ

বহুকাল আগে থেকেই লোককথার জগতে রঙ্গকথা একটি বিশেষ মর্যাদার আসন পেয়ে এসেছে। রঙ্গকথা যে এই বিশেষ মর্যাদালাভে যোগ্যতম তা না বললেও চলে। দেশান্তরে পাড়ি জমাবার ঝোঁক অল্প-বিস্তর সব ধরনের লোককথারই থাকে, তবু রঙ্গকথার চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা যেন অতুলনীয়। জনপ্রিয়তার নিরিখে তাবৎ লোককথার মধ্যে রঙ্গকথাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

রঙ্গকথার জনপ্রিয়তা-রহস্য উদ্‌ঘাটনে আমাদের কষ্ট করে দেশভ্রমণে বেরোতে হয় না। পাড়তে হয় না কোন তত্ত্বকথাও। নিজের চোখ-কানকে খুলে রেখে নিজের মনকে শুধালেই এ-রহস্য উন্মোচিত হয়।

দুঃখীজন একাই তার দুঃখের বোঝা বহন করে বেড়ায়। উল্টোদিকে, সুখীরা কখনো একা থাকতে চায়না। কারো কাছে কোনো দুঃসংবাদ শুনলে আমরা বিহ্বল বোধ করি। এক ধরনের সহমর্মিতাও হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে পোষণ করি, কিন্তু প্রকাশ্যে তা প্রচারে কুণ্ঠিত হই। অথচ প্রিয়জনের কাছ থেকে শুভ সংবাদ এলে আমরা যারপরনাই বিগলিত হই, যার বর্হিপ্রকাশ ঘটে সংবাদের তারতম্য অনুসারে আমাদের মুখাভাসে — মুচকি হাসি, কাষ্ঠ হাসি, অট্ট হাসি, মিষ্টি হাসি ইত্যাদি রকমারি হাসিতে।

ইদানীং শুনতে পাই, প্রাণভরে হাসতে পারলেই নাকি দেহে কোনো জটিল রোগ বাসা বাঁধতে পারে না। পাড়ায় পাড়ায় লাফিং ক্লাবের হিড়িকও পড়ে গেছে বেশ। প্রাচীনেরা কিন্তু হাসি-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অনেককাল আগেই। তাঁদের চিন্তাক্লিষ্ট মন চাঙা করার জন্য একদা তাই রাজা-রাজড়ারা রীতিমতো গাঁটের কড়ি খরচা করে ভাঁড়-বিদূষক পুষতেন, যাঁদের কাজই ছিল হাসি-মস্করা করে ক্লান্ত রাজার মনে পুলক জাগানো।

শুধু কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবারেই নয়, বাংলার হাটে-বাটে-ঘাটে এই কিছুকাল আগেও, এক শ্রেণীর ভাঁড়ের দেখা মিলত যাঁরা গৃহস্থের ঘরের চাল-ডাল বা সামান্য অর্থের বিনিময়ে সাধারণ মানুষের মনে হাসি ফুটিয়ে তুলতেন।

আকারে কোন দেশের রঙ্গকথাই তেমন বৃহৎ নয়, তবে প্রকারে বৈচিত্র্য অবশ্যই আছে। কত না তাদের নামের বাহার, কতই না তাদের রঙ্গভেদ। ইংরেজিতে যখন আমরা হিউমারাস অ্যানিকডোটস বলি, নিশ্চয় তখন তাকে জেস্টস বা জোকস বা মেরি টেলস বা নামস্কাল টেলস ভাবিনা। মেরি টেলস যদি সাধারণভাবে হাসির গল্প হয় (যাতে পশুপাখিরও মুখ্যভূমিকা নিতে আপত্তি নেই, তবে তাদের আচরণ হতে হবে মনুষ্যবৎ) তাহলে জোকস বা জেস্টস হচ্ছে হালকা হাসির গল্প। নামকরণ থেকেই মালুম

হয় নামস্কাল টেলস হল বোকা মানুষের গল্প (এখানেও পশুপাখি আসতে পারে. তবে মানবিকগুণ সহ)।

বাংলাভাষায়ও হাসির গল্পের হরেক নাম। কখনো সে খোশগল্প, কখনো রসকথা, কখনো বা কৌতুককথা। কৌতুককথার মধ্যে আবার ব্যঙ্গ-শ্লেষকথাও এসে পড়ে, যদিও তা মূলত আধুনিক সাহিত্যের উপাদান। চুটকিও কখনো কখনো রঙ্গকথার উপাদান হতে পারে।

ইংরেজি-বাংলায় যত নামেই ডাকা যাক না কেন, আমি কিন্তু উদার মনে সব শ্রেণীর রঙ্গকথাকেই এ-সংকলনে স্থান দিতে চেয়েছি। তদুপরি চুরি করার কাহিনি, ধাঁধা-ছড়া ইত্যাদিতেও ঢুঁ মেরেছি, হাসির খোরাক যদি সেসবে মেলে।

খুব একটা সযত্নপ্রয়াসে না হলেও, রঙ্গকথার বিষয়ানুগ শ্রেণীকরণের ব্যাপারটি কথায়-কথায় ইতিমধ্যেই আমি সেরে ফেলতে পেরেছি বোধ হয়। বিষয়ানুগ শ্রেণীকরণের ধারাটি লোককথায় প্রাচীনতম এবং অনেক লোককথাবিদের কাছে এখনো গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। আর একটি ধারাও অবশ্য আছে—টাইপ ও মোটিফভিত্তিক শ্রেণীকরণ। প্রথমটির তুলনায় এ পদ্ধতিটি আধুনিক।

লোককথার এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এই যে তার আবেদন নিছক ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত। আঞ্চলিক আবার সার্বজনিক। লোককথায় টাইপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মার্কিন লোককথাবিদ স্টিথ টমসন (১৮৮৫-১৯৭৬) বলেছেন, 'টাইপ হল পুরুষানুক্রমে লব্ধ স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী কোন কাহিনি, যা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন লোককথায় টাইপ থাকে একটাই, কিন্তু তার মোটিফের সংখ্যা একাধিক হতে পারে (দ্য ফোকটেল, স্টিথ টমসন, পৃ. ৪১৫)।'

লোককথায় মোটিফের সংজ্ঞা দিয়েছেন টমসন সাহেব এই ভাষায়, 'মোটিফ হল কোন কাহিনির ক্ষুদ্রতম উপাদান ঐতিহ্যের মধ্যে যার বেঁচে থাকার ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা অর্জন করতে গেলে কাহিনির অসাধারণ এবং আকর্ষণীয় কিছু গুণ থাকতে হবে (তদেব, পৃ. ৪১৫-৪১৬)।'

লোককথায় টাইপ শনাক্তকরণ সম্ভব হলে, যাঁরা লোককথা গবেষণায় রত, তাঁদের কাজ অনেক সোজা হয়ে যায়। লোককথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন ঐক্য আছে, তা সহজেই বোঝা যায়। টাইপভিত্তিক শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে যে কোনো লোককথাকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয় কাহিনিগত লক্ষণ-বর্ণনাসহ। লোককথার গবেষক কোন একটি লোককথা সম্পর্কে কিছু বোঝাতে গেলে, কাহিনি-চুম্বক না বলেও শুধুমাত্র লোককথাটির টাইপসংখ্যা উল্লেখ করলেই সমস্যার সমাধান হয়। টাইপভিত্তিক শ্রেণীকরণের আগে এটা কিন্তু সম্ভব ছিলনা।

কথাগুলি যত সহজে বলে ফেললাম, আদপে কিন্তু তত সহজ নয়। টমসন সাহেব টাইপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, একটি লোককথায় একটি মাত্র টাইপ থাকে (এখানে আমি একাধিক টাইপ সমন্বিত লম্বা কাহিনির কথা পাড়ছিনা)। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় একটি লোককথায় একাধিক টাইপ উঁকি মারে। সেই একাধিক টাইপের মধ্যে

কাহিনির স্বার্থে ঠিক কোন্‌টির গুরুত্ব সর্বাধিক তা নির্ণয় করা মোটেই সহজ কাজ নয়। তাবড় তাবড় লোককথাবিদ এসব ক্ষেত্রে বহুবার ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। এই বাস্তব সমস্যাটি মাথায় রেখেই জরুরি হয়ে উঠল লোককথায় অন্য একটি শ্রেণীকরণের, যার নাম মোটিফভিত্তিক শ্রেণীকরণ।

লোককথায় টাইপ এবং মোটিফভিত্তিক শ্রেণীকরণের প্রয়াস বস্তুত ফিনিশ লোককথাবিদ অ্যান্টি আর্নের (১৮৮৭-১৯২৫) হাত ধরে। তিনিই প্রথম আমাদের টাইপ ও মোটিফকে লোককথায় আলাদাভাবে দেখাতে শিখিয়েছিলেন। যে বইটি লিখে তিনি এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেন তার নাম 'ভার্জিকনিসে' (১৯১০)। 'ভার্জিকনিসে'-য় আর্নে টাইপের ভিত্তিতে সমগ্র লোককথাকে মোটা দাগে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন—পশুকথা, সাধারণকথা এবং রঙ্গকথা।

পরবর্তীকালে টমসন আর্নের বইটি আমূল পরিমার্জনা করে 'দ্য টাইপ অব ফোকটেল' নামে প্রকাশ করেন (১৯২৮)। উল্লেখযোগ্য এই যে টমসনের সম্পাদনার ফলে মূল বইয়ের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য বর্জিত হলেও, লোককথার শ্রেণীকরণে রঙ্গকথা কিন্তু যথারীতি তার পৃথক অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে।

লোককথার শ্রেণীকরণে কেবল টাইপভিত্তিক শ্রেণীকরণ মোটেই যথেষ্ট নয় এই বিবেচনায় টমসন সাহেব অতঃপর শুধু মোটিফভিত্তিক একটি স্বতন্ত্র সূচির কাজে হাত দেন। নির্দিষ্ট কিছু বর্ণমালার সাহায্যে বিন্যস্ত হতে থাকে সেই অভিনব মোটিফসূচি। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হতে থাকে সেই মোটিফসূচি এবং ১৯৫০ থেকে ১৯৫৮-য় ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সেই সূচিগুলি একত্রিত হয়ে ৬ খণ্ডে গ্রন্থরূপ লাভ করে, যার নাম 'মোটিফ ইনডেক্স অব ফোক লিটারেচার'। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত নমুনা- লোককথার সাহায্যে প্রস্তুত সেই বিশাল সূচিগ্রন্থাবলিতে 'এক্স' বর্ণের ছত্রতলে রঙ্গকথা কিন্তু যথারীতি একটি স্বতন্ত্র আসন লাভ করে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে অ্যান্টি আর্নের সতীর্থ আর এক ফিনিশ লোককথাবিদ ওয়াল্টার অ্যান্ডারসন যে দু'টি লোককথাকে 'ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি'-তে বিশ্লেষণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন (সম্রাট ও যাজক : টাইপ—৯২২ এবং বুড়ো হিল্ডব্রান্ড : টাইপ—১৩৬০সি) সেই দু'টি কাহিনিও কিন্তু বিষয়ানুসারে রঙ্গকথারই অন্তর্গত।

জার্মান লোককথাবিদ জোহানেস বোল্ট (১৮৫৮-১৯৩৭) তাঁর লেখালেখির প্রথমদিকে, ষোলো শতকের জার্মান লোককথা থেকে রঙ্গকথা চয়ন করে, উপযুক্ত টীকা-টিপ্পনী দিয়ে 'হাস্যরসাত্মক কাহিনি'-র একটি সংকলন প্রকাশ করেন। ঐ সংকলনে তিনি বিভিন্ন দেশের সমধর্মী রঙ্গকথার সঙ্গে তাঁর সংগৃহীত রঙ্গকথার তুলনামূলক আলোচনা করেন। কেবল রঙ্গকথা নিয়ে স্বতন্ত্র সংকলনের প্রথম দৃষ্টান্ত সম্ভবত এটাই।

পশ্চিমবঙ্গে বসে পূর্ববঙ্গের শৈশবস্মৃতি থেকে বাংলা ভাষায় লেখা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির (১৮৬৭-১৯১৫) জনপ্রিয় গ্রন্থ 'টুনটুনির বই' (১৯১১)। আলাদাভাবে গ্রন্থে কোথাও উল্লিখিত না হলেও, আসলে এটি একটি উৎকৃষ্ট রঙ্গকথা-সংকলনই।

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিবিদ আশরাফ সিদ্দিকী গত শতকের ষাটের দশকের গোড়ার দিকে 'বাঙালীর হাসির গল্প' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন (মাহেন, ফাল্গুন ১৩৬৭)। সিদ্দিকীসাহেব ঐ প্রবন্ধটিতে ইয়োরোপ-আমেরিকার লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা রঙ্গকথার একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ব্রতী হন। এই ধরনের প্রয়াস তাঁর আগে কিংবা পরে আর কেউ করেছেন কিনা আমার জানা নেই।

আমার লেখা 'রঙ্গকথা' সাধারণভাবে বাংলার লোককথাভুক্ত হাসির গল্পের একটি সংকলনমাত্র, তবে এর বিস্তার প্রথানুগ পথে নয়। বিষয়ের খেই ধরে রঙ্গকথাগুলি এখানে যেন নিজেরাই পথ-পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছে। এই অধম সংকলকের ভূমিকা এখানে অনেকটা পর্যটকের কাছে গাইডের মতো। বিপথগামীকে ঠিক পথ সমঝে দেওয়া যেমন গাইডের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে তেমনি আমারও লক্ষ্য এ-সফরে রঙ্গকথা যেন পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়ে। চলতি পথে একটু-আধটু টীকা-টিপ্পনী? সে তো গাইডের এক্তিয়ারেই থেকে যায়।

প্রাসঙ্গিক রঙ্গকথাগুলির অবয়বে যথাসাধ্য টাইপ নির্ণয় করা হলেও, পারতপক্ষে মোটিফ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়নি। হ্রস্বায়তন হলেও, একটি রঙ্গকথায় প্রায়শ বহুসংখ্যক মোটিফ নিহিত। লক্ষণ-বর্ণনাসহ অতগুলি মোটিফ রঙ্গকথার অবয়বে অন্তর্ভুক্ত করলে গল্পপাঠের মজাটাই মাঠে মারা যেতে পারে (কয়েকটি স্থলে টাইপনির্ণয়ে অপারগ হয়ে অবশ্য মোটিফ নির্ণয়েই ক্ষান্ত হয়েছি)। যাঁরা লোককথায় মোটিফ নিয়ে উৎসাহী তাঁদের কথা মাথায় রেখে পরিশিষ্ট অংশে সংকলিত রঙ্গকথাগুলির দেড় শতাধিক লক্ষণ-বর্ণনাসহ বর্ণ ও সংখ্যানুক্রমিক একটি বিস্তৃত পঞ্জি প্রস্তুত করে দিয়েছি। এ-পঞ্জি অনুসরণ করলেই সহৃদয় পাঠক আশা করি বুঝে নিতে পারবেন কোন্ কোন্ গল্পের কোথায় কোথায় কী-কী মোটিফ নিহিত আছে। যাঁরা গল্পের মোটিফ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতে নারাজ, মোটিফসূচির এই পৃথক বিন্যাসে তাঁরাও নিজেদের ভারাক্রান্ত বোধ করবেন না, পরিশিষ্টের এই অংশটি অনায়াসেই বর্জন করতে পারবেন। কিন্তু ভারাক্রান্ত হয়েও যদি কোন রসিক পাঠক মোটিফসূচির রহস্যভেদে তৎপর হন তবে এটুকু হলফ করে বলতে পারি, আখেরে তাঁর লাভ বৈ ক্ষতি হবে না কোন। আর্নে-টমসনের টাইপসূচি এবং টমসন সাহেবের মোটিফসূচি মিলিয়ে এ সংকলনের রঙ্গকথাগুলি অধ্যয়ন করলে পাঠকটির কাছে বিশ্ব লোককথার অমূল্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত হবে। টাইপসূচি যদি লোককথার বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে, তবে মোটিফসূচি সরবরাহ করে অন্দরমহলের গোপন তথ্য। দু'টি সূচির নিবিষ্ট পাঠে পাঠকের কাছে বিপুলা বসুধা হয়ে ওঠে নিকটাত্মীয়। টাইপ আর মোটিফসূচি কোনো একটি লোককথার বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গকথাই বলেনা, পরন্তু বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার অনুরূপ লোককথারও অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরে। এবং এই মহতী প্রজ্ঞা অর্জন করা সম্ভব দু'টি সূচির নিবিষ্টপাঠে। চাইলে ঘরে বসেই এই বিশ্ব-পরিক্রমা সেরে ফেলা যায়।

সংকলনভুক্ত রঙ্গকথাগুলির তথ্যসূত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। সূত্রগ্রন্থ হিসেবে উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই' সাহিত্যিক লোককথার উদাহরণ হতে পারে যদিবা,

কিন্তু গোপাল ভাঁড়-বীরবল-মোল্লা নাসিরুদ্দিনের রঙ্গকথা-সংকলনরূপে জনৈক এন. তালুকদারের 'গোপাল ভাঁড় রহস্য' অথবা সুশীলকুমার দাশগুপ্তের 'বীববলের গল্প' কিংবা তীর্থপতি দত্ত সম্পাদিত 'কমেডি অমনিবাস' কি সত্যিই তেমন নির্ভরযোগ্য?

স্পষ্ট করেই বলি, তথ্যগ্রন্থগুলির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আমি আদৌ ভাবিত হইনি। আমার বলার কথা এই যে যাঁদের আশ্রয় করে এইসব রঙ্গকথা গড়ে উঠেছে, তাঁরা প্রায়শই সেসব কাহিনিতে উপলক্ষ মাত্র, আসলে ঐসব কাহিনি মূলত লোককথাই।

এ-সংকলনে বাংলা লোককথার প্রতিতুলনায় নিষাদ ও কিরাত উপজাতির আদিবাসী রঙ্গকথা প্রসঙ্গত এসে পড়েছে। আমার বিবেচনায় বাংলার লোককথায় আদিবাসী লোককথার, বিশেষত সাঁওতালি লোককথার, প্রভাব দুর্মর। এই উল্লেখ বস্তুত প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরই সামিল।

আরো একটি কথা। এ গ্রন্থে বাংলার লোককথা বা বাংলাদেশের লোককথা বলতে আমি রাজনৈতিক বিভাজনকে গুরুত্ব না দিয়ে পূর্বতন যুক্তবঙ্গকেই বোঝাতে চেয়েছি। সংকলিত রঙ্গকথাগুলির টাইপ ও মোটিফ নির্ণয়ে ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদারের 'বাংলা লোককথার মোটিফ ও টাইপ ইনডেক্স' এবং ড. আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোকসাহিত্য (২য় খণ্ড)' বই দু'টি বিশেষ কাজে লেগেছে। 'বাংলা রসসাহিত্য : লোকরঙ্গকথা'-য় আমি কেবল প্রয়াত সাহিত্যিকদেরই স্মরণ করেছি, জীবিতদের নয়। স্মৃতি থেকে কয়েকটি রঙ্গকথা উদ্ধার করে দিয়েছেন আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী মঞ্জু ভট্টাচার্য। কয়েকটি খুঁটিনাটি তথ্য জানিয়ে বাধিত করেছেন সাহিত্যিক ড. বীরেন্দ্র দত্ত। মার্কিন লোককথাবিদ্ স্টিথ টমসনের জন্ম-মৃত্যুর সন আমার জানা ছিলনা। প্রীতিভাজন ড. প্রভাতকুমার দাসের তৎপরতায় নিউইয়র্ক থেকে এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু জুগিয়ে দিয়েছেন শ্রীমতী রীনা রায়। শ্রীমতী রায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার আগের বইগুলির মতো এ-বইটিরও পরিচিতি-লিখন থেকে প্রুফ দেখা, মুদ্রণ সৌষ্ঠব ইত্যাদি সব ব্যাপারেই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন ড. দাস। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর শুভ প্রচেষ্টাকে খাটো করতে চাইনা। এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ 'অন্য নিষাদ', 'অব্যয়' এবং 'মাঝি' পত্রিকায় প্রকাশিত। সংশ্লিষ্ট সম্পাদকবৃন্দকে ধন্যবাদ। অলমতি বিস্তারেণ।

৯/১/১এ, লক্ষ্মীদত্ত লেন **বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**
কলকাতা ৭০০০০৩

রঙ্গকথা

তাঁর 'কৌতুকহাস্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে অসংগতিই কৌতুকরসের উৎস। উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, 'তৃষ্ণার্ত হইয়া চাহি এক ঘটি জল, তাড়াতাড়ি এনে দিল একখানা বেল'—তৃষ্ণার্তের কাছে জল আনার বদলে বেল আনার মধ্যে রয়েছে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিতে অসংগতি, এবং সেইহেতু কৌতুকরস।

একই প্রবন্ধের পরবর্তী কোন অংশে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের রসবিচারে 'মাত্রা'-র প্রশ্নও তুলেছিলেন। উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন — একটা মোটা লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, সে যদি পা পিছলে সামান্য আঘাত পায় আমরা তখন কৌতুক অনুভব করি। কিন্তু আঘাত গুরুতর হলেই তা করুণ রসে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথ যাকে কৌতুকরস বলেছেন নামান্তরে তা-ই রঙ্গরস। বস্তুত 'মাত্রা'-র তারতম্যে সাহিত্যজগতে অনেক অঘটনই ঘটতে পারে। তবে অঘটনপটীয়সী মাত্রা শিক্ষা-সংস্কৃতি-রুচি ইত্যাদি বিবিধ জটিল বিষয়ের মুখাপেক্ষী। একজন গ্রাম্য মানুষের মাত্রাজ্ঞান একজন শহুরে মানুষের মত নয়। আবার কোন শহুরে শিক্ষিত লোকের মাত্রাজ্ঞান সেই শহরেরই এক কারখানার নিরক্ষর শ্রমিকের মাত্রাজ্ঞানে বিস্তর ফারাক। গ্রামের মানুষ যে রঙ্গকথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়ে, শহরের শিক্ষিত লোক তাতে অশ্লীলতার গন্ধ পেয়ে নাক সিটকোয় এমন তো আকছারই ঘটে থাকে!

লোককথার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো বোধ হয় পশুকথা। অতএব পশুকথা দিয়েই শুরু হোক এ-আলোচনা :

এক যে ছিল টোনা। তার ছিল এক টুনি। টোনা-টুনির মধ্যে যেমন গলাগলি তেমনি খুনসুটি।

ওদের বাসা ছিল এক বটগাছের কোটরে। জোরে বাতাস বইলে বা তেড়ে বৃষ্টি এলে, ওরা তাড়াতাড়ি বটগাছের তলায় একটা ভাঙামন্দিরের চত্বরে চলে আসে।

তখন পৌষমাস। শীতের আদুরে রোদ পোয়াতে পোয়াতে টুনি বললে টোনাকে, 'আহা কতদিন যে পিঠে খাই না।'

টোনা বলে, 'আজই কর না।'

টুনি বলে, 'বললেই হল? আঁচ পাব কোথায়, চিনি পাব কোথায়- -কোথায় পাব চালের গুঁড়ো, কোথায় পাব দুধ?'

টোনা বললে, 'ওসব তোর ভাবতে হবে না; সব কিছু আমি জোগাড় করে আনছি।'

সত্যিসত্যিই টোনা এরপর ঘুরে ঘুরে এর-তার কাছে চেয়ে-চিন্তে পিঠে তৈরির উপকরণগুলো একে একে জোগাড় করে ফেলল। মায় রান্নার হাঁড়িকুড়ি আর আগুন পর্যন্ত।

টুনি তো বেজায় খুশি। বললে, 'টোনা, তুমি তো ভারী করিৎকম্মা। সবই গুছিয়ে এনেছ, কিন্তু কাঠ তো আননি? কাঠ না পেলে রান্না হবে কি করে?'

'এ আর কি কঠিন কাজ, তুই কিছু ভাবিস নে—আমি যাচ্ছি আর আসছি'—এই বলে টোনা তখুনি ফের উড়ে গেল।

টোনা গেল কাঠ আনতে বাঘমামার বাগানে। মামা তখন নাক ডাকিয়ে নিদ্রায় গেছেন। টোনা চুপিচুপি কাঠ জোগাড় করতে লাগল। শুকনো কাঠ চাই, নইলে তাড়াতাড়ি জ্বলবে কেন? ডাল থেকে একটা কাঠ ভাঙতে গিয়ে বেশ জোরে শব্দ হল আর সেই শব্দে বাঘমামার কাঁচা ঘুম গেল ভেঙে। বিরক্ত বাঘ হাঁক দিল, 'কে রে ওখানে শব্দ করে অসময়ে আমার ঘুম ভাঙালি?'

টোনা কাচুমাচু গলায় বললে, 'আমি টোনা। তোমার ভাগ্নে-বৌয়ের পিঠে খাওয়ার সাধ হয়েছে, তাই কাঠ নিতে এসেছি।'

মামা রেগে উঠেছিল, কিন্তু পিঠের কথায় নরম হল। বলল, 'আমার জন্যে ক'খানা পিঠে রাখিস, আমি বিকেলের দিকে যাব।'

কাঠ জোগাড় করে এসে টোনা টুনিকে বাঘমামার পিঠে খাওয়ার আর্জি জানাতে ভুল করল না। তারপর মেতে উঠল পিঠে তৈরির আয়োজনে। টোনা এগিয়ে দেয় উনুন, টুনি পিঠে ভাজতে থাকে। এইভাবে এক সময় পিঠে তৈরির পর্ব শেষ হল। এবার শুরু হল টোনা-টুনির পিঠে খাওয়ার পালা।

টুনি বলে টোনাকে, 'তুমি আগে শুরু কর।'

টোনা বলে, 'না, আগে তুই খা!'

শেষে রফা হল, দু'জনেই একসঙ্গে খাবে। খেতে খেতে টোনা বললে, 'দারুণ খেতে।' টুনি বললে, 'আরও খানচারেক নাও।' টোনা বললে, 'নিতে পারি এক শর্তে, তুইও যদি চারটে নিস।'

এইভাবে পিঠে খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। পিঠেও শেষ; খাওয়াও শেষ। শুধুমাত্র একটা পোড়া পিঠে পড়ে আছে। টোনার হঠাৎই মনে পড়ল বাঘমামার কথা। তার আসার তো সময় হল। এখন উপায়? সে ভয়ে ভয়ে টুনিকে শুধায়, 'পিঠে তো সব শেষ, এখন মামা এলে দিবি কি?'

টুনি লজ্জা পেয়ে বলল 'ছি-ছি, আগে বলবে তো।' টোনা বলে, 'এমন পিঠেই না বানিয়েছিস যে মাথাটাই বিগড়ে গেছে।'

টুনি অন্য সময় রান্নার প্রশংসায় গলে যেত, কিন্তু এখন মনের অবস্থা ভালো নয়। সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'পিঠে না পেয়ে মামা বুঝি আমাদেরই না খায়।'

টোনা তখনও উদ্ধারের কোন পথ বাতলাতে পারেনি, তবু টুনি ভয় পাচ্ছে দেখে তাকে সাহস জোগাতে চায়, 'খাবে বললেই হল'?

'খাবে নাতো কি, আমাদের আদর করবে'? —টুনি খিঁচিয়ে ওঠে।

টোনা টুনিকে শান্ত করার চেষ্টা করে, 'তা কেন? ভেবে একটা পথ বার করতে হবে।'

ভেবে ভেবে বেচারা টোনা কোন পথ আর খুঁজে পায় না। সে টুনিকে পরামর্শ দেয়, 'চ পালাই'।

টুনি বলে, 'কোথায় গিয়ে রেহাই পাই'?

টোনা বলে, 'তোর পিঠে খাওয়ার কথাটাই আমাদের কাল হল'।

টুনি বলে, 'মোটেই না, কাল হল তোমার নোলা—ষোলোটা খেয়েও শানায় না'।

টোনা বলে, 'তুই-ই জোর করে খাওয়ালি'?

টুনি বলে, 'আমি না হয় তোমায় জোর করেছি, কিন্তু আমাকে খাবার জন্য জোর করলে কে'?

টোনা-টুনি নিজেদের মধ্যে যখন এই ধরনের খুনসুটি চালাচ্ছে তখন বাঘমামা এসে বাইরে থেকে হুংকার দিল, 'কইরে টোনা কইরে টুনি, কোথায় গেলি তোরা?'

মামার গলার আওয়াজ পেয়ে টোনা বলে টুনিকে, 'আমরা কুলুঙ্গির ঐ হাঁড়ির মধ্যে লুকোই।'

টুনির তখন আর ভাববার মত মনের অবস্থা নেই, টোনার পরামর্শে ওরা দু'টো মিলে কুলুঙ্গির হাঁড়ির মধ্যে লুকোলো।

এদিকে বাঘমামা ডেকে ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে, রাগে গরগর করতে করতে নিজেই চলে এল ভাঙা মন্দিরের চত্বরে। এসে দেখে, কেউ কোথাও নেই। একটা পোড়া পিঠে কেবল মেঝেতে পড়ে আছে। সেটা খেতে গিয়ে 'অ্যাক থুঃ' শব্দে মাটিতে ফেলে দিল সে। টোনা-টুনির ওপর রাগ ওর আরও বেড়ে গেল। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল কুলুঙ্গিতে ঝোলা হাঁড়িটার ওপর। ওর মনে হল টোনা-টুনি নিশ্চয় হাঁড়িতে ওর জন্য পিঠে রেখে কাছে কোথাও বেরিয়েছে। ও তখনই সেই হাঁড়ি নিয়ে হাঁটল বাগানের দিকে। বাগানে বসে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া যাবে।

ওদিকে হয়েছে কি, টোনার ঠাণ্ডা লেগে খুবই সর্দি হয়েছে। সে অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারল না। বাঘের পিঠে চড়ে যেতে যেতে প্রচণ্ড শব্দে হেঁচে ফেলল। হাঁড়ির ভেতর থেকে সে-শব্দ দ্বিগুণ জোরে বেরিয়ে এল। বাঘমামা ভাবল কোন শিকারি বোধ হয় তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে। সে তখন পিঠ থেকে পিঠের হাঁড়ি নামিয়ে, পড়ি-কি-মরি দৌড়। আর এই সুযোগে টোনা-টুনিও হাঁড়ি থেকে উড়ে পালায়। এ-কাহিনির টাইপ—৭৫ : দুর্বলকে সাহায্য করা।

চড়াই আর চড়াই গিন্নির পিঠে খাওয়ার কাহিনির সঙ্গে এই কাহিনি মোটামুটি

একই রকম। তবে তফাৎ এই, চড়াই সে কাহিনিতে টোনার চেয়ে অনেক বেশি ঘোড়েল। সে গিন্নির অনুরোধে পিঠে তৈরির মালমশলা বাগিয়ে নেয় বাঘমামাকে সামনে রেখে। পিঠে খাওয়ার গরজে বাঘ সেখানে স্বয়ং হাটে যায় পিঠের উপকরণ আনতে। তাকে দেখে দোকানিরা পশরা ফেলে পালায়। সেই ফাঁকে চড়াই চালগুঁড়ো-গুড়-ময়দা ইত্যাদি পিঠে তৈরির যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে এবং বাঘের পিঠে চাপিয়েই ঘরে নিয়ে আসে।

পিঠে খাওয়ার ব্যাপারেও টোনা-টুনির সঙ্গে চড়াইদের ফারাক বেশ স্পষ্ট। আগের কাহিনিতে লোভের বশবর্তী হয়ে টোনা-টুনি সব পিঠে খেয়ে ফেলেছিল। বাঘমামার জন্য ভাগ রাখতে ভুলেছিল বলে তাদের মনে অনুতাপের সীমা ছিল না। কিন্তু এ-কাহিনিতে চড়াই আর তার গিন্নি ভালো পিঠেগুলো ভেবেচিন্তে নিজেরা খেয়ে বাঘমামাকে বোকা বানাবার জন্য ফেলে রেখেছিল পোড়া অসিদ্ধ আর ভাঙা পিঠেগুলো।

পিঠে খেয়ে বাঘমামার কী দশা হয় তা দেখতেই চড়াই আর তার গিন্নি হাঁড়ির মধ্যে লুকিয়েছিল, টোনা-টুনির মত আত্মরক্ষার তাগিদে নয়। পিঠে খাওয়া-রত বাঘমামার দুরবস্থা দেখে তারা হাঁড়ির মধ্যে হাসতে থাকে, হাসতে হাসতেই চড়াইয়ের হাঁচি পায়। সে হাঁচিতেই ঝুলন্ত হাঁড়িটা বাঘের পিঠে পড়ে। বাঘ হকচকিয়ে যায়, এবং ভয় পেয়ে ছুটতে থাকে। অর্থাৎ চড়াইয়ের হাঁচিই এখানে বাঘের ভয়ের একমাত্র কারণ নয়, চড়াইয়েব হাঁচি আর হাঁড়ির পতন—এই যুগপৎ ঘটনাই বাঘের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে। লেখাবাহুল্য, এ-কাহিনির টাইপও আগেরটির মতই—৭৫ : দুর্বলকে সাহায্য করা।

পশুকথার এই পিঠে খাওয়ার ব্যাপারটি বাংলার লোককথায় বিস্তর ঘরোয়া কাহিনিতে ভর করতে দেখা যায়। অবশ্য সেসব কাহিনির টাইপ প্রায়শই ভিন্নতর। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে সেই বোকা-বুকির কথা :

এক বোকা বর তার বৌকে বললে, 'বৌরে, আমার পিঠে খেতে বড় সাধ হয়।'

বুকি বৌ বললে, 'বেশ তো, পিঠে তৈরির জিনিসপত্র এনে দাও, আমি বানিয়ে দিচ্ছি।' বোকা বর ঘুরে ঘুরে পিঠে তৈরির উপকরণ জোগাড় করে। বৌ-ও সারা দুপুর ধরে পিঠে বানায়।

এবার খাবার পালা। বোকা বৌ খাওয়ার আগে একটা শর্ত জুড়ে দেয় : যে আগে কথা কইবে, সে পিঠে খেতে পাবে না, অতএব পিঠে খেতে বসে বোকা-বুকি নিশ্চুপ বসে রইল।

ওদের ঐভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে দেখে পড়শিরা ভাবে দু'জনেই বুঝি পটল তুলেছে। পড়শিরা 'বল হরি' বলে দু'জনকে খাটিয়ায় তোলে। তবু দু'জনে কথা বলে না। শ্মশানে এনে চিতা সাজানো হয়। তবু দু'জনের কথা নেই। আগুনের তাপে দেহ পুড়ে যাচ্ছে। তখন বোকা বুকিকে তোষামোদের সুরে বলে, 'বৌ, তুই বরং তিনটে খা, আমি একটা।'

বোকার এই কথা শুনে পড়শিরা ভাবে ভূতে নিশ্চয় কথা বলছে। তারা তখন শ্মশান ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে। এ-কাহিনির টাইপ—১৩৫১ : নিশ্চুপ থাকার প্রতিযোগিতা। পিঠে খাওয়া ছাড়াও এ-কাহিনির আর এক বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এই যে, ঘটনাক্রমে বোকা-বুকি এখানে পড়শিদেরও বোকা বানিয়ে ছেড়েছে।

পিঠে খাওয়া নিয়ে আরও একটা ঘরোয়া লোককথা এখানে বলা যেতে পারে। এটাও এক বোকা তদুপরি ব্রাহ্মণের কাহিনি। বৌটি তার অবশ্য মোটেই বুকি নয়, বরং বিশেষ বুদ্ধিমতী, বেজায় দজ্জাল আর বৈষয়িকও।

ঘরে চাল বাড়ন্ত। ব্রাহ্মণের সেদিকে হুঁশ নেই। অথচ লোভ আছে ষোল আনা। সে বৌকে শুধায়, 'আজ কি তুই পিঠে বানাবি?'

ব্রাহ্মণের কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে বামনি। ঘরের কোণে রাখা ঝাঁটা নিয়ে সে ব্রাহ্মণকে মারতে যায়। মুখে চলে অকথ্য গালিগালাজ।

মনের দুঃখে ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগী হয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হয় এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে। সেখানে সে পেটভরে খায়-দায় আর মন দিয়ে পড়াশোনা করে।

পড়তে পড়তে ব্রাহ্মণের একদিন মনে হয় সে মহাপণ্ডিত হয়ে উঠেছে। পুনরায় পড়াশোনায় আর প্রয়োজন নেই। সেদিনই সে সন্ন্যাসীকে কিছু না জানিয়ে, আশ্রম ছেড়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়।

বাড়ির বাইরে থেকেই ব্রাহ্মণ শোনে রান্নাঘরে কড়াইয়ে কিছু ভাজার ছ্যাক-ছ্যাক শব্দ। ব্রাহ্মণ সেখানে দাঁড়িয়ে যায়, আর ছ্যাক ছ্যাক শব্দের সংখ্যা গুনতে থাকে। এক কুড়ি এক শব্দের পর আর কোন শব্দ নেই।

ব্রাহ্মণ এবার ভালো মানুষের মত ঘরে ঢোকে। ব্রাহ্মণকে দেখে বামনি অবাক। আশ্রমে সময় মেপে খাওয়া-দাওয়া করে এই ক'মাসে ব্রাহ্মণের চেহারায় বেশ জেল্লা ধরেছে। সর্বাঙ্গে তিলক-কাটা ব্রাহ্মণ গম্ভীর গলায় বামনিকে শুধায়, 'একুশটা পিঠে ভাজা হল কার জন্য?'

বামনির চক্ষু চড়কগাছ। সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গদ্গদ কণ্ঠে বললে, 'কি করে জানলে গো?'

'হুঁ হুঁ বাবা, আমি এখন ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে পাই'—ব্রাহ্মণ বিজ্ঞের মত জবাব দিল।

পরদিন সকালেই বামনি সারা তল্লাটে রটিয়ে দিল তার স্বামীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা। লোকের ভিড় জমতে শুরু করে ব্রাহ্মণের ঘরে। গিন্নির প্ররোচনায় কারো হাত দেখে ব্রাহ্মণ ভবিষ্যৎ বলে দেয়। কারো কিছু চুরি গেলে, চোরের হদিস করে দেয়। দৈবাৎ কারো বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী মিলেও যায়। সে তখন ব্রাহ্মণের অলৌকিক শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। ব্রাহ্মণের খ্যাতি চারদিকে ছড়াতে থাকে। বৌ সেই খ্যাতির ফয়দা লুটতে থাকে।

একদিন মতি ধোপার গাধা গেল হারিয়ে। মতি ব্রাহ্মণের পায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ সব শুনল। মতি চলে গেলে, ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যে সে সারা গাঁ তন্ন তন্ন খুঁজলো, কিন্তু গাধার খোঁজ মিলল না। সন্ধের দিকে মতি খবর নিতে এলে ব্রাহ্মণ তাকে জানায়, 'ওরে মতি, আজ মা চণ্ডী জেগেছেন, আজ আর পাবিনে। কাল এসে তোর গাধা নিয়ে যাস।'

মতি চলে গেলে, ব্রাহ্মণ ভেবে অস্থির। এবার বুঝি তার জারিজুরি ধরা পড়ে যায়। চিন্তায় চোখে ঘুম আসেনা। সে আপন মনে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে।

তখন রাত নিঝুম। বাইরে কিসের শব্দ। বামনি ব্রাহ্মণকে ডেকে বলে, 'ওঠো, নিশ্চয় চোর এসেছে। রোজ পরের বাড়ির চোর ধরে বেড়াও, আজ নিজের বাড়ির চোর ধরতে হবে কিন্তু।'

ব্রাহ্মণ আর কি করে, দুর্গানাম জপ করতে করতে চোর ধরতে ঘরের বাইরে যায়, আর গিয়ে দেখে—আর কেউ নয়, মতির হারানো গাধাটা এসে অদ্ভুত শব্দ করছে। ব্রাহ্মণ আনন্দে তাড়াতাড়ি গিয়ে গাধাটার গলা জড়িয়ে ধরে। জাপ্টাজাপ্টিতে গাধার গলার বাঁধন ব্রাহ্মণের গলায় বসে গিয়ে সে এক বিশ্রী কাণ্ড! বামনি বাইরে এসে, ঐ অবস্থায় ব্রাহ্মণকে দেখে, ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। বামনির চিৎকারে পড়শিরা ভিড় করে। তারা জিজ্ঞেস করে, 'হলটা কি? অমন তারস্বরে চিৎকার করছিলে কেন?'

ব্রাহ্মণ এরই মধ্যে পরিস্থিতি সামলে নিয়েছে। বামনিও বুঝতে পেরেছে অমন চিৎকার করাটা মোটেই বুদ্ধির কাজ হয়নি। সে তখুনি ভোল পাল্টে পড়শিদের কাছে বড়াই করতে থাকে, 'আমার সোয়ামির বাহাদুরিটা তোমরা দেখলে? মাঝরাত্তিরে মতির হারিয়ে যাওয়া গাধাটা ঠিক ধরে নিয়ে এল—এতেও আনন্দে চিৎকার করব না তো আর কিসে করব শুনি?'

এটি একটি লম্বা কাহিনি। সুতরাং আপাতত ফুরোচ্ছেনা। তবে আলোচনার কাজে আর বেশি না এগুলেও চলবে। এ-কাহিনিটিকে শহুরে মানুষের কাছে অধুনা নতুন করে পরিচিত করে দিয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'তোতারাম' নাটিকায় ব্যবহার করে। এ-কাহিনির টাইপ—১৬৪১ : সবজান্তা।

কাহিনিটির প্রথমদিকে ব্রাহ্মণের পিঠে-সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গে পরের অংশের সম্পর্ক খুব শক্তপোক্ত নয়। লম্বা কাহিনির এটাই বোধ হয় বৈশিষ্ট্য। সে যাই হোক, একটা বিষয় আমাদের নজর কাড়ে। বিষয়টা হল, এই লোককথায় পিঠের সংখ্যাটি। 'একুশ' সংখ্যা বাংলা লোককথায় একটি ইন্দ্রজালিক সংখ্যা। ভাগ্যপরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। ভাগ্যপরিবর্তন এখানেও হয়েছে। একুশটি পিঠে ব্রাহ্মণের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে।

দুই মেয়ে আর তাদের ভিখিরি বাপের কাহিনি মনে পড়ে? ভিখিরি ব্রাহ্মণ গেছে ভিক্ষে জুটোতে। ঘরে দুই মেয়ে বসে আছে। বাপের জোগাড় করা ভিক্ষান্ন এলে তবেই রান্না হবে। এমন সময় এক ভিখিরি এসে চাল চায়। বড় মেয়ে বিরক্ত হয়ে

ভিখিরিকে যত ফিরিয়ে দিতে চায় ভিখিরি ততই বলে, 'এক কণা চাল যদি থাকে, তা-ই দে মা।'

বড় মেয়ে অগত্যা ভাঁড়ারে গিয়ে দেখে একটা মাত্র চালই পড়ে আছে। ভিখিরিকে তা দিতেই, সে আনন্দে আটখানা। চালটা দু'ভাগ করে ভিখিরি নিজে নেয় এক ভাগ, অন্য ভাগ দেয় মেয়েটিকে। বলে, 'এই আধটুকরো চালই আজ রান্না কর গে। আজ রবিবার। একুশ ছড়া ধান, একুশটা কলমি ডগা, একুশটা কলাই শাকের আগা আর ধান-দুব্বো দিয়ে দীপ জ্বেলে সুজ্যি পুজো কর—দেখবি তোদের আর দুক্ষু থাকবে না।'

আধটুকরো চাল রাঁধতে গিয়ে বড় মেয়ের বিস্ময় আর কাটে না। আধটুকরো দেখতে দেখতে হাঁড়ির মধ্যে সহস্র দানার রূপ নেয়, আর কী তার খুসবাই। চারদিকে ভাতের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে।

ভিখিরির কথায় তখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। মেয়েটা একুশটা কলমি ডগা, একুশটা কলাই শাকের আগা ইত্যাদি দিয়ে সুজ্যিপুজোও করে। এরই মধ্যে ভিখিরি বাপ ঘরে ফেরে। এত চাল আজ সে ভিক্ষেয় পেয়েছে যে গরুগাড়ি করে নিয়ে আসতে হয়েছে। এ-কাহিনির টাইপ—১৬৪২ : লোভনীয় প্রাপ্তি।

ব্রাহ্মণের পিঠে খাওয়া নিয়ে আরও একটি কাহিনি শোনা যাক :

এক যে ছিল বামুন। সে ছিল খুব বোকা। শুধু বোকাই নয়, গরিবও। কেবল গরিবই নয়, লোভীও। একদিন সে শুনল, পিঠে বলে একটা মিষ্টি আছে। অমনি সে পিঠে খাবার জন্যে ব্যাকুল হল। দোরে দোরে গিয়ে পিঠে খেতে চাইল। কিন্তু কেউই তা খাওয়াতে পারল না। পারবে কি করে? তখন যে চৈত্র মাস, পিঠে তৈরির মরশুম তো নয়। বামুন তা বোঝে না। সে পিঠে-পিঠে করে পাগল।

এক বদ লোক বোকা বামুনকে লেলিয়ে দিল একটা বাজে মেয়ের ঘরে। বলল সেই বোকা বামুনকে, 'পিঠে খাবি? বনের মধ্যে ঐ-যে দেখছিস পাকা বাড়িটা? সন্ধের পর ওখানে গিয়ে দরজায় তিনবার টোকা দিবি ('তিন' সংখ্যাটিও বাংলা লোককথায় একটি ইন্দ্রজালিক সংখ্যা), দেখবি একটা সুন্দরী মেয়ে এসে দরজা খুলে দেবে। ঐ মেয়েটাই তোকে পিঠে খাওয়াতে পারে।'

বোকা বামুন লোকটার কথায় বিশ্বাস করে সন্ধের পর বনের মধ্যে সেই বাড়িতে সত্যিই হাজির হল।

মেয়েটা শুধু বাজে বললে ভুল হবে, বাজারেও। স্বামী তার বিদেশ গেছে। সেই ফাঁকে মেয়েটা ফি-সন্ধে বাইরের পুরুষ ঘরে এনে ফুর্তি লোটে। এতে তার টাকা-পয়সাও জোটে।

বামুন দরজায় তিন টোকা দিতেই সুন্দরী দরজা খুলে দেয়। সে ঘরের কাজ করতে করতেই স্নেহভরে বামুনকে বলে 'খাবার ঢাকা দেওয়া আছে, আগে খেয়ে নাও।'

ঢাকনা খুলে বামুন দেখে কীসব ভাজাভুজি সাজানো। সে তখন খুবই ক্ষুধার্ত। অতএব গো-গ্রাসে গিলতে থাকে।

ইতিমধ্যে দরজায় আবার তিনটি টোকার শব্দ। সুন্দরী অবাক। নাগর তো আজ সন্ধে নামতেই এসে গেছে, এ আবার কোন উটকো বাবু এল? নাগরের দিকে নজর দিতেই আর এক প্রস্থ অবাক হবার পালা। গো-গ্রাসে গিলছে যে সে তো তার নাগর নয়! কিন্তু এখন বাক্যব্যয়ের সময় নেই। ঝটিতি সে লোকটার হাত থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে, লাথি মেরে তাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল। যতটা সম্ভব চোখ-মুখে স্বাভাবিকতা এনে সে দরজা খুলে নাগরটিকে ঘরে নিয়ে এল। বামুনের হাত থেকে কেড়ে রাখা খাবারই সে নাগরকে খেতে দিল। খাবার খাওয়া হয়ে গেলে, নাগর জল খেতে চাইল।

খাটের তলায় বসে থাকা বামুনেরও খুব তেষ্টা পেয়েছিল। সেও ক্ষীণকণ্ঠে জানাল, 'আমিও জল খাব।'

সুন্দরী পায়ের ইঙ্গিতে বামুনকে অপেক্ষা করতে বলল। নাগরের জল খাওয়া হয়ে গেলে, পাত্রটা খাটের তলায় রেখে দিল। বামুনের কিন্তু পাত্রের জল সবটা খেয়েও তেষ্টা মেটে না। সে আবার নিচু গলায় জল চায়। সুন্দরী দেখে এ ভারী ফ্যাসাদ। নাগরের চোখে মুখে কেমন যেন সন্দেহের রেখা। ঘরে আর জলও নেই। আনতে গেলে সন্দেহ আরও বাড়বে। কুলুঙ্গিতে ছিল একটা ঝুনো নারকেল। কী ভেবে সুন্দরী সেটাই বামুনকে দিল তেষ্টা মেটাতে।

খাটের তলায় বামুনের হাতের কাছে এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে সে নারকেলটা ভাঙতে পারে। সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। ঘরের মৃদু আলোয় তার চোখে পড়ল নাগরের মাথায় তেল-চকচকে টাক। সেটাকে পাথর ভেবে বামুন তার ওপরই নারকেলটা সজোরে মারল। নাগরের টাক-মাথা ফেটে চৌচির। নারকেলটাও। 'মলুম রে গেলুম রে' বলে নাগর সুন্দরীর ঘর ছেড়ে পালাল। সঙ্গে বামনটিও। এ-কাহিনির টাইপ—৪৩১ : বনের ভেতর বাড়ি।

এইসব ঘরোয়া লোককথায় দু'টো ঘটনা মনে দাগ কাটে। একটা হল পিঠে-প্রসঙ্গের বাড়াবাড়ি, অন্যটি বামুন মাত্রই লোভী, দরিদ্র আর বোকা।

প্রথম ঘটনার ব্যাখ্যায় বলা যায় পিঠে গ্রামবাংলার রন্ধনশিল্পে একটি উৎকৃষ্ট এবং উপাদেয় নিদর্শন। সুতরাং বাংলার লোককথায়—যার জন্ম, প্রচার ও প্রসার গ্রামেই—পিঠে একটি প্রিয় প্রসঙ্গ হয়ে উঠবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় ঘটনার রহস্যভেদ করতে গেলে আমাদের কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পুরনো পাতাগুলো একটু উল্টেপাল্টে দেখতে হবে। একটা সময় ছিল যখন রাজার বকলমে ব্রাহ্মণরাই রাজ্য চালাত—স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়নের নামে শ্রেণীমিত্র উচ্চবর্ণের মানুষকে রেহাই দিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর চালাত শাস্ত্রীয় নিপীড়ন। গ্রাম-বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষকে মুখ বুজে সেসব সহ্য করতে হত। বৌদ্ধযুগে নিম্নবর্ণের বাঙালি

সেই ব্রাহ্মণ্য-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খোলে। তারই অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে লোককথায় তার নিজস্ব ভঙ্গিতে। জাতককথায় আর এক ধাপ এগিয়ে চোররূপে চিত্রিত করা হয়েছে ব্রাহ্মণকে।

বাস্তবে যা ঘটে না, তা কল্পনার জগতে ঘটিয়ে দিয়ে নিম্নবর্ণের গ্রামের মানুষ এক অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি বোধ করে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে লোভী, দরিদ্র আর বোকা চরিত্রে রূপায়িত করার পেছনে এই হল মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

ইতিমধ্যে টোনা-টুনি, চড়াই আর চড়াইগিন্নির পশুকথায় আমরা লোককথাকারদের এই ধরনের মনস্তত্ত্বের পরিচয় পেয়েছি। সেসব পশুকথায় লক্ষ্য করেছি যে ক্ষুদ্র টোনা-টুনি বা চড়াই পাখি বলশালী বাঘকে কী নাজেহালই না করেছে। এ-ও সেই বাস্তবে যা অসম্ভব, কল্পনার জগতে তা ঘটিয়ে মনের জ্বালা মেটানো। এখন পাখি নয়, ক্ষীণকায় কয়েকটি জন্তুর বলশালী বাঘকে জব্দ করার কাহিনি শোনাব। বাঘও এসব পশুকথায় লোককথাকারদের মনে ব্রাহ্মণের মতই অত্যাচারের প্রতিমূর্তি। অতএব তার দশাও বোকা বামুনের চেয়ে ভালো কিছু নয়।

প্রথমে একটি সাঁওতালি পশুকথা। কাহিনিটি এ-রকম :

এক বনে এক দুর্দান্ত খরগোস থাকে। ছোট হলে হবে কি, তার দাপটে বাঘও থরহরিকম্প।

একদিন ঐ খরগোসটা একটা বাঘকে মারতে গেছে। ভয়ে বাঘ ছুটতে ছুটতে বন পেরিয়ে আবাদি এলাকায় ঢুকে পড়েছে।

ধান কাটা সারা। ফাঁকা মাঠে কোথাও কোন ঝোপ-ঝাড় নেই যে দু'দণ্ড থাকা যায়। মাঠের প্রান্তে এক চাষা জমিতে নিড়েন দিচ্ছিল। বাঘ এসে তার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কাতর কণ্ঠে বলে, 'চাষিভাই, দোহাই তোমার, আমাকে তোমার কাপড়ের খুঁটের আড়ালে একটুক্ষণ লুকিয়ে রাখ। নইলে খরগোস আমাকে মেরে ফেলবে।'

চাষা বলে, 'তোমাকে বাঁচালে সবচে আগে তো তুমি আমাকেই খাবে।'

'আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কোন ক্ষতি করব না। তবে একটা শর্ত আছে।'

'শর্তটা কি?'

'আমাকে আশ্রয় দেবার কথা তুমি অন্য কাউকে বলতে পারবে না।'

চাষা বাঘের শর্ত মেনে নিয়ে তাকে কাপড়ের খুঁটের আড়ালে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রাখল। কিছু পরে, হাঁপাতে হাঁপাতে সেই খরগোসটা এসে চাষার কাছে জানতে চাইল, 'চাষিভাই, এদিকে কোন বাঘকে আসতে দেখেছ?'

চাষা বলল, 'কই নাতো।'

খরগোস তখন অদৃশ্য বাঘের উদ্দেশে বলতে থাকে, 'আজ ব্যাটা খুব বাঁচা বেঁচে গেলি, ফের যদি তোকে বনের ত্রিসীমানায় দেখি তবে তোর একদিন কি আমারই

একদিন।' খরগোস চলে গেলে, বাঘও গুটিগুটি বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে সে চাষাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল তার শর্তের কথা।

ঘরে ফিরে চাষা যখনই বাঘের কথা আপন মনে ভাবে, হাসি পায়। চাষাকে একা-একা বসে ওভাবে হাসতে দেখে গিন্নি বলে 'কি গো, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে—অকারণ হাসছ কেন?'

'অকারণ নয় গো গিন্নি, অকারণ নয়। আজ সকালে মাঠে এক মজার ব্যাপার হয়েছে'—চাষা গিন্নিকে তখন সবিস্তারে খরগোস-বাঘের কথা নিবেদন করে। ওদিকে হয়েছে কি, খরগোসের আস্ফালনে ভয় পেয়ে বাঘ বনে আর না ফিরে, বসতি এলাকায় ঘুরঘুর করছিল। চাষা যখন রসিয়ে গিন্নিকে বাঘের উপাখ্যান শোনাচ্ছিল, বাঘ তখন জানলার পাশ থেকে তা আড়ি পেতে শুনতে পায়। সেই থেকে সে চাষার দোরগোড়ায় অপেক্ষা করে আছে। চাষা ঘরের বাইরে বেরোলেই শর্ত খেলাপের অপরাধে সে তাকে খাবে।

বিকেলের দিকে চাষা বাইরে বেরোতেই বাঘ তেড়ে আসে, 'চাষিভাই, তুমি শর্ত পালন করনি। মানা করা সত্ত্বেও তুমি সকালের কথা ফাঁস করে দিয়েছ—এবার আমি তোমাকে খাব।'

বাঘের কথা শুনে চাষার হাত-পা, বিশেষ করে পশ্চাৎদেশ ঠকঠক করে ভয়ে কাঁপতে থাকে। তা দেখে বাঘ শুধায়, 'কি ব্যাপার চাষিভাই, তোমার পেছনদিকটা অমন কাঁপছে কেন?'

প্রাণে বাঁচবার জন্যই বোধ হয়, চাষার মুখে বোল ফোটে, 'সকালে ফেরবার সময় তোমার ঐ খরগোসটাকে গিলে খেয়েছি তো, এখন ওটা নিশ্চয় পেছন দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।'

খরগোসের নাম শুনে এবার বাঘের কাঁপার পালা। সভয়ে সে চাষাকে অনুরোধ করে, 'আর একটু ধরে রাখ ভাই, দোহাই তোমার।' বাঘ এরপর পালিয়ে বাঁচে। চাষাও গন্তব্যপথে পাড়ি দেয়। এ-কাহিনির টাইপ—৭৫ : দুর্বলকে সাহায্য করা।

এবার উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই' থেকে নরহরি দাস নামের সেই ছাগশিশুর বীরত্বের কথা :

ষাঁড়ের পরামর্শে দূরের মাঠে ঘাস খেতে গেছে নরহরি। সেখানে এত ঘাস খেয়েছে যে পেট ফাটার জোগাড়। নড়তে চড়তে না পেরে বাছাধন পাহাড়ের কোলে এক গর্তে ঠাঁই নিতে বাধ্য হয়। ওর জানা ছিল না, ঐ গর্তটা আসলে এক শেয়ালের বাসা। নরহরি নিশ্চিন্তে সেই গর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাতে শেয়াল বাসায় ফিরে দেখে কালো রঙের কী যেন একটা ঘরের মধ্যে রয়েছে। শেয়াল রেগে চিৎকার করে ওঠে, 'আমার ঘরে কে রে তুই?'

শেয়ালের চিৎকারে নরহরির কাঁচা ঘুম ভেঙে যায়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাগশিশু পরিস্থিতি

মালুম করে ঝটিতি বলে ওঠে, 'আমি কে তা জানতে চাস? আমার নাম নরহরি দাস। পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস।'

সেই জবাব শুনে শেয়াল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাঘের ডেরায় হাজির। বাঘ তখন ঘরে বিশ্রাম করছিল। ভাগ্নের কথা শুনে সে রেগে কাঁই। কার এত স্পর্ধা যে এই বনে থেকে অমন লম্বা-চওড়া বাত ছাড়ে? শেয়ালও মামাকে তাতাতে থাকে। অগত্যা তখুনি শেয়ালকে সঙ্গে নিয়ে বাঘ যায় অকুস্থলে।

দূর থেকে ওদের আসতে দেখে নরহরি গর্ত থেকে তরফানি শুরু করে দেয়, 'অমন একটা বাঘে আমার কি হবে? হতভাগা শেয়াল, তোকে দিলাম দশ বাঘের কড়ি। এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি?'

নরহরির কথা শুনে বাঘও ঘাবড়ে গেল। নরহরিকে আর না ঘাঁটিয়ে, সে সেখান থেকেই পিট্টান দিল। ভুল বুঝল সে শেয়ালকে। সে ভাবল নিশ্চয় শেয়াল তাকে ধরে এনেছিল নরহরির কাছে ভেট দেবে বলে।

বাঘ ছোটে, পেছনে শেয়ালও বাঘের সঙ্গে দৌড়ে যায়। শেয়াল পেরে উঠবে কেন? মাটিতে আছাড় খেয়ে, কাঁটায় আঁচড় লাগিয়ে, খেতের আলে ঠক্কর খেতে খেতে, বেচারার প্রাণ ওষ্ঠাগত। সে এরই মধ্যে মামাকে সাবধান করতে চায় এই বলে, 'মামা আল।' বাঘ ভাবে নরহরি বুঝি তার পিছু নিয়েছে। সে আরও জোরে ছুটতে থাকে। এ-কাহিনিটির টাইপ—১০৩ : অপরিচিত পশুকে দেখে বনের পশু ভয় পায়।

এখন যে-কাহিনিটি শোনাব তার নায়ক পাখি নয়, জন্তুও নয়—মানুষ। প্রতিপক্ষ অবশ্যই বাঘ এবং মানুষের হাতেও তার যথারীতি শোচনীয় দুরবস্থা :

এক নিরীহ বুড়ো চাষা। ধানের ক্ষেতে বাবুই তাড়ানোই তার কাজ। সে মাঠে এসে ঠক ঠক আওয়াজ করে লাঠি দিয়ে। বাবুইরা সেই আওয়াজ শুনে উড়ে পালায়।

একদিন লাঠি দিয়ে অনেক ঠকঠকিয়েও যখন বাবুইরা পালাচ্ছেনা তখন বুড়ো রেগে গিয়ে বলে, 'যদি একবার তোদের ধরতে পারি তবে ইড়িমিড়িকিড়ি বাঁধন দিয়ে ছাড়ব।'

আসলে কিন্তু ইড়িমিড়িকিড়ি নামে সত্যিই কোন বাঁধন নেই। বুড়োর মুখ থেকে রাগের মাথায় ঐ শব্দগুলো হঠাৎ-ই বেরিয়ে পড়েছিল।

এদিকে হয়েছে কি, কাছেই একটা বাঘ সে-সময় ওঁৎ পেতে বসেছিল। চাষার মুখ থেকে ইড়িমিড়িকিড়ি বাঁধনের কথা শুনে তার বেশ ভয় হল, অথচ বাঁধনটার ব্যাপারে তার মনে কৌতূহলও ষোলো আনা। বাঘ তখন মনের ভয়-ভীতি কাটিয়ে চাষার কাছে গুটিগুটি পায়ে হাজির। বুড়োকে সে বলল, 'তুমি একটু আগে কী একটা বাঁধনের কথা বলছিলে না? ওটা একটু দেখাতে পার?'

সামনে বাঘ। বুড়োও ভয় পেয়েছে খুব। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করে বাঘকে বুড়ো বলে, 'খুব বড় একটা মজবুত থলি, এক গাছা মোটা আর লম্বা দড়ি, আর

একটা মস্ত মুগুর জোগাড় করতে হবে—তবেই তো দেখাতে পারব ইড়িমিড়িকিড়ি কি জিনিস।'

বাঘের কাছে এসব জোগাড় করা কি আর শক্ত কাজ। ইড়িমিড়িকিড়ি বাঁধন দেখার লোভে বাঘ তখুনি ছুটল হাটের দিকে। পথে তিনজন খইওয়ালা বস্তা-বোঝাই খই মাথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, বাঘ 'হালুম' শব্দ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা বস্তা ফেলে দে ছুট। দড়ির জন্য বেশি দূর যেতে হলনা। গরু বাঁধার দড়ি সে মাঠ থেকে খুব সহজেই জোগাড় করে নিল। সবশেষে বাঘ গেল পালোয়ানদের আখড়ায়। সেখান থেকে সে এক পেল্লাই মুগুরও বাগিয়ে নিল।

কথামত সব কিছু এনে বাঘ বুড়োর পায়ের কাছে রাখল। বুড়ো এবার বাঘকে বলল, 'একবারটি তুমি এই থলির ভেতর এস তো ভাই।'

বাঘ সরল মনে থলির মধ্যে ঢুকল। বুড়ো এবার দড়ি দিয়ে থলির মুখ বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলল। এরপর চলল থলির উপর মুগুর দিয়ে ধাঁই ধাঁই পেটাই। বাঘকে নীরবে সেই পিটুনি সহ্য করতে হল।

তার কান্নাকটি শুনলে অন্য জন্তুরা কি ভাববে? শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে না কেঁদে পারলও না। কান্না এক সময় গোঙানির সুর নিল, তারপর এক সময় সে একেবারেই নিথর হয়ে গেল।

বুড়ো ভাবল বাঘ মরেছে। আপদ বিদেয় হয়েছে ভেবে সে তখন থলি খুলে বাঘটাকে খেতের ধাবে ফেলে দিয়ে এল।

বাঘ কিন্তু সত্যিই মরেনি। প্রচণ্ড মার খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। যখন সম্বিৎ ফিরে এল, তার গায়ে-গতরে তখন দারুণ ব্যথা। সে মনে মনে পণ করল বুড়ো চাষাটাকে উচিতশিক্ষা দিতে হবে।

ওদিকে বুড়ো চাষাও যখন টের পেয়েছে বাঘটা মরেনি তখন তার মনেও ভীষণ ভয় ঢুকেছে। তিনদিন সে বাড়ি থেকেই বেরোয়নি। বাঘ ব্যাপারটি বুঝে নিজেই একদিন বুড়োর বাড়ি হাজির হল। যেন কিছুই ঘটেনি সেই ভঙ্গিতে বুড়োর কাছে তামাক খাবার অছিলায় আগুন চাইল। বাঘের সাড়া পেয়ে বুড়ো ভয়ে দরজা আর খোলে না। সে বাঘকে বলল, 'খুব জ্বর হয়েছে, বেরোতে পারছিনা। তুমি দরজার ফাঁক দিয়ে তোমার লাঠিটা গলিয়ে দাও, আগুন দিচ্ছি।'

বাঘ তখন লাঠি পাবে কোথায়? সে তার লেজটা দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিল। বুড়ো তখন করল কি, বঁটি দিয়ে বাঘের লেজটা কেটে দিল। লেজকাটা বাঘ গোঙাতে গোঙাতে চলে গেল।

বাঘ চলে গেলেও, বুড়ো চাষার ভয় কিন্তু বেড়েই গেল। সে এবার আর ঘরে নয়, উঁচু তেঁতুল গাছটার ওপর বসে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বাঘ সদলবলে আবার হাজির হল বুড়োর বাড়ি। দূর থেকেই সে তেঁতুল গাছের ওপর বুড়োকে বসে থাকতে দেখল।

সব বাঘ মিলে এবার ফন্দি আঁটতে লাগল, কিভাবে ঐ বুড়োকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়। একটা বাঘ ছিল খুব চালাক। সে অন্য বাঘদের এই বলে বোঝাল, 'আমাদের মধ্যে যে সবচে বড় সে মাটিতে গুঁড়ি মেরে বসে থাকবে। তার চেয়ে যে ছোট সে তার ঘাড়ে উঠবে—এইভাবে ক্রমশ উঁচু হয়ে এক সময় আমরা ঐ হতচ্ছাড়াকে ধরে ফেলব।'

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। লেজকাটা বাঘটাই ছিল আকারে সবচেয়ে বড়। কাজেই তাকে আগে মাটিতে গুঁড়ি মেরে বসতে হল। কিন্তু লেজ কাটা যাবার পর থেকে বেচারা ভালো করে বসতেই পারে না। যাই হোক, সে মাটিতে বসার পর, তার ঘাড়ের ওপর একটা, তার ওপর আর একটা—এইভাবে তারা ক্রমশ বুড়োর নাগালের কাছে চলে এল। বুড়োকে ধরবার অবস্থায় যখন তারা প্রায় এসে গেছে, তখন সবচেয়ে তলায় থাকা লেজকাটা বাঘটা একটু নড়ে, একবার ওপরের দিকে তাকাতে চাইল। এই নড়ার ফলেই কিন্তু সাংঘাতিক একটা বিপত্তি ঘটে গেল। এর ঘাড়ে ও, ওর ঘাড়ে সে — হুড়মুড় করে ওপরের বাঘগুলো একে একে পড়তে শুরু করল। লেজকাটা নীচের বাঘটা, ব্যাপার না বুঝে, তখনও কিন্তু বসেছিল।

বুড়ো চাষার হাতে ছিল একটা হাঁড়ি। সে তখন করল কি, ঐ হাঁড়িটা বাঘটার গায়ে সজোরে ছুড়ে মারল। লেজকাটা বাঘ তখন পালিয়ে বাঁচল।

এ-কাহিনিটির আসলে তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে পড়ে বুড়োর মুখে ইড়িমিড়িকিড়ি শব্দ শুনে বাঘের ভয় পাওয়া, যার টাইপ—১৫১। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে বাঘকে থলি-বন্দি করা পর্যন্ত, এর মোটিফ—কে ৭৫১। শেষ ভাগটির টাইপ—১২৩১ : এক বাঘের পিঠে অন্যের চাপা, নীচের বাঘের স্খলন ও সকলের পতন।

এ-কাহিনিটি অবশ্য নির্ভেজাল পশুকথা নয়। প্রসিদ্ধ মার্কিন লোককথাবিদ স্টিথ টসমনরে মতে কাহিনির প্রথম ভাগটি 'মানুষ ও বন্যপশু' এই উপশিরোনামের অন্তর্গত (টাইপ ১৫০ থেকে যার শুরু এবং ১৯৯-তে যার শেষ)। দ্বিতীয় ভাগটিকে সেভাবে শনাক্ত করা না গেলেও মোটামুটি আগেরটিরই মত। তৃতীয় ভাগটি আবার তাঁর বিবেচনায় 'বন্যপশু ও গৃহপালিত পশু' এই উপশিরোনামভুক্ত (টাইপ ১২০ থেকে যার শুরু এবং ১৪৯-এ যার শেষ)।

সে যাই হোক, আমরা কাহিনিটির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আর্কষণ করছি। প্রথম ভাগটিও যে একেবারে অনাকর্ষণীয়, তা অবশ্য নয়।

কাহিনির দ্বিতীয় ভাগে দেখি বুড়ো চাষা বোকা বাঘকে থলি-বন্দি করছে। কাহিনির এই অংশটি আমাদের হাজির করে নাপিত ও ভূতের সেই কাহিনির মুখোমুখি :

এক নাপিত। আর এক তাঁতি। দু'জনের গলায় গলায় ভাব। দুই বন্ধু শলা-পরামর্শ করে একদিন বেরিয়ে পড়েছে ভাগ্য অন্বেষণে। যাবার কালে নাপিতভায়া একটা থলির মধ্যে তার ক্ষৌরকর্মের যন্ত্রপাতি আয়না ইত্যাদি নিতে ভোলে নি।

যেতে যেতে সন্ধে নেমে এল। চারিদিক অন্ধকার। কোথায় রাতটা কাটানো যায়

সেই চিন্তায় দুই বন্ধু ব্যাকুল। হেনকালে রাস্তার ধারে একটা বিশাল বাড়ি দেখে দু'জনে স্থির করে রাতের মত সেখানেই আশ্রয় নেবে।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে তারা অবাক। অত বড় বাড়ি, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। সারাটা দিন হাঁটাহাঁটিতে ক্লান্ত। মেঝেতে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল তারা। রাত যখন নিশুত তখন কে যেন এসে নাকি সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আঁমার বাঁড়িতে তোঁরা কেঁ র‍্যাঁ?'

তাঁতি সেই কথা শোনামাত্র 'ভূত ভূত' বলে ছুটে পালাল। নাপিতভায়া কিন্তু একটুও ঘাবড়াল না। সে ভূতকে শুনিয়ে বন্ধুর উদ্দেশে জানাল, 'সামান্য একটা ভূতকে দেখে তোর এত ভয়? আমার এই থলিটার মধ্যে অমন কত শত ভূত পুরে রেখেছি।'

নাপিত ভায়ার কথা শুনে ভূতটার দারুণ ভয় হল। সে নাপিতে কাছে গিয়ে থলির ভেতরের ভূত দেখার জন্য তাকে খুব অনুনয়-বিনয় করল। নাপিত তখন করল কি, আলো জ্বেলে থলির ভেতরে থেকে আয়নাটা এনে ভূতের সামনে মেলে ধরল। আয়নায় দেখে নিজেকে আর একটা ভূত ভেবে সে ভয়ে শিউরে উঠল। কাতর কণ্ঠে সে তখন নাপিতের কাছে মিনতি করতে লাগল, 'দোঁহাই তোঁমার আঁমাকে ধঁর নাঁ।'

কাহিনি এরপরও অনেক এগিয়েছে, কিন্তু আমাদের আলোচনায় আপাতত তা মূল্যহীন। এবার মিলিয়ে দেখুন বুড়ো চাষার কাছে বাঘের সেই ইড়িমিড়িকিড়ি কি জানার জন্য আকুলতা, আর এ-কাহিনিতে ভূত-গৃহপতির নাপিতের থলিতে আরও ভূত দেখার বাসনা—হুবহু একই রকম নয় কি? কান পাতলে 'সামান্য একটা ভূতকে দেখে তোর এত ভয়? আমার এই থলিটার মধ্যে অমন কত শত ভূত পুরে রেখেছি'—তাঁতি বন্ধুর উদ্দেশে নাপিতের এই আস্ফালনের প্রতিধ্বনি শোনা যায় না কি কিছু আগে বলা শেয়ালের প্রতি ছাগশিশু নরহরির হম্বিতম্বিতে? ফারাক শুধু এই, সেখানে আস্ফালনের লক্ষ্য বাঘ, এখানে ভূত। তলিয়ে দেখলে বাঘে-ভূতে তেমন তফাৎ-ও নেই। ওরা উভয়েই মানুষের কাছে ভীতিপ্রদ। এ-কাহিনির টাইপ—৩৩০ : নাপিত ভূতকে ভয় দেখায়।

এবার 'ইড়িমিড়িকিড়ি' কাহিনিটির তৃতীয় ভাগের দিকে আমরা নজর দেব। এখানে আছে এক বাঘের ওপর এক, তারও ওপর আর এক বাঘের উঠে গাছের ডালে বসে-থাকা বুড়ো চাষাকে নাগালের মধ্যে আনার চেষ্টা এবং পরিণামে নীচের বাঘের নড়ার ফলে অন্য সকলের পতন। এ-কাহিনিটি শুনলেই মনে পড়ে চাষার সেই বোকা জামাইয়ের কাহিনিটি :

চাষার ঘরজামাই রাতে খেতে ফসল পাহারা দেয়। এক রাতে সে দেখে একটা হাতি স্বর্গ থেকে মাঠে নামছে। কিছু পরে সেই হাতিটা যখন আবার স্বর্গে ফিরে যাবার জন্য ওপরে উঠছে, জামাই বাবাজি তখন তার লেজ ধরে ওপরে উঠে যায়। পরের দিন সেই হাতির লেজ ধরেই আবার মর্তে ফিরে আসে। জামাইয়ের মনে আনন্দ আর ধরে না। গ্রামবাসীদের ডেকে ডেকে তার স্বর্গযাত্রা-কাহিনি শোনায়। জামাইয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা জেনে গ্রামবাসীরাও স্বর্গযাত্রার জন্য পাগল।

স্থির হয়, পরের দিন হাতি স্বর্গে ফিরে যাবার সময় জামাই বাবাজিই প্রথম হাতির লেজ ধরবে, এরপর গ্রামবাসীদের কেউ তার কোমর ধরবে, তারপর যে-ই যাবে—একে অন্যের কোমর ধরে থাকবে।

পরের দিন যথারীতি জামাই প্রথমে হাতির লেজ ধরে। তার কোমর ধরে একজন গ্রামবাসী, তারপর একইভাবে অন্যেরা। হাতির স্বর্গযাত্রা এক সময় শুরু হয়ে যায়। স্বর্গের প্রায় কাছাকাছি এসে গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ জামাইয়ের কাছে স্বর্গের বিবরণ শুনতে চায়। আনন্দের উত্তেজনায় জামাই বাবাজি যেই হাত নেড়ে স্বর্গের বর্ণনা দিতে যায় অমনি হাতির লেজ ছেড়ে সে এবং তার সঙ্গে সব গ্রামবাসী পপাত ধরণি তলে। এ-কাহিনির টাইপ হল—১২৪০বি : যে অবলম্বন ধরা আছে তা ছেড়ে দেওয়া।

এক বাঘের ওপর আর এক বাঘের আরোহণের কাহিনিই যে এ-কাহিনির মূলে তা অবশ্য জোর দিয়ে বলা যায় না। কেননা, দেবহস্তী লোককথার একটি বিশ্বজনীন অভিপ্রায়—এ১৫৫.৫ এবং তার মর্তে আগমনও—এফ ৩৫.২।

ছকে বাঁধা রঙ্গকথা

লোককথার রূপ বিশ্বজনীন। 'বুদ্ধিমতী চাষার বৌ', 'ভাগ্যের অন্বেষণে যাত্রা' কিংবা 'কনিষ্ঠ সন্তানের জয়' অথবা 'দুর্বলকে সাহায্য করা' ইত্যাকার টাইপভুক্ত কাহিনি সারা বিশ্বে মোটামুটি একই আদলে ছড়িয়ে আছে। আঞ্চলিকতার সুর যে এসব কাহিনিতে একেবারেই বাজেনি তা বললে অবশ্য সত্যের অপলাপ হবে। বাচনভঙ্গি, পরিবেশ রচনার প্রশ্নে বস্তুত আঞ্চলিকতার প্রভাব এড়ানো এক রকম অসম্ভবই। তবু এসব অতিক্রম করেই সাগরপারের লোককথা এদেশের লোককথা হাতে হাত রাখে। যেহেতু নানান স্বাদের লোককথার মধ্যে রঙ্গকথাও অন্যতম — হয়তো বা প্রিয়তম, সুতরাং লোকরঙ্গকথার আবেদনও পাঠকের কাছে একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে স্বনামধন্য নাট্যকার বার্নার্ড শ' (১৮৫৬-১৯৫০)-কে নিয়ে সেই আধুনিক বিলেতি রঙ্গকথাটি :

বাঁশের ছোট্ট একটি সাঁকো। তার একদিক থেকে শ'-কে এগিয়ে আসতে দেখে বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা সাহেবটি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন. 'আই ডোন্ট অ্যালাউ এনি ব্লাডি ফুল টু গো ফার্স্ট।'

সাহেবটির এ-হেন মন্তব্য শুনে, শ' আর একটুও না এগিয়ে, যতটুকু গিয়েছিলেন— সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

বিপরীত প্রান্তের সাহেব এবার শ'-এর পাশ দিয়ে এগুচ্ছেন—এগুতেই হবে— কেননা, বাঁশের সাঁকোয় সঙ্কীর্ণ পরিসর। শ' আগুয়ান সাহেবটির কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে শুধু একটি কথাই বললেন, 'বাট আই ডু।' এ-কাহিনির মোটিফ— এক্স ১০ : ব্যঙ্গ ও ঠাট্টা।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের আশ্রয় করে এ-ধরনের রঙ্গকথার প্রচলন এদেশেও বড় কম নয়। এই ধরনের একটি স্বদেশি কাহিনি:

গোঁড়া ব্রাহ্ম শিক্ষাবিদ্ এবং সত্যভাষী হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের ধারণা ছিল নাটক-সিনেমা নিয়ে মাতামাতি করে বাংলার যুবসমাজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে। নিজের ছেলেকেও সেই ভয়াবহ মাতন থেকে উদ্ধার করতে পারেননি তিনি। তিতিবিরক্ত হেরম্বচন্দ্র রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। হেনকালে কয়েকটি যুবক তাঁর কাছে জানতে চান হাতিবাগানের থিয়েটার পাড়াটা কোন্ দিকে? ক্ষুব্ধ হেরম্বচন্দ্র যুবকদের জানান, 'জানি, কিন্তু বলব না।' এ কাহিনির মোটিফ— এক্স ১০ : ব্যঙ্গ ও ঠাট্টা।'

হেরম্বচন্দ্র সম্পর্কে প্রচলিত এ-কাহিনি সত্যি হোক বা মিথ্যে হোক, একটু আগে বলা বিলেতি রঙ্গকথাটির সঙ্গে এর মিল একটি সংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্যে দিয়েই। এখানে

একই সঙ্গে ব্যক্তি হেরম্বচন্দ্র এবং তৎকালীন বাংলার সমাজ-মানস উদ্ভাসিত। বৃক্ষারূঢ় কালিদাসের ডাল কাটার গল্প তো আজ কিংবদন্তিতে পরিণত। যে ডালে বসে আছেন সে-ই ডালই কাটা—টাইপ ১২৪০। তবে এখানে একটা কথা এই যে কালিদাসের ঐ মুখার্মির সঙ্গে কবি কালিদাসের যোগ খুবই কষ্টকল্পিত। কিন্তু বানার্ড শ' কিংবা হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মুখে বসানো মিতাক্ষর জবাব দু'টি সূক্ষ্মরসের কারবারিদের নিমেষে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে তুলে ধরে এই রঙ্গকথার জনক গোটা ইংরেজ এবং বাঙালি জাতটার রসিকতায় অসামান্য পরিমিতিবোধও।

কালিদাসের মূখার্মির কথা নিশ্চয় লোককথার বিশ্বজনীন সম্পদ। কিন্তু কখনওই তা কোন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যবাহী কথা নয়, যা দিয়ে কোন দেশ-কাল-ব্যক্তির শনাক্তকরণ সম্ভব। অন্যদিকে শ'-কেন্দ্রীক কাহিনিটি কিংবা হেরম্বচন্দ্র-বিষয়ক কাহিনিটি একই সঙ্গে শ'কে আর হেরম্বচন্দ্র মৈত্রকে যেমন চিনতে সাহায্য করে তেমনি করে তাঁদের দেশকেও।

রঙ্গকথায় আঞ্চলিকতা ফুটে উঠতে দেখি বিশেষ কিছু টাইপ চরিত্রে। প্রথমেই পশুকথার কিছু টাইপচরিত্রের কথা। বাংলার পশুকথায় বেশ কিছু টাইপচরিত্র আছে যাদের আচার-আচরণ দেখলেই বোঝা যায় তারা এই বাংলাদেশেরই নিজস্ব সম্পদ। প্রথমেই মনে পড়ে প্রসিদ্ধ সেই মামা-ভাগ্নে বোকা বাঘ আর ধূর্ত শেয়ালের কথা। বাংলার হাটে-বাটে-ঘাটে এদের বোকামি আর চালাকি নিয়ে অজস্র পশুকথা ছড়িয়ে আছে। একটি কাহিনি এখানে হাজির করি। এটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির 'টুনটুনির বই'-এর সুবাদে পাঠকমহলে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে :

রাজবাড়ির ছাগলগুলো ভালোমন্দ খেয়ে বিশেষ হৃষ্টপুষ্ট। নধরকান্তি ছাগলগুলোকে দূর থেকে দেখেই শেয়ালের লোভ হল খেতে। খাওয়ার চেষ্টা করল সে একাধিকবার। কিন্তু পাহারাদার রাখালটা প্রতিবারই ধেয়ে এসে বাধা দিল।

শেয়ালও দমবার পাত্র নয় মোটেই। চুপিচুপি সে রাজবাড়ির বাইরে পাঁচিলের গায়ে গর্ত খুঁড়ে বাসা করল। এরপর নীচ দিয়ে চলল তার সুড়ঙ্গ কাটার পালা। সুড়ঙ্গ কাটতে কাটতে এক সময় সে ছাগলদের ঘরের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। মনে তার আনন্দ আর ধরে না। এবার নিশ্চিন্তে মোটাসোটা ছাগলগুলো সাবাড় করা যাবে। কিন্তু হায়, বরাত তার খুবই খারাপ। গর্ত খোঁড়ার আওয়াজ পেয়ে এবার সেই পাহারাদার রাখালটা হাতেনাতে ধরে ফেলল। শেয়ালটাকে পিটিয়ে রাখাল একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে রেখে, কাছেই কী একটা কাজে চলে গেল।

এমন সময় বাঘ আসছিল সেই গাছের তলা দিয়ে। শেয়ালকে ঐ অবস্থায় দেখে, সে এগিয়ে এসে শুধাল, 'ভাগ্নে, কি ব্যাপার? তোমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল কে?'

শেয়াল সপ্রতিভ গলায় বলে, 'আর বলো না মামা, রাজা তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায়। আমি রাজি হইনি, তাই গাছের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রেখে, বাড়ির ভেতরে গেছে মেয়েকে ডেকে আনতে। আমার সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে সে দেবেই।'

বলতে ভুলেছি, বাঘটা ছিল বিয়ে-পাগল। সে শেয়ালকে তখন বলে, 'ভাগ্নে, তুমি যদি একান্তই রাজকন্যে বিয়ে করতে না চাও, আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি। তার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা তুমি করে দাও।'

শেয়াল এক গাল হেসে বাঘকে জানায়, 'তবে আমার বাঁধনটা খুলে দাও মামা, আমি এখুনি বাড়ির ভেতর গিয়ে রাজাকে শুভ সংবাদটা নিবেদন করে আসি।'

বাঘ উৎসাহের সঙ্গে শেয়ালকে বন্ধনমুক্ত করল। শেয়াল 'রাজার কাছে চল্লুম' বলে খিড়কি-দরজা দিয়ে অন্য পথে পাড়ি জমাল।

এদিকে, কিছু পরে, রাখাল এসে শেয়ালকে না দেখে, বাঘের ওপর বিষম চটে গেল। বাঘ অতশত না বুঝে এ-সময় রাখালের কাছে রাজকন্যেকে বিয়ে করার ইচ্ছে জানিয়ে দিল।

'তোর রাজকন্যে বিয়ে করার সাধ এক্ষুনি ঘোচাচ্ছি'—বলে রাখাল বাঘকে হাতের লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে লাগল। বাঘ 'বাবা গো মাগো' চিৎকার করতে করতে বাঁধন ছিঁড়ে সেখান থেকে বনের দিকে ছুটে পালাল।

বনের ভেতর এক জায়গায় করাতিরা কাঠ চিরত। একটা মস্ত কাঠ আধখানা চিরে রেখে, সেইখানে গোঁজ মেরে করাতিরা চলে যায়। এর কিছু পরে বাঘ বনে এসে দেখে শেয়াল সেই আধ-চেরা কাঠের ওপর বসে বিশ্রাম করছে। শেয়াল বাঘকে দেখে হাসতে হাসতে শুধায়, 'মামা, বিয়ে কেমন হল?'

বাঘ নিরুৎসাহের সঙ্গে বলে, 'না ভাগ্নে, ওরা বড্ড ঠাট্টা করে, আমার মোটেই পোষাল না—আমি ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি।'

শেয়াল বলে, 'মামা, পালিয়ে এসেছ—ভালোই করেছ। এখন এসো আমরা দু'টিতে গল্প করি।'

শেয়ালের আমন্ত্রণে বাঘ খুশি হয়ে এক লাফে এসে বসল কাঠের সেই জায়গাটায় যেখানে সেটা খুব হাঁ হয়ে আছে। বসার সময় দেখা গেল বাঘের লেজটা কাঠের ফাঁকের মধ্যে ঝুলে রয়েছে। এটা দেখে শেয়ালের মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি চাগাড় দিল। সে মনে মনে ভাবল, এখন যদি কাঠের গোঁজটা সরিয়ে নেওয়া যায় তবে ভারী মজা হবে। সে কায়দা করে কাঠের গোঁজটা খুলে নিতেই, বাঘের লেজটা তাতে আটকে গেল। আর তখনই সে কাঠ থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়তেই, কাঠটা ওপরে উঠে গেল—বাঘের লেজটাও ফটাং করে ছিঁড়ে গেল।

পাছে বাঘ শেয়ালকে দোষী ভেবে মারে, তাই মাটিতে পড়েই শেয়াল আহতের ভান করে 'মামা গো, গেলুম গো' বলে আর্তনাদ শুরু করে দিল।

সমদুঃখীর ভাব দেখিয়ে লেজ-কাটা বাঘকে নিয়ে শেয়াল কাছাকাছি এক কচুবনে গিয়ে বসল। বাঘ সেই অসহনীয় লেজ-কাটার যন্ত্রণার মধ্যেও খিদের জ্বালায় অস্থির

হল। সে শেয়ালকে বলল, 'ভাগ্নে বড় খিদে পেয়েছে—যা হোক কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা কর।'

শেয়াল বাঘকে বনের কচু তুলে খেতে দিল। বুনো কচু খেয়ে বাঘের মুখ কুটকুট করতে লাগল, গলা ফুলে ঢোল হল।

ওদিকে শেয়াল দিন কয়েক অসুখের অছিলায় শুয়ে রইল, তারপর ঝেড়ে উঠে বসল। শেয়ালকে উঠে বসতে দেখে, বাঘ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাগ্নে তোমার অসুখ সারল কি করে?'

শেয়াল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'নিজের হাত-পা চিবিয়ে খেয়ে নিলুম। তাতেই অসুখ সেরে গেল—আপনা থেকেই হাত-পা আবার গজাল।'

বাঘ শেয়ালের কথা বিশ্বাস করে নিজের হাত-পা চিবিয়ে খেয়ে নিল। কয়েক দিনের মধ্যেই ঘা হল। ঘায়ের পচনে বেচারা বাঘ মারাই গেল। এ-কাহিনির টাইপ—২১০১ : নিজের হাত-পা চিবিয়ে খাওয়া।

শেয়াল-চরিত্রের দু'টো বৈশিষ্ট্য এখানে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এক, বুদ্ধিমত্তা। দুই, বিশ্বাসঘাতকতা। পণ্ডিতদের মতে প্রথম বৈশিষ্ট্যটি শেয়ালে আরোপিত হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির প্রভাবে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি এসেছে আদি-অস্ত্রাল জাতির প্রভাবের ফলে। বাংলা পশুকথায় শেয়ালের চরিত্রের এই দুই বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় অন্য দেশের পশুকথার চেয়ে তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

বাংলার লোককথার দিকে দৃষ্টি দিলে জোলা বা তাঁতিদের নিয়ে রঙ্গকথাগুলি এ-প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে। জোলা বা তাঁতিমাত্রই বাংলার রঙ্গকথায় বোকা। প্রথমে জোলাকে নিয়ে একটা লম্বা কাহিনি শোনাই :

আদরে বাঁদর জোলার ছেলে বাবার কাছে আব্দার করল, 'বাবা একটা ঘোড়া চাই।'

ঘোড়া পাওয়ার দাবিতে ছেলেটা অনেক কান্নাকাটি জুড়ল, বাপের হুঁকো-কলকে ভাঙল, শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে খাওয়াদাওয়াও বন্ধ করে দিল।

গরিব বাবা পড়ল দারুণ ফ্যাসাদে। ঘোড়া কেনা কি চাট্টিখানি কথা! ঘরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে কিছু জমানো টাকার হদিস পেল। সেই টাকা সম্বল করে একদিন হাটে গেল সে ঘোড়া কিনতে।

হাটে একটা পছন্দসই ঘোড়া দেখতে পেয়ে তার দাম জিজ্ঞেস করে জানল পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু তার সঙ্গে আছে সাকুল্যে পাঁচ টাকা মাত্র। জোলা যখন ঘোড়ার দাম জানছিল, তখন সেখান থেকে কিছুটা দূরে, দু'জন লোকের মধ্যে বচসা হচ্ছিল। একজন অপরজনকে রেগে বলেছিল, 'ঘোড়ার ডিম হবে।'

বোকা জোলা তাই না শুনে সোজা গিয়ে সেই লোকটাকে শুধায়, 'দাদা, ঘোড়ার

ডিম কোথায় পাওয়া যায়?'

লোকটা জোলার কথার কোন জবাব না দিয়ে নিজেদের মধ্যে বচসাই চালিয়ে যায়। বোকা জোলা ট্যাক থেকে তার সম্বল পাঁচ টাকা গুনছিল তখন।

পাশেই একটা ধূর্ত লোক দাঁড়িয়েছিল। সে জোলার কথাবার্তা শুনে আর হাবভাব দেখে বিলক্ষণ টের পেয়ে গেল এমন উজবুক আর ভূ-ভারতে দ্বিতীয় নেই। সে তখন জোলার কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'ঘোড়ার ডিম চাও? আমার সঙ্গে এসো।'

বোকা জোলাকে সঙ্গে দিয়ে লোকটা নিজের বাড়িতে এল। লোকটার বাড়িতে ছিল একটা ফুটি। সেটা জোলাকে দেখিয়ে সে বলল, 'এই হল তোমার ঘোড়ার ডিম—ফেটে বাচ্চা বেরুল আর কি!'

জোলার মনে আনন্দের আর সীমা নেই। ফুটিটা সাদরে হাতে নিয়ে সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'এর দাম কত?'

ধূর্ত লোকটা আগেই জেনে গিয়েছিল জোলার কাছে মাত্র পাঁচ টাকা আছে। সে তাই ঐ দরই হাঁকল। কাহিনির এ অংশটুকুর টাইপ—১৩১৯ : জোলার কাছে ফুটিকে ঘোড়ার ডিম হিসেবে বেচা।

ফুটিকে ঘোড়ার ডিম ভেবে, সেটা হাতে নিয়ে, জোলা তো চলল নাচতে নাচতে বাড়ির দিকে। যেতে যেতে পথে এক সময় তার খুব জলতেষ্টা পেল। ফুটিটা তীরে রেখে সে নদীতে গেল জলপান করতে। ইতিমধ্যে কোথা থেকে একটা শেয়াল এসে ফুটিটা মুখে করে পালাল। জোলা জলপান শেষে ফিরে দেখে শেয়াল তার সাধের ঘোড়ার ডিম মুখে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

শেয়ালের পেছনে ধাওয়া করে জোলা নিজেই বনের মধ্যে হারিয়ে গেল। সন্ধে ঘনিয়েছে। রাতটা এখন কোথায় কাটানো যায়? জোলা বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে।

খুঁজতে খুঁজতে একটা মাটির বাড়ির দেখা পেল। বাড়ির মালকিন এক বুড়ি। বুড়ির হাতেপায়ে ধরে কোন মতে সে রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করল।

বাড়িটায় দু'টোমাত্র ঘর। একটা ঘরে বুড়ি আর তার নাতনি থাকল, অন্য ঘরটিতে জোলা।

জোলা যে-ঘরটায় থাকল, তার পাশেই ঝোপ—সেখানে রোজই একটা বাঘ আসে। বুড়ি তাই তার নাতনিকে ঐ-ঘরের ত্রি-সীমানায় আসতে দিত না। ঘরটার ওপর নাতনির মনে তীব্র কৌতূহল ছিল। এখন জোলা ঘরটায় থাকায় নাতনির ইচ্ছে হল জোলার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করার, আর সেই সঙ্গে ঘরটাকেও দেখে নেওয়ার। সে জোলার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই বুড়ি বলল, 'ও-ঘরে যাসনে, ওদিকে বাঘ-টাগ আছে।'

বাঘ কিন্তু সে-সময় সত্যিই ঘরের পেছনে ঝোপে এসে দাঁড়িয়েছে। বুড়ির সাবধানবাণীর 'বাঘ-টাগ' অংশটুকু বাঘটাকে খুব চিন্তায় ফেলল। সে ভাবল টাগ নিশ্চয় কোন সাংঘাতিক জন্তু অথবা ভূত-প্রেত কিছু হবে।

এদিকে জোলাও তখন একটু বাইরে বেরিয়েছিল হাওয়া খেতে। অন্ধকারে বাঘটাকে দেখে সে ভাবলে, এতক্ষণে নিশ্চয় তার খোয়া-যাওয়া ঘোড়ার ডিম থেকে বাচ্চা হয়েছে, আর সে-ই এখন এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

জোলার গায়ে একটা চাদর জড়ানো ছিল। সে করল কি, নিমেষে তার গায়ের চাদর বাঘের মুখে-চোখে জড়িয়ে, তার পিঠে চেপে বসল। ওদিকে বাঘটা ভাবল নির্ঘাৎ তাকে টাগে ধরেছে। জোলা অবশ্য খানিক পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল।

বাঘটা তখন সামনের দিকে পড়ি-কি-মরি ছুটছে আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলছে, 'দোহাই টাগ দাদা, আমার কাঁধ থেকে নামো, আমি তোমাকে পুজো দেবো।'

জোলা কিন্তু জানেনা বাঘ তাকেই টাগ ভাবছে। সে মনে মনে ভাবছিল বাঘকে ঘোড়া ভেবে বড্ড ভুল হয়ে গেছে—এখন আমি কি করি?

বাঘটা এ-সময় একটা গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। গাছের কিছু ডাল খুব নিচুতেই ছিল। জোলা তখন সুযোগ বুঝে একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে রইল।

বাঘ ভাবল, এবার বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। জোলা ততক্ষণে গাছে উঠে গেছে। সে ডালে বসে চিন্তা করছে, নীচে বাঘ নিশ্চয় কোথাও ওঁৎ পেতে আছে। এখন বাড়ি ফিরব কেমন করে?

ওদিকে চোখ-মুখ-ঢাকা অবস্থায় বাঘকে দেখে অন্য বাঘেরা তাকে ঘিরে ধরে বলছে, 'কি ব্যাপার?'

বাঘ তখন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, 'আমাকে টাগে ধরেছে। এখন টাগের পুজো দিতে হবে।'

সত্যিসত্যিই তখন বাঘেরা টাগের পুজো করতে শুরু করে দিয়েছে। বিশাল বিশাল বাঘকে খুব কাছ থেকে দেখে জোলার তখন অবস্থা কাহিল। পাতার আড়ালে জোলা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল বলে, বাঘেরা তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু তার পরনের কাপড়টা গাছের ডালে ঝুলছিল। তাই দেখে বাঘেদের সর্দার বলল, 'ওটা নির্ঘাৎ ভয়ানক টাগের লেজ।'

এই কথা যাঁহা শোনা, অমনি সব বাঘ মুহূর্তে সেখান থেকে পালাল।

জোলা সব দেখে শুনে এবার ধীরে সুস্থে গাছ থেকে নেমে বাড়ির পথে রওনা দিল। কাহিনির এই শেষ অংশটুকুর টাইপ—১১৭ : জোলা, বাঘ ও বুড়ি।

তাঁতি বা জোলাকে নিয়ে আরও একটি কাহিনি। শুধু জোলাই বা বলি কেন, তাঁতি জামাইও বটে। সুতরাং বোকা না হয়ে যায় না। কাহিনিটি এরকম :

এক গাঁয়ে এক তাঁতি ছিল। সে নদীতে ছিপ ফেলে তিনটে ছোট মাছ ধরে বাড়িতে ফিরল। বৌকে বলল, 'তিনটে মাছ ধরেছি। দু'টো আমি খাব, একটা তুমি।'

বৌ তাঁতির কথা শুনে ফোঁস করে উঠল, 'বললেই হল তুমি দু'টো খাবে? আমি

বলে সকাল থেকে ভেবে রেখেছি, আমি দু'টো খাব।' দু'জনেই বলে দু'টো খাব, সুতরাং সমস্যার আর সমাধান হয় না। শেষে ঠিক হয়, দু'জনে দু'ঘরে শোবে। কেউ কথা বলবে না। যে আগে কথা বলবে, সে একটা মাছ খাবে।

দু'জনে দু'ঘরে শুয়ে থাকে। রাতে কোন কথা নেই। পরের দিনও নয়। প্রতিবেশীরা সন্দেহের বশে উঁকিঝুঁকি দেয়। দেখে দু'জনেই দু'ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখে—নড়ছে না, চড়ছে না। মরে গেছে ভেবে প্রতিবেশীরা তাদের দু'জনকে শ্মশানে নিয়ে যায়। চিতার তোলার সময় আগুনের আঁচে বৌয়ের চুল পুড়তেই বৌ পড়ি-কি-মরি বাড়ির দিকে ছুট। ছুটতে ছুটতে সে তাঁতিকে বলে, 'আমি একটাই খাব।'

বৌয়ের কথা শুনে তাঁতিও এবার চিতা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বৌকে অনুসরণ করতে করতে বলতে লাগল, 'আমি দুটো খাবই তো।'

প্রতিবেশীরা 'একটা খাব' 'দু'টো খাব' শুনে খুবই ঘাবড়ে গেল। তারা তাঁতি আর তার বৌকে ভূত ঠাওরে ভাবে, তবে কি আমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে তারা খাবে? তখুনি নিজেরা নিজেদের একসঙ্গে বসে গুনতে লাগল। আরও ভয় হল এজন্য যে গণনায় একজন কম হয়ে যাচ্ছে। একবার গোনে, দু'বার গোনে—সেই একজন গুনতিতে কম (আসলে গোনবার কালে নিজেকে তারা গুনছে না)।

এই সময় ঘোড়ায় চেপে রাস্তা দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল। তাকে ডেকে প্রতিবেশীরা তাদের সমস্যার কথা খুলে বলল। সেই ভদ্রলোক প্রতিবেশীদের ঠিক গণনা করে বলল, 'আপনাদের কেউই খোয়া যাননি—সবাই ঠিক আছেন। কাহিনির এ অংশের টাইপ—১২৮৭ : নিজেকে না গুনে গুনতিতে একজন কম হওয়া।

প্রতিবেশীরা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে দেখে এক অবাক কাণ্ড। যে তাঁতি আর তাঁতির বৌকে তারা ভূত ভেবে ভয় পেয়েছিল, তারা দিব্যি হাসি-মস্করা করতে করতে মাছ-ভাত খাচ্ছে। সমগ্র কাহিনির টাইপ—১৩৫১ : কে আগে কথা বলবে।

এবার আর এক জোলার কাহিনি খুব সংক্ষেপে শোনাই। এ-কাহিনিও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি তাঁর 'টুনটুনির বই'-তে লিখে শহুরে মানুষের কাছে একে খুব জনপ্রিয় করেছেন। এটিও একটি লম্বা কাহিনি—একাধিক কাহিনি এতে মিশে গেছে। এতেও জোলাকে বোকা হিসেবেই দেখানো হয়েছে। কাহিনিটি এ-রকম :

এক বোকা জোলা। সে একদিন রোদের মধ্যে কাস্তে নিয়ে মাঠে ধান কাটতে গিয়ে খেতের মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে আবার কাস্তে হাতে নিয়ে দেখে, সেটা বড্ড গরম লাগছে। 'আমার কাস্তে তো মরে যাবে রে'—বলে সে তখন হাউ-হাউ কাঁদতে থাকে।

পাশের খেতে এক চাষা কাজ করছিল। জোলার কাণ্ড দেখে সে শুধায় 'কি হল? এমন কাঁদছিস কেন?'

জোলা কাঁদতে কাঁদতেই জানায়, 'আমার কাস্তের জ্বর হয়েছে।'

চাষা জোলার কথা শুনে হাসতে হাসতে বলে, 'কাস্তেটা জলে ডুবিয়ে রাখ, জ্বর সেরে যাবে।'

সত্যিই জলে ডুবিয়ে কাস্তে ঠান্ডা হল। জোলাও খুব খুশি।

এরপর একদিন জোলার বৃদ্ধা মায়ের জ্বর হয়েছে। সকলে বললে, 'হাকিম-বদ্যি ডাক।'

'আমি নিজেই জ্বর সারাবার ওষুধ জানি'—এই বলে জোলা তার বুড়ি মাকে পুকুরে নিয়ে গিয়ে জলের ভেতর চেপে ধরল। সে বেচারি যতই ছটফট করে, জোলা ততই তাকে চেপে ধরে। বলে, 'রোস, এই তো জ্বর ছাড়ছে।'

এরপর বুড়ি যখন আর নড়ে-চড়ে না, তখন তাকে তুলে দেখে সে মারা গেছে। কাহিনির এ-অংশটুকুর টাইপ—১৩৩৮ : বোকার মায়ের জ্বর।

এ-কাহিনির পরের অংশে শেয়াল এসেছে। শেয়ালের ভূমিকা এখানে ঘটকের। সে জোলাকে জানিয়েছে রাজকেন্যের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। বোকা জোলা রাজকন্যাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে (মামা-ভাগ্নে কথার সেই বিয়ে-পাগলা বাঘই কি জোলার ঘাড়ে চাপল! কে জানে!)। শেয়ালকে সে বিয়ের জন্য তাগাদা দেয়। শেয়াল রাজবাড়িতে যায়। রাজা তাকে পাত্র প্রসঙ্গে বিশদভাবে জানতে চান। চতুর শেয়াল পাত্রের গুণের পরিচয় দেয় তির্যকভঙ্গিতে :

দেখতে রাজা বড়ই ভালো।
ঘরময় তার চাঁদের আলো।।
বুদ্ধি তার আছে যেমন।
লেখাপড়া সে জানে তেমন।।
এক ঘায়ে তার দশটা পড়ে।
তার গুণে লোক খায়-পরে।।

জোলার নাম ছিল রাজা। দেখতে সে সত্যিই খুব সুন্দর। তাই শেয়াল বলেছে, 'দেখতে রাজা বড়ই ভালো।' জোলার ঘরে কোন চালের বালাই ছিল না—চাঁদের আলো অবারিত ছিল। কিন্তু শেয়ালের কথার প্যাঁচে রাজা ভাবলেন ভাবী জামাইয়ের প্রাসাদ বোধ হয় তাঁর প্রাসাদের মতই প্রশস্ত—চাঁদের আলোর মতোই ঝকঝকে-তকতকে। বুদ্ধিসুদ্ধি জোলার আদৌ ছিল না, আর লেখাপড়া সে মোটেই জানত না। অতএব 'বুদ্ধি তার আছে যেমন, লেখাপড়া সে জানে তেমন' বক্তব্যে কোন মিথ্যে কথা নেই। কিন্তু রাজ বুঝলেন, জামাই তাঁর খুব বুদ্ধিমান, লেখাপড়ায়ও দিগ্‌গজ। 'এক ঘায়ে তার দশটা পড়ে' একথাও মিথ্যে নয়। জোলা যেমন তাঁত বোনে তেমনি চাষও করে। কাস্তে চালিয়ে সে দশটা ধানগাছ একই সঙ্গে কাটে। কিন্তু শেয়ালের কথায় রাজা ভাবলেন তাঁর ভাবী জামাই বুঝি মস্ত বীর, নইলে কেউ কি এক কোপে দশটা মাথা কাটতে পারে? এ-অংশের টাইপ—৫৪৫ বি : ঘটক শেয়াল রাজকন্যের সঙ্গে রাখালের বিয়ে দেয়।

এ-কাহিনির প্রথম পর্বে যেখানে জোলা তার জ্বরাক্রান্ত বুড়ি মাকে জলে চুবিয়ে মারে, সেই অংশটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সুধী পাঠকের। বাংলা লোককথায় বুড়ি চরিত্রটির বড়ই অবহেলা। তার নির্মম মৃত্যুও বাংলা লোককথায় কৌতুকের বিষয়। বাংলা লোককথায় বুড়ির প্রতি উদাসীনতা নিয়ে আর একটি কাহিনির কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ :

এক দেশে সাত ভাই ছিল। তারা ভারী বোকা। কোন কাজই করতে পারত না। তাই একদিন ওদের বাবা ওদের সবাইকে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিল। সাত ভাই পথে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে তারা এক গ্রামে পৌঁছল। খিদে পেয়েছে, ক্লান্তিতে পথ চলতে পারে না। একটা বাড়িতে এসে তারা বলল, 'আমাদের কিছু খেতে দেবে? আমরা ক্ষুধার্ত। বাড়ির মালিক বলল, 'তোমরা যদি কাজ কর, তবে খেতে দেব।'

সাত ভাই কাজে লেগে পড়ল। খেতে ধান পাহারার কাজ। খেতে ধান পেকে লাল হয়েছে। সাত বোকাভাই ভাবে ওগুলো বুঝি পোকা। তারা লাঠি দিয়ে সমস্ত পাকা ধান মাটিতে ফেলে দিল।

বাড়ির মালিক বোকাদের কাণ্ড দেখে 'থ। সে তাদের বলে, 'ধান পাহারা দিয়ে তোমাদের আর কাজ নেই, খড়গুলো কেটে বাড়ি রেখে এসো।'

সাত বোকাভাই খড় কেটে মালিকের বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার বুড়ি মাকে জিজ্ঞেস করে, 'খড় কোথায় রাখব?'

মা কাজ করছিল। বিরক্ত হয়ে বলে, 'আমার মাথায় রাখ।'

সঙ্গে সঙ্গে সাত বোকা খড়গুলো বুড়ির মাথায় চাপিয়ে দিল। বুড়ি যত ছটফট করে, ততই ওরা খড়গুলো বুড়ির মাথায় চেপে ধরে। এর ফলে এক সময় বুড়ি মারাই গেল।

বাড়ি ফিরে মালিক সব দেখেশুনে বোকাদের ওপর খুবই বিরক্ত হল। সে বোকাদের বলল, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এবার যাও মাকে শ্মশানে গিয়ে দাহ করে এসো।'

বোকারা বুড়িকে খাটিয়ায় তুলে 'হরিবোল' বলতে বলতে লাফাতে লাফাতে শ্মশানের দিকে গেল। তাদের লাফালাফিতে কখন যে বুড়ি খাটিয়া থেকে পথে পড়ে গেছে, সে খেয়ালও তাদের নেই।

ওরা শ্মশানে গিয়ে দেখে খাটিয়ায় বুড়ি নেই। বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ল ওরা। কি করবে এখন? হঠাৎ দেখে পাশেই একটা খেত। সেখানে এক বুড়ি শাক তুলছে। বোকারা ভাবে খাটিয়ার বুড়িই বোধ হয় বেঁচে উঠে শাক তুলছে। ওরা ছুটে গিয়ে সেই বুড়িকে লাঠি পেটা করে মেরে ফেলল। তারপর তাকে দাহ করে বাড়ির পথে রওনা দিল।

ফেরার পথে ওরা দেখে, মালিকের বুড়িমার মৃতদেহ রাস্তার ধারে পড়ে আছে। বোকারা যে তখন কি করবে, ভেবেও কূল পেল না। এমন সময় মালিক সেখানে

হাজির হল। সব দেখেশুনে মালিক বোকাদের বলল, 'তোমাদের ঘরে রেখে আর কাজ নেই—তোমরা যেখানে খুশি যেতে পার।'

এই সাত বোকা উপেন্দ্রকিশোরের 'রাজা'-র মতো জাতে জোলা ছিল কিনা তা জানি না, তারা বুড়ি নির্যাতনে নির্মমতায় অবশ্যই 'রাজা'-র হাত ধরে আছে। এ কাহিনিটিরও টাইপ—১৩৩৮ : বোকার মায়ের জ্বর।

বাংলা লোককথার ভাণ্ডার থেকে আরও একটি বুড়ি-নির্যাতনের কাহিনি হাজির করি। এ-কাহিনির নায়ক এক জোলা অতএব বোকা সে বৈকি।

বোকা জোলা বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল কাঠ কাটতে। পথে সাত চোরের সঙ্গে দেখা। সাত চোর জোলাকে বলে, 'কাঠ বিক্রি করে আর ক'পয়সা পাবি, তার চেয়ে আমাদের দলে আয়—বড় লোক হয়ে যাবি।'

বোকা জোলা চোরেদের কথায় রাজি হয়ে তখুনি তাদের দলে ভিড়ে গেল। সাত চোর তাকে চুরিবিদ্যার অনেক গোপন রহস্য হাতে-কলমে শিখিয়ে দিল। বলল, 'আজ রাতেই তোকে পরীক্ষা দিতে হবে। যে-বাড়ি দেখিয়ে দেবো, সেখান থেকে ভারী-ভারী জিনিস সরাতে হবে—বুঝলি?'

সাত চোরের নির্দেশে সেই রাতেই জোলা গেল এক বাড়িতে চুরি করতে। বাড়িতে ঢুকেই জোলা গেরস্তের খাটের তলা থেকে খুব তাড়াতাড়ি দু'টো চাল-ভর্তি মেটে কলস বার করে সাত চোরের সামনে হাজির করল। চোরেরা মেটে কলস দেখে দারুণ খেপে গেল। বলল, 'তুই একটা আস্ত আহাম্মক। ভারী জিনিস বললে কেউ কি চাল-ভর্তি মেটে কলস আনে? রুপোর বা পেতলের কলস খুঁজিসনি কেন? যাক যা হবার হয়ে গেছে, এবার যেখানে যাবি, চুরি করার আগে জিনিসটাকে বাজিয়ে নিবি—বুঝলি?'

এবার জোলা যে গেরস্তের ঘরে চুরি করতে গেল, তাদের পুজোর ঘরে ঢুকে একটা ঢোল দেখতে পেয়ে সে বেজায় খুশি হল। অন্য সবকিছু ফেলে, সে সাত চোরের কাছে সেই ঢোল বাজাতে বাজাতে হাজির হল। জোলার মাঝরাত্রের ঢোল-বাদনে একটু হলেই বাড়ির লোকজনেরা সব জেগে উঠত আর কি। জোলাকে অতিকষ্টে থামিয়ে, চোরেরা ওকে বলল, 'তুই দেখছি একটা আস্ত গাধা, বাজিয়ে নিতে বলায় তুই কি না শেষে ঢোল বাজিয়ে আনলি।'

এবার আর জোলার ভরসায় না থেকে সাত চোর নিজেরাই এক বাড়িতে চুরি করতে গেল। সাত ঘরে সাত চোর ঢুকল। জোলা ভাবল, আমিই বা বাদ যাই কেন। সে-ও আর একটা ঘর বেছে নিল। সে যে-ঘরে ঢুকল সেখানে এক বুড়ি ঘুমাচ্ছে। বুড়ির মাথার কাছে দু'টি পাত্র। এক পাত্রে দুধ, অন্য পাত্রে চাল। ঘরের কোণে একটা উনুনও আছে।

এসব আয়োজন দেখে জোলার পায়েস খাওয়ার সাধ হল। যথা ইচ্ছা তথা কাজ। উনুন ধরিয়ে, জোলা পায়েস রাঁধতে বসল। ওপাশ থেকে বুড়ির নাসিকা গর্জন শুনে

জোলা ভাবল, বুড়ির বুঝি পায়েস খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে, তাই পায়েস খেতে চাইছে। সে বুড়িকে বলে, 'একটু অপেক্ষা কর বুড়ি। রান্না শেষ হলে, আগে তোমাকেই দেব।'

কিছু পরেই বুড়ির আবার নাসিকা গর্জন শুরু হল। জোলা এবার বিরক্ত হয়ে ফুটন্ত পায়েস হাতায় করে এনে ঘুমন্ত বুড়ির মুখে ঢেলে দিল।

বুড়ি ধড়ফড় করে উঠে বসল। জোলাকে দেখে বুড়ি তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, 'চোর—চোর।'

বুড়ির গলার আওয়াজে তার নাতিপুতিরা উঠে পড়ল। চোরেরা ভয় পেয়ে গেল। সাত চোর আর জোলা দোতলায় উঠল। সেখানে দেখল সারিসারি চাল রাখার পেল্লাই মেটে কলস। কলসগুলোর মধ্যে ঢুকে ওরা লুকিয়ে রইল।

এদিকে বুড়ির ঘরে ঢুকে নাতিরা দেখে পায়েস হচ্ছে--বুড়ির ঠোঁটে-মুখে পায়েস তখনও লেগে আছে। নাতিরা বলে, 'মাঝ রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে পায়েস খাচ্ছিলে বুঝি?'

নাতিদের ঠাট্টায় বুড়ি আরও রেগে যায়। ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলে, 'ওপরে যিনি আছেন, তিনিই জানেন আমি পায়েস খাই নি।'

ওদিকে, বুড়ি যেখানে বসেছিল ঠিক তার ওপরেই দোতলায় বসে বসে বোকা জোলা বুড়ির কথা শুনতে পায়। সে ভাবে, বুড়ি বোধ হয় তাকে দেখে ফেলে, ধরিয়ে দিচ্ছে। 'শুধু আমিই বা কেন, ওরাও কি জানেনা?'— এই বলে সঙ্গীদেরও জোলা দেখিয়ে দেয়।

জোলার গলার আওয়াজ পেয়ে এরপর নাতিরা দোতলায় ধেয়ে আসে। জোলা সমেত সাত চোর পাকড়াও হয়। তাদের প্রচণ্ড পেটানো হয়। মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে সারা শহর তাদের ঘোরানো হয়। এ-কাহিনির টাইপ—১৬৯২ : বোকা ও চোরের দল।

মানতেই হবে, আগের দু'টি কাহিনির মতো এ-কাহিনিতে বুড়ি-নির্যাতন তেমন প্রকট নয়। তবু তলিয়ে দেখলে, ঘুমন্ত বুড়ির মুখে ফুটন্ত পায়েস ঢেলে দেওয়ার মধ্যে বোকামির সঙ্গে এক ধরনের পাশবিক উল্লাসও আছে বৈকি।

এবার এমন একটি কাহিনি শোনাব, যাতে একই সঙ্গে তাঁতি বা জোলা আর নাপিত আছে (বাংলার লোককথায় তাঁতি বা জোলামাত্রই যেমন বোকা, নাপিতমাত্রই ধূর্ত)।

এক তাঁতি, আর এক নাপিত। দু'জনে গলায়-গলায় ভাব। তাঁতি বোকা, নাপিত চালাক। তারা ঠিক করল যে তারা ধান চুরি করবে। এক রাতে বেরিয়ে তারা কারও খেতের সমস্ত ধান কেটে আনল। এবার ভাগ-বাটোয়ারার পালা। নাপিত আগে থেকেই জানায় সে আগার অংশটা নেবে—হলই বা তা পরিমাণে কম। তাঁতি ভাবল তার ভাগেই বেশি পরিমাণে খড় থাকছে। কাজেই সে খুশি। বাড়িতে ফিরে বৌকে সব

কথা জানাতে তাঁতির বৌ বলল, 'ছি-ছি, তুমি কি বোকা! ধান গাছের তলার দিকটা কেউ নেয় নাকি? যাক, যা হবার হয়ে গিয়েছ, এরপর থেকে তুমি আগার অংশই দাবি করবে।'

নাপিত তাঁতির প্রাণের দোসর। বৌয়ের উপদেশের কথাও নাপিতকে সে কবুল করে ফেলল।

তাঁতি-নাপিতের পরবর্তী নৈশ অভিযান স্থির হল একটি আলুর খেতে। স্থান-নির্বাচনের কৃতিত্ব অবশ্য নাপিতেরই। আলু তোলার পালা শেষ হলে যথারীতি ভাগ-বাটোয়ারার পালা শুরু হল। তাঁতি তার বৌয়ের কথামতো ফসলের আগার দাবিতে অনড় রইল। নাপিত তাঁতির দাবি মেনে তলার অংশ নিয়ে এবার বাড়ির পথে রওনা দিল। কাহিনিটির টাইপ—১৬৩৩ : যুগ্ম-মালিকানা।

এটি একটি পশুকথার হুবহু রূপান্তর—যেখানে নাপিতের জায়গায় আছে শেয়াল আর তাঁতির জায়গায় ভালুক। কাহিনিটির টাইপ—৯বি : শেয়াল ও ভালুকের ফসল ভাগাভাগি।

কথা প্রসঙ্গে শেয়ালও এসে গেল। ভালোই হলো। এবার আমাদের জানার চেষ্টা হবে কেন বাংলার লোককথায় জোলা বা তাঁতিকে সর্বত্র এমন বোকা বানানো হয়েছে, কেনই বা নাপিতমাত্রই চালাক-চতুর, বাকপটু, বিয়ের ঘটক আবার গুপ্তচরবৃত্তি করে বেড়ায়, প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসাও। জানাতে হবে বুড়িদের প্রতি বাংলার লোককথা কেন এত নির্মম ও উদাসীন। শেয়ালের সঙ্গে নাপিতের গুণাবলিতে কেনইবা এত মিল!

প্রথমে জোলা বা তাঁতির বোকামির উৎস খুঁজতে চেষ্টা করি। জোলার পেশা তাঁত বোনা। অবসরে সে খেতের কাজও করে থাকে। পেটের অন্ন জোগাতে হবে তো? শুধু তাঁত বুনে তার পোষায় না। উপেন্দ্রকিশোরের রাজা নামের জোলাটিকেও আমরা দেখেছি একাধারে তাঁতের কাজ করতে, মাঠেরও।

তাঁতের কাজই বলুন আর চাষের কাজই বলুন, কোনটাই আমাদের সমাজের চোখে কোনদিনই তেমন কদর পায়নি। সমাজের যাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, চিরদিনই তাঁরা শ্রমজীবী মানুষকে ছলেবলে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছেন। লোককথা মূলত শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষের মুখের কথা (এবং প্রাণের কথাও)হলেও, কৌশলে সমাজপতিরা তাতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢোকাতে চেয়েছেন জোলাকে বোকা বানিয়ে। চরিত্র-চিত্রণে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের এই ধরনের অবমূল্যায়নের প্রয়াস লোককথায় খুবই কৌতূহলপ্রদ।

এবার বাংলা লোককথার নাপিত চরিত্রটি। নাপিতের কথা এলে শেয়ালের কথা মনে পড়বেই। কেবল ফসলের ভাগ-বাটোয়ারাতেই নয়, এই নাপিতের চরিত্রের সঙ্গে শেয়ালের চরিত্রের বিস্তর মিল আছে। বলা হয়ে থাকে, পশুকথা যেহেতু সবচেয়ে আগে লেখা হয়েছিল, অতএব তারই প্রভাব পড়েছে অন্য লোককথায়। কিন্তু এমন সহজ সমাধান কি সর্বদা ঠিক?

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলে। আমরা দেখি নাপিতেরা স্বভাবতই চতুর এবং বাকপটু। ক্ষৌরকর্মে প্রয়োজন হয় ক্ষুর-কাঁচি ইত্যাদির। সেসব দিয়ে নাপিত শুধু চুল-দাড়িই কাটে না, ফোঁড়া-ফোসকা ইত্যাদির ছোটোখাটো অস্ত্রোপচারও করে থাকে। পেশাগত কারণেই তাকে গাঁয়ের সব পরিবারের সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ রাখতে হয় নিত্যই। সুতরাং বিয়ের ঘটক হওয়া কিংবা গুপ্তচরের বৃত্তি গ্রহণ করা চতুর নাপিতের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা নয়। শুধু বিয়ের ঘটকের ভূমিকায়ই বা বলি কেন, বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানেও সে পুরোহিতের পাশাপাশি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তার তাৎক্ষণিকভাবে নবপরিণীত বর-বধূর সামনে ছড়া-কেটে বচন শোনানোর মধ্যে বাক্‌কুশলতার পরিচয়ই ফুটে ওঠে।

এখন বুড়ির কথায় আসি। আমাদের অভিজ্ঞতায় একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের ঠাকুমা-দিদিমা প্রমুখ বুড়িরা কিন্তু খুবই আদরণীয়। তাদের মুখ থেকেই আমরা একদা লোককথার ব্যঙমা-ব্যঙমি কিংবা রাজকন্যে-রাজপুত্তুরের কত গল্প শুনেছি, অথচ সেই লোককথাতেই তাদের কী করুণ অবস্থা। নিঃসন্দেহে এটি ভাবনার বিষয়।

আবেগরহিত মনে সমস্ত বিষয়টি ভাবলে মনে হয় কট্টর বাস্তববাদী চোখে লোককথায় বুড়িদের এই করুণ অবস্থা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। বয়স হলে মানুষ অশক্ত হয়ে পড়ে, উৎপাদন বাড়ানোর কাজে লাগে না। তারা সমাজে উদ্বৃত্ত বলে বিবেচিত হয়। াবাদি পশুরা বয়সজনিত কারণে অসমর্থ হয়ে পড়লে সীমান্ত বাংলায় এখনও পশুবধের রেওয়াজ আছে। লোককথায় বুড়ি-নির্যাতনের নেপথ্যে ঐ-প্রথার প্রভাবও থাকতে পারে। কেননা, বাংলার লোককথাকে সীমান্ত বাংলার আদিবাসীসমাজ নানাভাবেই প্রভাবিত করেছে।

সংসারজীবনে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের কথায় জামাইরা বাদ যেতে পারে না। বাংলার লোকসমাজে জামাইদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে বিস্তর মজাদার কাহিনি প্রচলিত আছে। বিয়ের রাতে শ্যালিকার সঙ্গে, পরবর্তীকালে শাশুড়ির সঙ্গে জামাইকে নিয়ে এমন এমন কাহিনি শোনা যায় যা শেষ পর্যন্ত শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে। তবে সমস্ত লোককথাতেই জামাই চরিত্রটিকে বোকা, লোভী ও অপদার্থ হিসেবে আঁকা হয়ে থাকে। একটি উদাহরণ—এটি একটি লম্বা কাহিনি :

বিয়ের পর নতুন জামাই এসেছে শ্বশুড়বাড়িতে। বেরোবার আগে মা তাকে পই-পই করে বলে দিয়েছে, 'শ্বশুড়বাড়িতে গিয়ে সকলকে প্রণাম করিস বাছা, খেতে যখন বসবি তখন আসনপিঁড়ি হয়ে পা মুড়িয়ে বসিস' ইত্যাদি ইত্যাদি।

জামাই বাবাজি শ্বশুড়বাড়িতে এসে ছোট-বড় সবাইকে একধারসে প্রণাম করতে শুরু করেছে, এমন কি ঘোমটায় ঢাকা নিজের বৌটিকেও!

এ-কাহিনিটির টাইপ—১৫৬২ : হুবহু হুকুম মানা।

জামাই বাবাজিকে তো এবার খাওয়ার জন্য আপ্যায়ন করা শুরু হল। থুড়ি, বলতে

ভুলেছি, মায়ের পুত্রের প্রতি উপদেশের মধ্যে এটিও ছিল, 'বাছা শ্বশুরবাড়িতে যখন কোথাও বসবি, উচ্চাসনে বসবি।'

তা, জামাই তো শ্বশুরবাড়ি এসে পেন্নামের পালা চুকিয়ে একেবারে ঘরের চালের ওপর গিয়ে বসে আছে। শ্যালক-শ্যালিকারা যতই বলে, 'জামাইবাবু নেমে আসুন।' জামাই বলে, 'হুঁ হুঁ, বাবা, যার-তার নয়—খোদ মাতৃ-উপদেশ। এত সহজে নামছি নে।' এ-কাহিনির টাইপ আগেরটিরই মতো—১৫৬২ : হুবহু হুকুম মানা।

যাই হোক, হাতে-পায়ে ধরে, অনেক অনুনয়-বিনয় করে জামাই বাবাজিকে তো চালের ওপর থেকে নামানো হল। এবার সে খেতে বসবে। মায়ের উপদেশ তার মাথায় আছে, 'যখন বসবি, পা মুড়ে বসবি।'

সপ্তব্যঞ্জনের থালা সাজানো। জামাইকে খাওয়ানো বলে কথা। জামাই মাছের মুড়ো খেতে ভালোবাসে, অতএব সেটিও পাতে পড়েছে। শাশুড়ি নিজের হাতে রান্না করেছেন, অতএব তিনিও ঘোমটা মাথায় বাবাজির সামনে বসে আছেন। জামাই খাচ্ছে বেশ জুৎ করেই। সবে তখন সে মাছের মুড়োটায় মুখ দিয়েছে, হঠাৎই দেখা গেল তার পায়ের আঘাতে মুড়ো-সমেত বাটিটা তীব্র বেগে আছাড় খেল শাশুড়ির কপালে। সেই আকস্মিক আঘাতে শাশুড়ি ঠাকুর'ন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। শ্বশুরমশাই আর শ্যালকেরা ভাবলেন, মুড়োর রান্নাটা তেমন জমেনি বলে জামাইয়ের এহেন আচরণ। তাঁরা তখন জামাই বাবাজিকে উচিতশিক্ষা দিয়ে বিদেয় করলেন। আসলে কিন্তু জামাইয়ের এ-আচরণে কোন পূর্ব-পরিকল্পনা কাজ করেনি, কিংবা বলা যায়, সত্যিই যদি কোন পরিকল্পনা থেকে থাকে, তাহলে ঐ পা মুড়ে বসা। হঠাৎ পায়ের বাঁধন খুলে যেতেই বিপত্তি! এ কাহিনির টাইপও যথারীতি পূর্ববৎ—১৫৬২ : হুবহু হুকুম মানা।

বোকা জামাইকে নিয়ে আরও একটি কাহিনি :

জামাই নিজেই গরুগাড়ি চালিয়ে শাশুড়িকে বাড়ি নিয়ে আসছে। আসতে আসতে মাঠের মধ্যে গাড়ির চাকায় ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দ শুরু হল। জামাইয়ের মনে হল, গাড়ির শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাই সে অমন আর্তনাদ করছে। শেষ-সময়ে মুখে জল দেওয়া দরকার। অতএব জল খাওয়ানোর জন্য শাশুড়ি-সমেত গাড়িটাকে সে পুকুরের মধ্যে অনেকক্ষণ চুবিয়ে রাখল। এতে গাড়ির মৃত্যু হোক বা না হোক, শাশুড়ি ঠাকুরন মারা গেলেন। বলতে ভুলেছি, এ-জামাইটি আবার যে-সে জামাই নয়, রীতিমত শ্বশুরের অন্নধ্বংস করা ঘরজামাই। এ-কাহিনিটির টাইপ—১৬৮৫ : বোকা জামাই।

ঘরজামাইয়ের কথা যখন এসেই গেছে তখন আর একটি ঘরজামাই-কথা শোনা যাক :

শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে জামাই গেছে, সরেজমিনে তাঁর জমি পরিদর্শনে। শ্বশুর মশাইয়েরে জমি মানেই তো ভবিষ্যতে তারই জমি। কেননা তার বৌ শ্বশুরের একটিই

সন্তান। একটা বড় পুকুর দেখে বোকা জামাই শ্বশুরের সঙ্গে আমড়াগাছি জুড়ল, 'এ পুকুরটা কে কেটেছে?'

প্রশ্ন শুনে বিজ্ঞ শ্বশুরমশাই বিরক্ত, তবু বলেন, 'কেন? আমিই কাটিয়েছি।'

জামাইয়ের পরবর্তী প্রশ্ন, 'পুকুর যে কাটালেন; তা মাটিগুলো সব গেল কোথায়?'

শ্বশুরমশাই আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না। ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'অর্ধেক মাটি খেয়েছেন তোমার বাবা। কেননা, তোমার মতো একটা অপদার্থকে তিনি জন্ম দিয়েছেন। আর অর্ধেক মাটি খেয়েছি আমি, কেননা তোমার মতো একটা আহম্মকের হাতে আমার মেয়েকে তুলে দিয়েছি।' এ কাহিনির টাইপ—১৬৮৫ : বোকা জামাই।

বাংলার লোককথায় জামাইয়ের চরিত্রটিকে বোকা হিসেবে আঁকার পেছনে কিছু মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকতে পারে। একটি পরিবার থেকে হঠাৎই একদিন জামাই কোন মেয়েকে বিবাহসূত্রে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। সত্যি বটে, এতে অভিভাবকদের অনুমোদন থাকে। কিন্তু পরিবারের কোন সদস্যই মনের দিক থেকে ব্যাপারটিকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারে না। বিশেষত, শিশু ও মেয়েমহলে ঘটনাটি গভীর রেখাপাত করে। তাদের মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভই লোককথায় বাণী পায়—বেচারা জামাই বোকা বনে যায়।

আর তার ঘরজামাই অবস্থা তো আরও করুণ। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও, সে মেয়ের বাড়ির সম্পত্তিতে ভাগ বসায়। মেয়েকে নিজের বাড়ি না নিয়ে গেলেও, তার রেহাই নেই। বরং তার শ্বশুরবাড়ি-অবস্থানই পরিবারের অন্য সদস্যদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। সামাজিকভাবে যে ক্ষোভ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, কাহিনির মধ্যে তা ফুটিয়ে তুলেই মানুষ আত্মতৃপ্তি বোধ করে।

এবার এমন কিছু রঙ্গকথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে যাদের সঙ্গে কোন বিশেষ স্থানের নাম জড়িয়ে আছে। স্থানিককথা না হলেও, এদের বিশেষ উৎসভূমি চিনে নিতে আমাদের কোন ভুল হয় না। এই যেমন শান্তিপুরের মেয়েদের নাকি রসিকতায় জুড়ি মেলা ভার, ঢাকার কুট্টিদের রসিকতা শুনে নাকি ঘোড়ারও হাসি পায়, উলো-গুপ্তিপাড়ার মানুষেরা নাকি রঙ্গ-তামাশাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে গোপাল-হেন বুদ্ধিমান লোকও শ্বশুরবাড়ি যেতে ভয় পায়।

শেষ থেকেই শুরু করি :

গোপাল একদিন উলো-গুপ্তিপাড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পরনে তার ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে গরদের চাদর। গোপালের ঐ বাহারি পোশাক দেখে তার শ্বশুরবাড়ির দেশের এক রসিকের ইচ্ছে হল গোপালকে একটু অপ্রস্তুতে ফেলার।

সেই লোকটা পাশের এক ডোবা থেকে কাদা গায়ে মেখে গোপালকে আচমকা জড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ে দিল, 'ওরে আমার প্রাণের দাদারে, এতদিন কোথায় ছিলিরে।

দাদু যে তোর কথা চিন্তা করতে করতে স্বর্গে গেলরে, সেই এলি, আরও ক'টা দিন আগে এলি না কেন রে।'

গোপালের বুঝতে অসুবিধা হল না, উলো-গুপ্তিপাড়ার কোন পাজি লোকের পাল্লায় সে পড়েছে—মরা-কান্না আসলে লোকটার ছল। সেও হারবার পাত্র নয়। সে তখন নিজের হাতের চেটোয় পেচ্ছাপ করে, লোকটার চোখেমুখে ছিটিয়ে দিয়ে বলল, 'ওরে আমার প্রাণের দোসর ভাইরে, দাদু কি কারো চিরকাল বেঁচে থাকে রে।'

পাজি লোকটা গোপালকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হল। সে 'অ্যাক থুঃ থুঃ' করতে করতে পুকুরের দিকে ছুটে গেল। এ-কাহিনির মোটিফ—কিউ ২৭০ : দুষ্কর্মের জন্য শাস্তি। উলো-গুপ্তিপাড়া আর গোপালকে জড়িয়ে আরও একটি রঙ্গকথা :

গোপাল শ্বশুড়বাড়ি বেড়াতে গেছে। এক রসিক প্রতিবেশী এসে গোপালকে বলে, 'এখানে তোমাকে মানাবে ভালো, বাঁদরের উৎপাত এখানে খুব বেশি। যদি আগে দেখে না থাকো, দেখে নিতেও পারবে।'

গোপাল এমন কটাক্ষ নীরবে হজম করার পাত্র নয়। সে বলে, 'মশাই এর আগে আমি ঢের বাঁদর দেখেছি, কিন্তু আপনার মতো অসভ্য বাঁদর কোথাও দেখিনি।' এ-কাহিনির মোটিফ—এক্স ১০ : ব্যঙ্গ ও ঠাট্টা।

এবার ঢাকার ঘোড়াগাড়ির চালক কুট্টিদের নিয়ে কিছু রঙ্গকথা। উর্দু আর ঢাকার আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণে কুট্টিদের রসালাপ জমে ওঠে।

প্রথম কাহিনি :

পুরনো ঢাকার চকবাজারে একটি টুপি বিক্রির দোকান। সেখানে টুপির দর-দাম নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে তুমুল বিবাদ। বিক্রেতা যে দর হাঁকে, ক্রেতা তা দিতে নারাজ। অথচ টুপি কেনা তার চাই এবং ঐ দোকান থেকেই। খরিদ্দারটিকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না দেখে তার প্রতি দোকানির পরামর্শ, আপনার কাম না চকবাজার থন টুপি কিনুনের। এক কাম করেন, আপনারে এউগা হালা-ভালা বুদ্ধি দেই : ঐ-যে মাইড্যা হাড়ির দুকান আছে না, হেই হানে দুগা কাম হইয়া যাইব, বুঝননি? চিড়া বিজাইয়া খাইবারে পারবেন, আবার টুপির লাহান মাথায় ভি দিবারে পারবেন। দ্যাখলেন তো মিঞা, আপনার ছমছ্যার কি রহম ছমাদান কইরা দিলাম। আর আমি ভি হালায় বাঁচলাম। এ-রঙ্গকথার মোটিফও আগের মতই—এক্স ১০ : ব্যঙ্গ ও ঠাট্টা।

দ্বিতীয় কাহিনি :

ঢাকা শহরের একটি ছবি তোলার স্টুডিও। স্টুডিওটি দোতলার ওপর। রাস্তা থেকে সোজাসুজি উঠে গেছে ধাপে ধাপে সিঁড়ি। যাঁরা ঐ স্টুডিওয় ছবি তুলতে চান, ঐ সিঁড়ি দিয়েই তাঁদের ওপরে উঠতে হবে।

বর্ষাকাল। বৃষ্টিতে বাইরের রাস্তা কর্দমাক্ত। ঘোড়াগাড়িতে চেপে এক কেতাদুরস্ত

বাবু এলেন স্টুডিওয় ছবি তুলতে। ঘোড়ার গাড়িটি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু পরে, ছবি তোলা হয়ে গেল ব্যস্ত-সমস্ত পদে বাবুটি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন, আর তখুনি ঘটল বিপত্তি। পায়ের চটি জুতো ধুতির খোটে আটকে বাবুটি কুপোকাৎ। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ গড়াগড়ি খেতে খেতে তিনি একেবারে মাটিতে এসে লুটিয়ে পড়লেন। ধোয়া জামা-কাপড় জলকাদার ছোপে বিচিত্র রূপ নিল। পা ফুলে কলা গাছ, শিরদাঁড়া টনটন করছে ব্যথায়।

ইতিমধ্যে কুট্টি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসে তাঁকে বলল, 'বাবু পড়ছেন মারাত্মকভাবে, লাগছেও খু-ব, কিন্তু চলছেন এক্কেবারে হাওয়ার মতো!'

গভীর যন্ত্রণার মধ্যেও বাবুটি কিন্তু না হেসে পারেননি! এ-কাহিনির মোটিফ—এক্স ১০ : ব্যঙ্গ ও ঠাট্টা।

ঢাকার কুট্টি অর্থাৎ কোচোয়ানরা সাধারণত পথে যেতে যেতে সওয়ারিদের অবসর বিনোদনের জন্যই রঙ্গ-তামাশার গল্প জুড়ত। কুট্টিদের চুটকিকথা সওয়ারিদের কাছে উপরি-পাওনা না মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল, তা এখন গবেষণার বিষয়। সে-কথা থাক, তার চেয়ে বরং আর একটা চুটকি শোনা যাক। এ-কথায় কুট্টি কথকমাত্র, অন্য দুটি কথার মতো নিজেকে সে জাহির করে নি :

এক জুতোর দোকানের মালিক তাঁর ভাইপোকে বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে এনে তাঁর দোকানে বসান। বয়েস হয়েছে, তাই তাঁর ইচ্ছে তিনি থাকতে থাকতেই ভাইপো দোকানের কাজকর্ম বুঝে-পড়ে নিক।

একদিন তিনি ঘন্টাখানেকের জন্য কোন কাজে বাইরে যাবেন। দোকান ছেড়ে যাবার আগে ভাইপোকে পঁই পঁই করে বলে গেলেন, 'কাউরে জুতা ধারে বিক্রি করবা না, টাকা-পয়সা গুইনা গুইনা বাক্সের ভিতর রাখবা।'

বলতে গেলে সেদিনই হচ্ছে ভাইপোর দোকানি-জীবনের হাতে খড়ি। এতদিন সে জ্যাঠামশাইয়ের পাশে বসে বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, কিন্তু স্বাধীনভাবে তা প্রয়োগ করার সুযোগ পায়নি। আজ পেল।

জ্যাঠামশাই দোকান ছেড়ে চলে যাবার পর, বরাত ভালো তার, একজন খরিদ্দার এলেন। ভাইপো তাঁকে ধৈর্য ধরে অনেক জুতো দেখাল। এক জোড়া জুতো পছন্দ হল। খরিদ্দারটি দেখলেন গোটা পাঁচেক টাকা কম আছে তাঁর পকেটে। যা আছে তা দিয়ে তিনি জুতো হাতে নিয়ে, ভাইপোকে বললেন, 'এই টাকাগুলো রাখেন, বাকিটা বাসা থিকা আইনা এহুনি দিতেছি।'

ভাইপো পড়ে উভয়সঙ্কটে। জ্যাঠামশাইয়ের কড়া হুকুম, কাউকে যেন সে ধারে না বিক্রি করে। আবার এও তার জানা আছে, খরিদ্দার লক্ষ্মীর সমান—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই।

নিমেষমাত্র চিন্তা করেই ভাইপো তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল। সে খরিদ্দারের

হাত থেকে জুতো জোড়া নিজের হাতে নিয়ে, আবার তাঁকে ফেরৎ দিল। খরিদ্দারটি তাঁর বাসার দিকে জুতো জোড়া নিয়ে রওনা দিলেন।

কিছু পরে জ্যাঠামশাই দোকানে ফিরে আসেন এবং শোনেন যে ভাইপো এক অপরিচিত খরিদ্দারকে ধারে জুতো বিক্রি করেছে। খরিদ্দারটি এখন বেপাত্তা। ঘটনাটি শুনে তিনি ভাইপোকে যৎপরনাস্তি ভর্ৎসনা করে বললেন, 'এহন যদি খরিদ্দারটি আর না আসে?'

ভাইপো মিটিমিটি হাসে আর বলে, 'যাইবেন কই? অনারে আইতেই অইব।'

ভাইপোর কথা শেষ হতে না হতেই সেই খরিদ্দারটি দোকানে এসে হাজির। রাগতস্বরে জুতোর বাক্সটি তিনি ভাইপোর মুখের ওপর ছুড়ে বললেন, 'জুতোর মাপ লইয়া এ কী দিহেন? এক পাটি মাপসই, আর একটি ছুট?'

ভাইপো কাচুমাচু হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে সবিনয়ে ঠিক মাপের জুতোটি খরিদ্দারটির হাতে তুলে দিল। খরিদ্দারটিও তখন বাকি টাকাটা দিয়ে, জুতো নিয়ে চলে গেলেন।

খরিদ্দারটি দোকান ছেড়ে চলে যাবার পর, জ্যাঠামশাই ভাইপোকে পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তুই যে এহনি আমারে ছাড়াইয়া গেলি!' এ-কাহিনির মোটিফ—কে ১০০ : প্রতারণার মাধ্যমে লাভ।

এবার শান্তিপুরের মেয়েদের নিয়ে একটি রঙ্গকথা :

আত্মীয় এসেছে। অনেকক্ষণ গল্পগুজব হয়েছে। গৃহস্থের তরফ থেকে একবারের জন্যও অতিথিকে খাওয়ার বা থাকার অনুরোধ করা হয়নি। আত্মীয় যখন বাড়ি ফেরার জন্য নৌকায় পা বাড়িয়েছে, তখন গৃহবধূর তীরে দাঁড়িয়ে উক্তি, 'আজকের দিনটা থেকে গেলে হত না?' এ-কাহিনির মোটিফ—৯০০ : মিথ্যে বলে হাস্যরস সৃষ্টি।

রংপুরের মেয়েরাও কি শান্তিপুরের মেয়েদের মতোই রসিকা? এবার ওখান থেকে সংগৃহীত একটি রঙ্গকথা ভাষান্তরে শোনাই :

বাড়িতে কুটুম এসেছে। অথচ গৃহকর্তা বাড়ি নেই। গৃহিণী ভাবে, কুটুমকে এখন কি দিয়ে আপ্যায়ন করি? ভাবতে ভাবতে গৃহিণীর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। স্থির করল যে কথার মারপ্যাঁচেই বাজিমাৎ করতে হবে। সে কুটুমকে সহাস্যে বলল, 'বসুন না কেন? উনি যে কোথায় গেছেন জানি না। কখন আসবেন, তাও জানি না। বাড়িতে যদি পান-সুপারি থাকত, তবে চুন না হয় পড়শির কাছে ধার করে আনতাম, কিন্তু এদিকে আবার খয়েরও নাই দেখছি।'

'আর একদিন আসব' বলে কুটুম যে-পায়ে এসেছিল, সেই পায়েই ফিরে গেল। এ-কাহিনির টাইপ আর্নে-টমসন সূচিতে অনির্ধারিত—২৪১১।

এবার ছড়ায় বলা এমন তিনটি রঙ্গকথা শোনাব, যাদের উৎসভূমির চিহ্ন ছড়ার মধ্যেই যেন ছড়িয়ে আছে।

প্রথমটি ও-বাংলার একটি দরবারি শিলুক :

বহুদিন পরে প্রবাসী স্বামী ঘরে ফিরে দেখে তার স্ত্রী অল্পবয়সি একটি ছেলেকে পুকুরপাড়ে গোসল করাচ্ছে; অথচ তার নিজের কোন ছেলেপুলেই নেই! কৌতূহলী স্বামী তখন ছেলেটির পরিচয় ছড়ায় জানতে চাইছে এইভাবে:

শাঁখাহাতি বলি তোরে
পুলা ধুস তুই কার ঘরের?

চতুরা স্ত্রী হেঁয়ালি ভাষায় জবাব দেয় :

পুলার বাপ যার শ্বশুর
তার বাপ আমার শ্বশুর।

জবাবটির নিহিতার্থ হল, ছেলেটি আসলে স্ত্রীর ভাই। অর্থাৎ স্বামীর শ্যালক। এটি একটি ধাঁধা। আপাত বিচারে যেকোন ধাঁধা মূলত বুদ্ধি-নির্ভর এবং এ-ধাঁধাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এ-ধাঁধার বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এই যে ফয়শালা হয়ে গেলে, এর কাহিনি-রস বুদ্ধিকে অতিক্রম করে সরাসরি হৃদয়কে হানা দেয় এবং এক মনোরম রঙ্গরসের সৃষ্টি করে। এ-ছড়াকাহিনির মোটিফ—এইচ ৫৩০ : ধাঁধা।

দ্বিতীয়টি বাংলার শাশুড়ি-বৌয়ের চিরন্তন বিবাদকথার অনুপম শব্দচিত্র। বৌ ঘনঘন হাই তুলছে, তা দেখে বিরক্ত শাশুড়ির শাপান্ত :

ঘনঘন হাই।
মরুক বৌয়ের ভাই।।

দজ্জাল বৌ মুখবুজে শাশুড়ির অভিসম্পাৎ সহ্য করবে কেন? সে-ও তাই মুখের ওপর ছড়া কেটেই জবাব দেয় :

হাই তোলার একী জ্বালা।
মরুক শ্বশুরের শালা।।

এ-ছড়াকথার মোটিফ—এম ৩৯২ : অভিশাপ।

এবার যে-কাহিনিটি শোনাব, সেটিও বাঙালিয়ানায় পূর্ণ এবং ছড়াশ্রয়ী—ছড়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর যা-কিছু মজা, যা কিছু রঙ্গরস। কাহিনিটি এ-রকম :

খাদ্যের সন্ধানে মশা মশাই বাইরে বেরিয়েছেন। তাঁর চার গৃহিণীরা ঘরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কখন তিনি ফিরে আসেন। অনেক সময় পার হয়ে যায়, তবু মশা মশাইয়ের ফেরার নামটি নেই। গৃহিণীরা চিন্তিত। তাঁরা নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিয়েছেন মশা মশাইকে নিয়ে।

এক নম্বর গৃহিণী বললেন :

কাঠ কাটছেন, ভার বইছেন প্রভু,
কিছু নিয়ে আসছেন বা।

অর্থাৎ মশা মশাই কাঠ কেটে, ভার প্রস্তুত করে—একেবারে খাবার মজুত করে নিয়ে আসছেন। আর সেই কারণেই তাঁর আসতে বিলম্ব হচ্ছে।

দু'নম্বর গৃহিণী অতটা আশাবাদী নন। তাঁর অনুমান, এখনও খাবার জোগাড় করে উঠতে পারেননি তাঁদের প্রভু, তবে চেষ্টায় আছেন :

মশারির চার কোণে
প্রভু গান গাইছেন বা।

তিন নম্বর গৃহিণী আর এক ধাপ এগিয়ে বলেন :

ধূপের ধোঁয়া, পাখার বাতাস,
প্রভু কোণ নিয়েছেন বা।

চার নম্বর গৃহিণী? তিনি প্রভুকে পটল তুলিয়েই বসে আছেন :

পটাস কামড়, চটাস চাপড়,
প্রভু মরে গিয়েছেন বা।

সাধারণত ছড়ার মধ্যে টাইপ খোঁজা বিড়ম্বনার ব্যাপার। কেননা, প্রায়শই কোন নিটোল কাহিনি তাতে থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ছড়ার আকর্ষণ বেশি হলেও, কাহিনিও আছে। এ-কাহিনির টাইপ—৯৩০ : ভবিষ্যদ্বাণী। এই সুযোগে আরও দু'একটি কথা বলে নিতে চাই। এ-আলোচনায় বেশ কয়েকটি রঙ্গকথার টাইপ উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, কাহিনির শেষে কেবল মোটিফ নির্ণয় করেছি। টাইপ-উল্লেখে এই অপারগতার পেছনে একটি কারণ অবশ্যই নিটোল কাহিনির অভাব। কিন্তু এরই সঙ্গে স্মরণীয় যে টাইপ-নির্ণয় শুধু সেইসব কাহিনির সম্ভব—যা পরম্পরাগত এবং একই ছাঁচে ঢালা। এ-প্রবন্ধের প্রারম্ভে বানার্ড শ' কিংবা হেবম্বচন্দ্র মৈত্রকে নিয়ে রঙ্গকথা অথবা গোপালের হাস্যকথা—যা এখানে উৎকলিত হয়েছে, কিংবা ঢাকাই কুট্টিদের চুটকির সেই অর্থে কোন ঐতিহ্য বা পরম্পরা নেই। সমষ্টিমানসের পরিবর্তে ঐসব রঙ্গকথায় ব্যক্তি-মানসের প্রতিফলনই ঘটেছে—যা আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত। কাজেই লোককথার টাইপ ঐসব রঙ্গকথায় থাকতে পারে না, কিছু কিছু অভিপ্রায় বা মোটিফবৈশিষ্ট্য আছে—যেমন যেমন পেয়েছি, শুধু তারই উল্লেখ করেছি।

ব্যতিক্রমী রঙ্গকথা

কোন চরিত্রবৈশিষ্ট্য দিয়ে কাউকে চেনা লোককথার একটি জনপ্রিয় মোটিফ (এইচ ৩০)। রঙ্গকথা যেহেতু লোককথারই শাখা অতএব তার ছকে বাঁধা চরিত্রগুলিও মোটিফের দ্বারা শনাক্ত করা সম্ভব।

তবে সবকিছুরই ব্যতিক্রম থাকে। রঙ্গকথায়ও ব্যতিক্রমী কিছু কাহিনি আছে যা ঠিক ছকে বাঁধা নয়। তেমনি এক ব্যতিক্রমী ব্রাহ্মণ-চরিত্রের কথা এখন শোনাব। বাংলা লোককথার ছকে ব্রাহ্মণ হল বোকা, গরিব আর লোভী। এখনকার ব্রাহ্মণ কিন্তু প্রাথমিকভাবে গরিব এবং লোভী হলেও, মোটেই বোকা নয়। সরাসরি কাহিনিতে ঢুকে পড়ি :

এক গাঁয়ে থাকে এক ব্রাহ্মণ যুবক। সে বেশ গরিব। বাপেব আমলের এক মাটির ঘরে তার বাস। বিয়ে-থা করেনি। ভিক্ষে করেই সে দু'বেলা দু'মুঠো কোনমতে জোগাড় করে নেয়।

যুবকটির বাড়িতে আছে এক পেল্লাই তেঁতুল গাছ। সেই গাছে বাস করেন এক প্রবীণ ব্রহ্মদৈত্য। বাপের আমল থেকে আছেন তিনি। যুবকের সংযম আর নির্লোভতা দেখে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। যুবকটিকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। গাছের ওপর বসে সর্বদা নজর রাখেন তিনি যাতে যুবকের কেউ কোন ক্ষতি করতে না পারে।

ঐ-গাঁয়েই থাকে গজানন নামে এক সদাগরের ছেলে। বাপের মৃত্যুর পর সে-ই এখন সব সম্পত্তির মালিক। বাপ-মরা ছেলেটা মায়ের আদরে বাঁদর হয়েছে। দিনরাত আমোদ আর ফুর্তিতে দু'হাতে টাকা ওড়ায়। বিস্তর সাগরেদও জুটে গেছে তার।

তা, এ-হেন গজাননের হঠাৎই খেয়াল হয়েছে গায়ক হওয়ার। বড়লোকের খেয়াল বলে কথা। ভেতরে সংগীতবোধ থাক বা না থাক, গানের রেওয়াজ করুক বা না করুক—তবু সে গায়ক হবে। সঙ্গী সুখের পায়রারা তাকে গায়ক বানিয়েই ছাড়বে। সে যা-ই গায় তাতেই সঙ্গীরা তোবা দেয়। কিন্তু কেবল সঙ্গীদের তোবায় গজাননের মন ভরে না। অতএব প্রতিবেশী-পরিচিত সকলকেই সে তার সংগীত-সুধা পানে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, যে একবার তার গান শোনে, ভুলেও আর ওমুখো হয় না। ভর দুপুবে সদলবলে সে যখন তারস্বরে গান শুরু করে তখন পড়শিরা 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাকে মনে মনে। দেখলেই সবাই দরজা বন্ধ করে দেয়।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন গজানন ব্রাহ্মণ যুবকটির ঘরে আসে। যুবকটিকে সে বলে,

'তুমি সারাদিন ভিক্ষে করে আর কি পাও? এর চেয়ে ঘরে বসে বরং আমার গান শোনো, আমি তোমায় প্রতিদিন পাঁচ টাকা করে বকশিস দেব।'

যুবক ভেবে দেখে প্রস্তাব মন্দ নয়। সে রাজি হয়ে যায় গজাননের কথায়। অতএব পরদিন সকাল থেকে ব্রাহ্মণ যুবকের ঘরে শুরু হয়ে যায় গজাননের সংগীত পরিবেশনের নামে আসুরিক কণ্ঠনিনাদ। ব্রাহ্মণ যুবকের কানের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার জোগাড়, বৃক্ষবাসী ব্রহ্মদৈত্য পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তবু ব্রাহ্মণ যুবকের মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে সবকিছু সহ্য করতে হচ্ছে।

দিন কয়েকের মধ্যেই ব্রাহ্মণ যুবকটির গান শুনে টাকা রোজগারের সাধ মিটে গেছে। সে এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বেসুরো গলার গান শোনার কী জ্বালা। কান দু'টো বধির হবার জোগাড়, প্রাণ ওষ্ঠাগত। অথচ গজাননকে কিছুই বলার জো নেই। সে নিজেই তো গজাননের গান শোনার প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল।

পরিত্রাণের আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে ব্রাহ্মণ যুবক করল কি, চুপিচুপি এক সকালে নিজেই নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

ব্রহ্মদৈত্য তেঁতুলগাছে বসে বসে সবকিছুই প্রত্যক্ষ করলেন। ব্রাহ্মণ যুবককে একা এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তিনিও তার পিছু নিলেন। যেতে যেতে পথে তিনি যুবকটিকে বললেন, 'গজাননের গানের জ্বালায় আমিও বড় জ্বলছিলাম, কিন্তু তোমার অতিথি বলে ওকে কিছু বলতে পারছিলাম না। তোমাদের বাড়ির তেঁতুল গাছে আমি বহুকাল ছিলাম—সেই তোমার পিতৃদেবের আমল থেকে। তোমার কাছে আমি ঋণী। যাবার বেলায় তোমাকে আমি একটা উপকার করে যেতে চাই, যাতে সারাটা জীবন তুমি সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করতে পার।'

ব্রহ্মদৈত্যের কথায় ব্রাহ্মণ থমকে গেল। ব্রহ্মদৈত্য তখন ব্রাহ্মণকে বললেন, 'আমি এখন পাশের রাজ্যের রাজবাড়িতে চললাম। সেখানকার রাজকন্যার দেহে আমি প্রবেশ করব। রাজকন্যা তখন অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করবে। রাজকন্যার অসুখ হয়েছে ভেবে রাজা হাকিম-বদ্যি ডাকবে। কেউই কিছু করে উঠতে পারবেনা। তুমি তখন রাজার কাছে গিয়ে বলবে রাজকন্যার অসুখ সারাবার নিদান তোমার জানা আছে। তোমাকে দেখামাত্র আমি রাজকন্যার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব। ব্যাস, কেল্লা ফতে। রাজকন্যা ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠবে। রাজা খুশি হয়ে তখন নিশ্চয় তোমায় অনেক কিছু উপঢৌকন দেবে।'

ব্রহ্মদৈত্য উড়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে নিশ্চয় পাশের রাজ্যে পৌঁছেও যাবেন। কিন্তু যুবক ব্রাহ্মণের পক্ষে যাওয়া তো অত সহজ নয়। হেঁটে হেঁটে যেতে বেচারার সন্ধে কাবার হয়ে যাবে। অথচ ব্রহ্মদৈত্যের উপদেশ ঠেলা যায় না। ব্রাহ্মণ দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে। পরের দিন দুপুরে এক হাটের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সে শোনে পাশের দেশের রাজা ঘোষণা করেছেন যে তাঁর মেয়ের কঠিন ব্যাধি যে সারিয়ে দিতে পারবে তাঁকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দান করবেন।

যুবক বুঝে নিল ব্রহ্মদৈত্যের খেলা শুরু হয়ে গেছে। সে আরো বেশি উৎসাহের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। বিকেল নাগাদ পাশের রাজ্যের রাজবাড়িও পৌঁছে গেল সে।

রাজবাড়ি থমথমে। হাকিম-বদ্যি আসছে, যাচ্ছে। কেউই কোন ভরসা দিতে পারছে না। অবস্থা বুঝে যুবকটি এক সময় রাজার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করল। প্রার্থনা তার মঞ্জুরও হল। সে রাজাকে সবিনয়ে জানাল, 'আমার কাছে দৈব ওষুধ আছে, একবার রাজকন্যাকে দেখতে চাই।'

অগতির গতি যুবকটিকে অগত্যা রাজকন্যার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। যুবকটি ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। রাজাকে আগেই সে বলে রেখেছিল, তার দৈব চিকিৎসা হবে নিভৃতে, নইলে ওষুধের দৈবগুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

যাই হোক, দরজা বন্ধ করতেই ব্রহ্মদৈত্য রাজকন্যার দেহ ছেড়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে যুবকটিকে আশীর্বাদও করে গেলেন।

যুবকটিকে, বলতে কি, প্রায় কিছুই করতে হলনা—কেবলমাত্র কিছুক্ষণ চিকিৎসকের অভিনয় করতে হল। অল্প সময়ের ব্যবধানেই রাজকন্যা সুস্থবোধ করতে লাগল। আরো কিছু পর যুবক দরজা খুলে দিল।

বাইরে তখন রাজা স্বয়ং, পরিবারের অন্যান্যরা এবং মন্ত্রীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। যুবক সকলকেই জানাল, 'রাজকন্যার আর কোন ভয় নেই, সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।'

রাজকন্যা নিজেও তখন বিছানা ছেড়ে ঝেড়ে উঠেছে। সে অবাক কণ্ঠে রাজাকে প্রশ্ন করে, 'আমার কি হয়েছিল বাবা?'

রাজার আনন্দ আর ধরে না। তিনি প্রতিশ্রুতিমত যুবকটিকে অর্ধেক রাজ্য দান করলেন এবং মহা ধূমধামের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন।

বড় সুখেই দিন কাটাচ্ছিল ব্রাহ্মণ রাজা আর তার রানি। কিন্তু সুখ বোধ হয় ওদের কপালে লেখা ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই বিপদের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল ওদের ভাগ্যাকাশে।

শোনা গেল, দূরবর্তী কোন এক রাজ্যের রাজকন্যা অজ্ঞাত এক রোগে আক্রান্ত—সে রাজ্যের রাজাও কন্যার অসুখে দিশেহারা। কে বা কারা ব্রাহ্মণরাজার অসুখ সারানোর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা সেই ভিনদেশি রাজাকে জানিয়েছে। এদিকে ব্রাহ্মণের শ্বশুর আবার সেই রাজার পরম মিত্র। অতএব সেই রাজা ব্রাহ্মণরাজার শ্বশুরের কাছে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন জামাইকে তাঁর কন্যার চিকিৎসার জন্য পাঠান।

ব্রাহ্মণরাজা তো আর সত্যিই দৈবশক্তির অধিকারী নয়, চিকিৎসা শাস্ত্রও তার কিছু জানা নেই। কাজেই অসুস্থ রাজকন্যার কাছে গিয়ে সে কি করবে? অথচ শ্বশুর মশাইয়ের অনুরোধও সে অমান্য করতে পারে না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে তাকে সুখের রাজত্ব ও রাজকন্যাকে ছেড়ে বিপদসংকুল দূরবর্তী সেই রাজার মেয়েকে দেখতে যেতেই হয়।

সেখানে গিয়ে আবার আর এক ফ্যাসাদ। হয়েছে কি, ব্রহ্মদৈত্যটি তখন আগের রাজকন্যার দেহ ছেড়ে, এই রাজকন্যার দেহে প্রবেশ করেছেন। তিনি আপন ঋণ পরিশোধের জন্য মাত্র একটি বারই যুবক ব্রাহ্মণকে সাহায্য করেছিলেন। যুবকটির নির্লোভতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু এখানেও তাকে আসতে দেখে ব্রহ্মদৈত্য তো রেগে কাঁই। যুবককে এখানে দেখে তিনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'ওরে নচ্ছার বামুন, অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা পেয়েও তোর লোভ গেল না? দাঁড়া, তোর মজা দেখাচ্ছি।'

যুবকটি কিন্তু ব্রহ্মদৈত্যের ঐ-ভর্ৎসনায় একটুও বিচলিত হল না। সে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আমি এখানে এসেছিলাম আপনাকে একটা জরুরি খবর দেওয়ার জন্য।'

—'কি খবর?'

—'শুনলাম গজানন নাকি জেনে গেছে আপনি এখানে অবস্থান করছেন, তাই তানপুরা নিয়ে ও এখানে আসছে আপনাকে গান শোনাতে।'

গজাননের নাম শোনামাত্র ব্রহ্মদৈত্য, আঁৎকে উঠলেন। 'এখানেও তবে গজানন আমাকে তিষ্ঠতে দেবে না?' —বলেই ব্রহ্মদৈত্য রাজকন্যার দেহ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচলেন। এ-কাহিনির টাইপ—১১৬৪ : অপদেবতা ও বেসুরো গায়ক।

লোককথার মন্ত্রীরা সব ক্ষেত্রেই প্রায় বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। রাজাকে আপদে-বিপদে তারা পরামর্শ দেয়। যে মন্ত্রণা শব্দ থেকে মন্ত্রী, তাতো পরামর্শই। এহেন বুদ্ধিজীবী মন্ত্রীকেও একটি বালকের কাছে দেখি পরাভূত হতে। বলা বাহুল্য মন্ত্রীটির বুদ্ধিটি ছিল অবশ্যই কুবুদ্ধি। এবার সে-কাহিনি বলি :

একদিন একটা ছেলে রাস্তার ধারে গর্ত খুঁড়ছে। পথ দিয়ে যাচ্ছিল রাজমন্ত্রী। ছেলেটিকে গর্ত খুঁড়তে দেখে সে শুধায়, 'ওহে ছোকরা, তুমি রাস্তার ওপর অমন গর্ত খুঁড়ছ কেন? লোক যে পথ-চলতে হাত-পা ভেঙে মরবে।'

ছেলেটা এক মনে তার কাজই করে যায়। মন্ত্রী বিরক্ত হয়ে এবার চড়া গলায় বলে, 'কি বলছি কানে যাচ্ছে না, কি করছ তুমি?'

ছেলেটি মাটি খুঁড়তে খুঁড়তেই মন্ত্রীর দু'টো প্রশ্নের জবাব একই সঙ্গে দিল, 'তেমন কিছুই করছিনা। যে লোক সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে হাঁটে, সে এই গর্তে পড়ে হাত-পা ভাঙুক—সেজন্যই এই গর্তটা খুঁড়ছি'।

দূরদর্শী মন্ত্রী ছেলেটার চোখা-চোখা কথা শুনে বুঝতে পারে এ বিচ্চু ছোকরা অসম্ভব ধড়িবাজ। এর ক্ষুরধার বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে।

কয়েকদিন আগে থেকেই মন্ত্রীর বাড়িতে একটা মোরগ আর দু'টো মুরগি নিয়ে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। ছেলেটাকে রাস্তা থেকে তার বাড়িতে ধরে এনে মন্ত্রী প্রথমেই ছেলেটার বুদ্ধি পরখ করার জন্য ঐ সমস্যা সমাধানের সূত্র তার কাছে জানতে চাইল। অতি সহজেই ছেলেটা সমাধানসূত্র বাতলে দিল। মন্ত্রী ছেলেটার বুদ্ধির

পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ, আবার ভীতও। ভীতি এই কারণে যে রাজ্যে এতদিন নিজেকেই সে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করত, এখন বুঝেছে সে বাবারও বাবা আছে। ছেলেটা বড় হলে, রাজার আর তাকে পোষার প্রয়োজন হবে না। অতএব গোড়াতেই মূলোচ্ছেদ কর। কোটালের কাছে মন্ত্রী একটা চিঠি দিয়ে জানাল, পত্রবাহক ছেলেটিকে কোটাল যেন কালবিলম্ব না করেই হত্যা করে। আঁঠা দিয়ে লেফেফাটি ভালো করে সেঁটে অতি পরিকল্পিতভাবেই সেই চিঠি ছেলেটাকে দেওয়া হল কোটালের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য।

মন্ত্রীর হাবভাব দেখে চতুর ছেলেটার কেমন যেন সন্দেহ হল। সে কোটালের কাছে যাবার আগে সতর্কভাবে লেফেফাটা খুলে, ভেতরের চিঠিটা পড়ে ফেলল। মন্ত্রীটা কী সাংঘাতিক। মন্ত্রীর ঐ জঘন্য ষড়যন্ত্র টের পেয়ে ছেলেটা এবার দারুণ এক চাল চালল। লেফেফার মুখটা ঠিক আগের মতই বন্ধ করে, সোজা মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়ি চলে গেল। মন্ত্রীর একটিই ছেলে, প্রায় তার সমবয়সি। ছেলেটাকে গিয়ে সে অনুরোধ করল, 'এই চিঠিটা কোটালের কাছে গিয়ে দিয়ে এসো না ভাই।'

মন্ত্রীর পো বাবার ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছুই জানত না। সে সরল মনে চিঠিটা কোটালের কাছে নিয়ে গেল। চিঠিটা পড়ামাত্র কোটাল পত্রবাহক মন্ত্রীর পোকেই কোতল করল।

মন্ত্রীমশাই সেই দুঃসংবাদ শুনে শোকে অজ্ঞান হয়ে গেল। অনেক পরে, মন্ত্রীমশাইয়ের জ্ঞান ফিরে এলে বিচ্চু ছেলেটা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'সোজা পথে না হাঁটার জন্যই কিন্তু মন্ত্রী তুমি গর্তে পড়লে। নিরপরাধ ছেলেটাকে হারালে!' এ-কাহিনির টাইপ—৭০৮ : বিস্ময় বালক।

লোককথায় জোলা-তাঁতিমাত্রই বোকা আর ভীতু প্রকৃতির। এখন যে কাহিনিটি হাজির করব তাতে কিন্তু বুদ্ধি আর সাহসবলে শুধু নিজেই সে আত্মরক্ষা করেছে তা-ই নয়, পরন্তু বাঘ-ভালুক—এমনকি শেয়ালের মত ঘোড়েল পশুকেও রীতিমত নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। লোককথার পাঠকের কাছে এ-কাহিনি 'টিপটিপির কাহিনি' হিসেবেই বেশি পরিচিত। এ-কাহিনির নায়ক এক জোলা। যে ফুটিকে ঘোড়ার ডিম ঠাওরে এক ঠগের কাছ থেকে কিনবে, পথে সে ফুটি শেয়ালে তুলে নিয়ে যাবে। শেয়ালের পিছু ছুটতে ছুটতে বনে রাত ঘনিয়ে আসবে। জোলা তখন এক মোড়লের ঘরে আশ্রয় পাবে।

তখন অনেক রাত। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। সবাই ঘুমাচ্ছে, শুধু জোলার চোখে ঘুম নেই। একটা চিন্তাই তার মনে খেলা করে, 'এতক্ষণে নিশ্চয় ডিম ফেটে বাচ্চা বেরিয়ে পড়েছে! ঘোড়াটা তবে কোথায় গেল?'

মোড়লের ছোট ছেলেটার আবার ঠিক এই সময়েই ঘুম ভেঙেছে। বেজায় পেচ্ছাপ পেয়েছে তার। সে বলে, 'বাবা গো বাইরে যাব।'

বিরক্ত মোড়ল উত্তরে বলে, 'বাইরে যাওয়ার আর সময় পেলিনা, বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। আমি বাঘকে ডরাই না, কিন্তু টিপটিপিকে ডরাই।'

এই সময় একটা বাঘ কিন্তু সত্যিই মোড়লের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে মোড়লের কথার শেষ অংশটুকুই শুধু শুনেছে। খুবই ঘাবড়ে গেল সে। বলে কি লোকটা? বাঘকে ডরায় না অথচ টিপটিপিকে ডরায়? না জানি টিপটিপির গায়ে কত না তাগত।

বাঘ যখন মোড়লের কথা শুনছে তখন ঘরের জানলা দিয়ে জোলা বাঘটাকে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু চিনতে পারেনি। রাতের আঁধারে বাঘটাকে সে তার ডিম ফেটে বাচ্চা বেরুনো ঘোড়া মনে করেছে। বাঘ যখন টিপটিপির ভয়ে পালাতে চাইছে তখন জোলা করল কি, এক লাফে বাঘের পিঠে চেপে বসে, আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি রে, পেয়েছি।'

বাঘটার এবার ভয় পাওয়ার পালা। তবে কি সত্যিই সেই টিপিটিপি তার কাঁধে চাপল? সে উন্মাদের মত ছুটতে থাকে। সে আর কিছু ভাবতে পারেনা।

জোলার আনন্দ আর ধরে না। সে হাসতে হাসতে বলে, 'যতই ছোট বাছাধন, একবার পেয়েছি যখন আর তোমাকে ছাড়ছি না।'

বেচারা বাঘ দিশেহারা হয়ে সারারাত জোলাকে পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

রাতে ঠিকমত ঠাওর করতে না পারলেও, ভোরের আলো ফুটতেই ঘোড়ার চেহারা দেখে জোলার আত্মরাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়।

বাঘটার পিঠ থেকে একবার হড়কে পড়ে গেলে, সর্বনাশ। বাঘটা ওকে ছিঁড়ে খাবে। জোলা তাই তক্কে তক্কে থাকে। সুযোগও মিলে যায়। বাঘটা যখন একটা বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন জোলা সেই গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলে রইল। বাঘটাও টিপটিপির কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পেরেছে জেনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল।

বাঘকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দৌড়াতে দেখে পথে এক বানর তাকে জিজ্ঞেস করে, 'বাঘু ভায়া, এত জোরে ছুটিস কেনে?'

বাঘ বলে, 'আর বলিস নে ভাই, এক কোথাকার টিপটিপির পাল্লায় পড়ে কাল সারারাতটা দারুণ কষ্টে কেটেছে—, ঐ বটগাছটার তলায় এসে সে এইমাত্র আমাকে ছেড়েছে।'

বানর টিপটিপির কথা কখনো শোনেনি। তার মনে কৌতূহল জাগে। বটগাছের কাছে গিয়ে এখুনি ব্যাপারটা বোঝা দরকার।

বানর বটগাছের কাছে যায়। চারিদিকে তন্নতন্ন করে দেখে। না, কোথাও সেই টিপটিপির দেখা মেলেনা। সে তখন বটগাছের ডালের ওপর বসে পা ঝুলিয়ে টিপটিপির কথা ভাবছে।

বানর গাছের যে-ডালে বসেছিল, সেখানেই ছিল গাছের একটা বিশাল কোটর। জোলা প্রাণভয়ে সেই বৃক্ষকোটরে লুকিয়ে ছিল। এখন মরিয়া হয়ে সে একটা বেশ

বীরত্বের কাজ করে ফেলল। সে করল কি, কোটর থেকে হাত বাড়িয়ে বানরটার লেজ পাকড়িয়ে, চরকির মত বোঁ-বোঁ করে ঘুরিয়ে প্রায় একশো হাত দূরে বানরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বানর বেচারার প্রাণপাখি তখন উড়ে যাওয়ার গতিক। মাথা তার বন বন ঘুরছে। মনে মনে সে ক্ষোভের সঙ্গে বলে, বাঘুভায়া তাকে ডাহা মিথ্যে বলেছে। বাঘকে ধরেছিল কোন টিপটিপি নয়, একটা ঘোরানো চরকি। কিন্তু দুঃখ এই যে, চরকির চেহারাটাই দেখা গেলনা। অবিশ্যি দেখেও কাজ নেই। ত্রস্ত বানর পিছন পানে চায় আর ছুটতে থাকে।

বানরকে অমন পড়ি-কি মরি ছুটতে দেখে, পথে এক ভালুক শুধায়, 'বানরভায়া হলটা কি? অমন ছুটছ কেন?'

বানরটা পিছন দিকে আরেকবার চেয়ে ভালুকটাকে সভয়ে বলে, 'বাঘু ভায়া আমাকে টিপটিপির নাম করে বটগাছের কাছে একটা ঘোরানো চরকির কাছে পাঠাল। উঃ সে কী ঘোরানো, আর সে কী ছোঁড়া। বাঘুর সঙ্গে একবার দেখাটা হোক, ওকে উচিতশিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

বানরের কথা শুনে এবার ভালুক ভায়াও গেল সেই বটগাছের তলায়। টিপটিপি না ঘোরানো চরকি, সে-রহস্য ভেদ করা দরকার।

ভালুক এসে বটগাছের তলায় ঘুরপাক খেতে লাগল। টিপটিপি বা চরকি কোনকিছুই সে দেখতে পেলনা।

ওদিকে জোলা তখন করছে কি, কতগুলো শুকনো ডালপালা এনে গাছের তলায় জড়ো করে রাখছে। উদ্দেশ্য, আগুন জ্বেলে বাঘ ভালুকের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে। এখন সহসা ভালুককে ঘোরাফেরা করতে দেখে, হকচকিয়ে গিয়ে, সে হাতের ডালপালাসহ ভালুকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভালুক এই অতর্কিত আক্রমণে ঘাবড়ে গিয়ে পড়ি-কি-মরি ছুট। ছুটন্ত ভালুক যেতে যেতে বলতে থাকে, 'এতো টিপটিপি নয়, চরকিও নয়—এ হল ডালপালাশুদ্ধ উপুরচাপা।'

পথে শেয়ালের সঙ্গে ভালুকের দেখা। ভালুক তখনো ভয়ে কাঁপছে। শেয়াল ভালুককে শুধায়, 'ভালুক ভায়া, অমন কাঁপ কেনে?'

ক্রুদ্ধকণ্ঠে ভালুক বলে, 'মিথ্যেবাদী বাঘ-বানরকে আচ্ছা করে সাজা দেব।'

শেয়ালেরও কৌতূহল জাগে আসল ব্যাপারটা জানার। সেও গুটিগুটি পায়ে বটতলায় হাজির হয়। কিন্তু গিয়ে সে খুবই হতাশ। কোথায় সেই টিপটিপি না চরকি না ডালপালাশুদ্ধ উপুব চাপা? নেহাতই একটা সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে গাছের তলায়। শেয়াল মানুষটাকে দেখে বেশ খেপে যায়। এই লোকটাই তাহলে যত নষ্টের গোড়া? সে লোকটাকে শাসায়, 'খুব যে তুই মাতব্বরি দেখাচ্ছিস ব্যাটা, এবার তোকে বাঁচাবে কে?'

শেয়ালের এই তরফানি শুনে জোলা খুব ঘাবড়ে যায়। তাই না দেখে, শেয়ালের আস্ফালনিও যেন বাড়তে থাকে, 'তুই আমার তিন বন্ধু বাঘ-বানর-ভালুককে বেজায় কষ্ট দিয়েছিস, এখন তোকে আমি আস্ত চিবিয়ে খাব।'

জোলা তখন ভালোমানুষের মত বলে, 'তা খাবে খাও, আমি কাল রাত থেকে জল পর্যন্ত খাইনি — আমায় অন্তত একটু জলপানের সুযোগ দাও।'

শেয়াল দেমাকি চালে বলে, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, মরার আগে তুই পেটপুরে যত পারিস জল খেয়ে নে।'

জল খেয়ে জোলা শেয়ালের কাছে এবার একটু নাচবার অনুমতি চায়। জোলার এ-আর্জিও মঞ্জুর হয়।

খালি পেটে জল খেয়ে নাচতে শুরু করতেই জোলার পেটের ভেতর থেকে ভটাং ভট্ শব্দ বেরুতে থাকে। শেয়াল সেই শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে জোলাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোর পেট থেকে এমন শব্দ বেরুচ্ছে কেন রা?'

জোলা শেয়ালকে তখন বলে, 'ছোটবেলায় আমার বাবা আমাকে একটা বুনো কুকুরের ডিম খাইয়েছিল, বোধ হয় বাচ্চা হয়ে সেটাই এখন—'

'সে কি, আগে বলিসনি কেন? একটু ধরে রাখ বাপ, আগে আমি পালাই।' জোলা বোঝে ওষুধ ঠিক জায়গাতেই লেগেছে। সে তখন শেয়ালকে একটা শর্তে পালাতে দিতে রাজি হল। একশো এক টাকা বকশিস চাই। তখুনি গুনে গুনে একশো এক টাকা আক্কেল সেলামি দিয়ে শেয়াল প্রাণে বাঁচল।

এ-কাহিনির গঠনভঙ্গিতে কিছু বৈশিষ্ট আছে, যা এখানে বলা প্রয়োজন। এটা একটি শেকলজোড়া কাহিনি। ইচ্ছেমত শেকল জোড়া দিয়ে কাহিনির আরো বিস্তার সম্ভব। আর একটি ব্যাপারও লক্ষণীয়, জোলার যা-কিছু বীরত্ব বা বুদ্ধিপ্রদর্শন—সবই পশুদের ওপর। সাধারণভাবে মানুষের বুদ্ধি মনুষ্যেতর প্রাণীদের তুলনায় বেশি, জোলা সেই হিসেবেই হয়তো বুদ্ধিমান। আর একটা বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে জোলার বুদ্ধির পরীক্ষা হলে, অথবা কোন সাহসী বীরের সঙ্গে তার বীরত্বের পরীক্ষা হলে তবেই হবে তা আসল পরীক্ষা। দুঃখের বিষয়, সে সুযোগ কিন্তু এ-কাহিনিতে মেলেনি। এ-কাহিনির টাইপ—১৩১৯ : ঘোড়ার ডিম হিসেবে ফুটি বেচা।

এবার এক নাপিতের কথা। এ-নাপিত কিন্তু লোককথায় প্রচলিত নাপিতদের মত চতুর নয়, বরং অদূরদর্শী বোকাই। নইলে কুমিরের কথায় বিশ্বাস করে কেউ জলে নামে? কাহিনিটি তবে বলেই ফেলি :

নাপিত ভায়া নদীর এপারে থাকে, কিন্তু পেশাগত কারণে তাকে রোজই ওপারে যেতে হয়। সেদিনও যথারীতি বেরিয়ে, ঘাটে এসে খেয়া নৌকার জন্য অপেক্ষা করছে। হেনকালে নদীতীরে এক রোদ-পোয়ানো কুমির মুখ তুলে বলে, 'নাপিত ভায়া, আমার একটু উপকার করবে? গতকাল রাতে এমন খাওয়া খেয়েছি যে নড়তে-চড়তেও পারছিনা—তুমি যদি ঐ জল পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও?'

নাপিত ইতস্তত করছে দেখে, কুমির বলে, 'আমি কথা দিচ্ছি, সাধ্যমত তোমার এ-উপকারের প্রতিদান আমি দেব।'

নাপিত বলে, 'তোমাকে নিয়ে যাওয়া মানে তো কাঁধে বহন করে নিয়ে যাওয়া—তোমার দেহের ভার আমি কি বইতে পারব?'

কুমির অনুনয়ের সুরে বলে, 'একটু চেষ্টা করলেই পারবে ভাই, আমার অনেক গয়নাগাটি আছে—এজন্য না হয় তার থেকে তোমাকে কিছু ভাগ দেব।'

নাপিতের ইতস্ততভাব এবার দূর হল। সে কুমিরকে কাঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে জলে নামল। হাঁটুজল অব্দি নেমে নাপিত কুমিরকে বলে, 'এবার ছেড়ে দিই?'

কুমির বলে, 'আর একটু চল না ভাই।'

এইভাবে নাপিত কুমিরকে কাঁধে বহন করে গলাজল পর্যন্ত এল। এরপর কেমন যেন সন্দেহ হল তার মনে। সে কুমিরকে বলল, 'আর কিন্তু এগুতে পারব না আমি।'

কুমির এতক্ষণে স্বরূপ প্রকাশ করল। নাপিতের কাঁধ থেকে নেমে, সে বলল, 'আর এগুতেও হবে না, পিছুতেও হবে না। যেমন আছ, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক—এবার আমি তোমাকে খাব।'

নাপিতের আক্কেল গুড়ুম। সে বলে, 'কুমির ভাই, এ কেমন করে সম্ভব? আমি তোমার উপকার করলুম, তুমি আমায় গয়না দেবে বললে—এখন বলছ খাবে? না হয় খাবেই, কিন্তু তার আগে কাজটা তোমার ঠিক হচ্ছে কিনা, তার একটা বিচার হওয়া দরকার নয় কি?'

কুমির বলে, 'বেশ তো বিচার হতেই পারে, কিন্তু করবে কে?'

নদীর ঢেউয়ে তখন একটা চুপড়ি ভেসে যাচ্ছিল। তাকেই সব কিছু বলা হল। সে সবকিছু শুনে কুমিরের পক্ষেই রায় দিল। মানুষ জাতটার ওপর তার বেজায় বিদ্বেষ। সে বলে, 'মানুষ ভারী বেইমান। এই তো আমি যদ্দিন ঠিক ছিলাম, কী খাতিরই না করেছে! যেই ভেঙে পড়েছি, নদীর জলে মনিব আমায় ভাসিয়ে দিলে। অমন মানুষের মরণই ভালো।'

নাপিত চুপড়ির রায় শুনে হতাশ। কুমিরও ব্যস্ত হয়ে বলে, 'বিচারের রায় তো শুনলে নাপিত ভায়া, এবার আমি তোমাকে খেতে পারি?'

নাপিত তবু বলে, 'একটা চুপড়ির রায়েই বিচার সারা হয়? ঐ-যে রাস্তা দিয়ে একটা গরু যাচ্ছে—ওকে ডেকে ঘটনাটা বলা যাক।'

কুমির এবারও আপত্তি করল না।

কিন্তু হায়, গরুও সমস্ত কিছু শুনে, কুমিরের অনুকূলেই মত দিল। সেই চুপড়ির মত মানুষ জাতটার ওপর সে-ও বেজায় খাপ্পা। তারও অভিমত, নাপিতের মরণই ভালো।

গরুর রায় শোনার পর কুমিরের আর তর সয় না। সে নাপিতকে বলে, 'ভায়া এতক্ষণ তোমার পছন্দের বিচারকদের রায় তো শুনলে, এবার কিন্তু আমি তোমাকে খাবই।'

এই সময়ে ঝোপের ভেতর থেকে একটা শেয়ালকে বেরোতে দেখে, নাপিতের মনে আশার সঞ্চার হল। সে কুমিরকে বলল, 'মরতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বিচার যখন শুরু হয়েছে তখন আর এক বিচারককে ডাকা হোক—তিন বিচারকের রায় ছাড়া বিচার সম্পূর্ণ হয় না।'

কুমির তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, 'বেশ তো তোমার তৃতীয় বিচারকটি আবার কে?'

—'এই তো শেয়াল পণ্ডিত আসছে। ঐ আমার শেষ বিচারক।'

শেয়ালকে ডেকে তখন জলের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে নাপিত সব বৃত্তান্ত জানায়। শেয়াল তার কথা শুনে বলে, 'বাজে বকো না।' নাপিত বলে, 'বিশ্বাস কর, আমি ওকে বহন করেছি।'

— 'বিশ্বাস করব তখনই যখন আমার চোখের সামনে ওকে নদীতীরে বহন করে আনবে।'

অগত্যা প্রাণের দায়ে নাপিত সেই বিপুল বপু কুমিরকে নদীতীরে কাঁধে বহন করে নিয়ে এল।

তীরে পৌঁছানো মাত্র শেয়াল নাপিতকে বলে, 'ওকে পাড়ে ফেলে তুমি এবার পালাও।'

ডাঙায় কুমিরের তখন করুণ অবস্থা। সাধের শিকার চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়! এ-কাহিনির টাইপ—১৫৫ : অকৃতজ্ঞ প্রাণী।

শেয়ালের বুদ্ধিবলে সে-যাত্রায় নাপিত ভায়া কোনক্রমে প্রাণে বাঁচে বটে, কিন্তু তার বাস্তব বুদ্ধির নিদারুণ অভাব খুবই প্রকট হয়ে ধরা পড়ে।

নাপিতের বেকুব বনার আর একটি কাহিনি এখন শোনা যাক। এখানে তার বেকুব হওয়ার পেছনে অবশ্য বাস্তব বুদ্ধির অভাব বা ঐ-ধরনের চারিত্রিক ত্রুটি কারণ নয়, নেহাতই ঘটনাক্রমে এখানে তার বেহাল অবস্থা। কাহিনিটি এ-রকম :

এক রাজার দুই রানি। দুই রানিরই একটি করে ছেলে। রাজার বয়েস হয়েছে। তাঁর ইচ্ছে বড় রানির ছেলেকে সিংহাসনে বসান। ছোট বানির ইচ্ছে, তাঁর ছেলেই হোক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। এই নিয়েই রাজার সঙ্গে ছোট রানির বিরোধ। বিরোধ শেষাবধি প্রাণান্তকর পরিণতির দিকে যায়।

ছোটরানি ঘুষ দিয়ে রাজবাড়ির নাপিতকে বাগে এনে বলে, 'দাড়ি কাটার ছলে ক্ষুর চালিয়ে রাজাকে খুন করতে হবে।'

নাপিত ক্ষুরে শান দিয়ে, করণীয় কাজের জন্য প্রস্তুত। রাজার গলায় ক্ষুর চালানোর

আগে শেষবারের মত সে ঘরের চারপাশ সতর্ক চোখে দেখে নিচ্ছে। এসব কাজের কোন সাক্ষী থাকা ভালো নয়। সে আস্তে করে বলে, 'রাজামশাই, দাড়ি কামাবেন আসুন।'

রাজামশাই বরাবরই একটু খেয়ালি প্রকৃতির মানুষ। জানলা দিয়ে এ-সময়ে তিনি প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে, আপন মনে আউড়ে চলেন :

ক্ষুর শান শান চিরিক চিরিক পানি।
তোমার মনে কি আছে আমি কিন্তু জানি।।

রাজামশাইয়ের শ্লোক শুনে নাপিতের মুখে আর রা-টি নেই। তার হাত কেঁপে ক্ষুর পড়ে যায় মাটিতে। রাজার পা দু'টি জড়িয়ে সে তখন তার ছোটরানির কাছে ঘুষ নেওয়া, রাজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা সবিস্তারে স্বীকার করে। এ-কাহিনির টাইপ—৯১৩ সি : ক্ষুর শান শান চিরিক চিরিক পানি।

এবার হাজির করব এক বুড়ির কাহিনি :

বাংলা লোককথায় বুড়িরা সাধারণত সমাজে অবহেলিত এবং দুর্বল। এ-কাহিনির বুড়ি কিন্তু সমাজের কাছে মোটেই অবহেলিত নয়, দুর্বলও নয়। কাহিনিটি এ-রকম : বুড়ি যাচ্ছে ভিন গাঁয়ে। তার এক নাতনির বাড়ি। পথে শেয়ালের সঙ্গে দেখা। শেয়াল বলে, 'বুড়ি আজ তোকে খাব।'

বুড়ি শেয়ালকে আশ্বস্ত করে বলে, 'দাঁড়া, আগে নাতনির বাড়ি গিয়ে পেটপুরে খেয়েদেয়ে মোটা হয়ে আসি, তখন যত খুশি খাস। এখন খেলে তো শুধু হাড় আর চামড়াটুকু জুটবে—নে-নে পথ ছাড়।'

শেয়াল বুড়ির কথায় পথ ছেড়ে দেয়। বুড়ি আবার হাঁটতে থাকে। এবার বাঘের পালা। বাঘও বলে, 'বুড়ি আজ তোকে খাব।' বাঘকেও বুড়ি ঐ একই কথা বলে। বাঘ খুশি হয়ে পথ ছেড়ে দেয়।

আরো কিছু দূর এগুতেই, এক ভালুকের সঙ্গে দেখা। ভালুকও যথারীতি বুড়িকে খাওয়ার প্রস্তাব পাড়ে এবং একই উত্তর পায়। সেও বুড়িকে পথ ছেড়ে দেয়।

বুড়ি নাতনির বাড়ি দিনকুড়ি থেকে ভালো-মন্দ খেয়ে বেশ গায়ে-গতরে হয়েছে। নাতনিকে হাসতে হাসতে সে বলে, 'তোর কাছে যত্ন-আত্তি পেয়ে, এ ক'দিনেই শরীরে যে মাংস লেগেছে তাতে হেঁটে আর ফিরে যেতে পারব না, আমাকে গড়িয়ে গড়িয়েই বোধ হয় যেতে হবে। পথে আবার ভালুক-বাঘ-শেয়ালেরা সারি দিয়ে বসে আছে, আমাকে খাবে বলে।'

নাতনিটিও তেমনি। সে বুড়িকে বলে, 'ভয় কি দিদা, তোমাকে আমি লাউয়ের খোলের মধ্যে বসিয়ে দেব, কেউ টেরই পাবে না।'

অতঃপর সত্যিই একদিন নাতনি লাউয়ের খোলের মধ্যে দিদাকে বসিয়ে দিল, সঙ্গে বেঁধে দিল চিঁড়ে আর তেঁতুল—পথে খিদে পেলে বুড়ি যাতে খেতে পায়।

লাউয়ের খোলাটি রাস্তায় বসিয়ে প্রথম ঠেলে দিল সেই নাতনিই। গড়গড় করে গড়িয়ে ছুটল সেটা রাস্তার ওপর দিয়ে। ভালুক রাস্তার ধারে হা-পিত্যেশ হয়ে বসেছিল। লাউটা তার পাশ দিয়েই গড়াতে গড়াতে যাচ্ছিল। বহুক্ষণ নিষ্ফল অপেক্ষায় বিরক্ত হয়ে, সে লাউটার ওপর সজোরে একটা লাথি কষিয়ে দিল। তাইতে, বুড়ির বাড়ি-ফেরার কাজ আরো দ্রুত হল।

বাঘেরও সেই একই অবস্থা। বুড়ির আসার আশায় থেকে থেকে সে-ও বিরক্ত। লাউটা দেখে সে-ও একটা লাথি কষিয়ে দিল। ফের লাউয়ের গতি গেল বেড়ে। এবার শেয়ালের পালা। ততক্ষণে বুড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে তার নিজের বাড়ির কাছে এসে গেছে। লাউটাকে গড়িয়ে আসতে দেখে ধড়িবাজ শেয়ালের কেমন যেন সন্দেহ হয়। সে ভালুক আর বাঘের মত কেবল লাথিই মারে না, এত জোরে মারে যে লাউটা ফেটেই যায়।

মোটাসোটা বুড়িকে চিনতে পেরে শেয়ালের আনন্দ আর ধরে না। সে হাসতে হাসতে বলে, 'বুড়ি এখন তোকে খাই?'

বুড়িও হাসতে হাসতে বলে, 'খাবি তো বটেই, কিন্তু তার আগে আমার দু'টো গান শুনবি নে?'

শেয়াল বাবাজি রাজি হয়ে গেল বুড়ির প্রস্তাবে। বুড়ি তাকে বলল, 'তবে চল ঐ ঢিবিটার কাছে।'

শেয়াল বুড়ির অনুসরণ করে ঢিবির ওপর এল। বুড়ি তখন তার খ্যানখ্যানে গলায় তারস্বরে গান জুড়ল, 'আয় আয় গঙ্গা তু উ-উ।' ... ...

বুড়ির বাড়িতে গঙ্গা আর যমুনা নামে দু'টো কুকুর ছিল। কুকুর দু'টো সাংঘাতিক হিংস্র প্রকৃতির আবার দারুণ প্রভুভক্তও। বুড়ির গলায় 'গঙ্গা' ডাক শুনে দু'টো কুকুরই সেখানে ছুটে এল এবং শেয়ালটাকে চিবিয়ে খেল। এ-কাহিনির টাইপ—৫১৩ : কয়েকটি সাহায্যকারী।

এবার হাজির করি এক বাক্‌চতুরা বুড়ির কথা। প্রচলিত বাংলা লোককথায় বুড়ির যেরূপের পরিচয় আমরা পাই, লেখাই বাহুল্য, তার সঙ্গে বুড়ির এ-রূপের কোন মিল নেই। কাহিনিটি এ-রকম :

গাঁজাখোর দুই পালোয়ানে মোলাকাৎ। একজন ছয় মনী, অন্যজন নয় মনী। দু'জনের মধ্যে কে বড় পালোয়ান তাই নিয়ে তর্ক বাঁধে। সামনের এক পুকুর দেখিয়ে ছয় মনী বলে, 'আমি ঐ পুকুরের সব জল খেয়ে ফেলতে পারি।'

নয় মনীই বা কম যায় কেন? সে বলে, 'আমি হাতের চেটোয় অনায়াসে একটা জ্যান্ত হাতি বহন করতে পারি।'

এভাবেই দুই পালোয়ানের বাগাড়ম্বরের মহড়া চলতে থাকে। সত্যিই যে কে বড় পালোয়ান, তার কোন ফয়শালা হয় না। হেনকালে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক বুড়ি। সে পালোয়ান দু'টির আস্ফালন শুনে পথে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পালোয়ান দু'টি তাকে

দেখতে পেয়ে এবার তারই শরণাপন্ন হল, 'বুড়িমা তুমিই বিচার করে দাও, আমাদের মধ্যে কে বড় পালোয়ান।'

বুড়ি পড়ে মহা ফাঁপরে। যাকেই বড় বলা হোক না কেন, অন্যজন তা শুনে রেগে যাবে। আবার কিছু না বললেও, ওরা তাকে ছেড়ে দেবে না। তবে বুড়ি এতক্ষণ ওদের তর্কাতর্কি শুনে একটা সারকথা বুঝে নিয়েছে। সেই সারকথাটি হল, ওরা দু'জনেই এখন নেশাগ্রস্ত আর বুকনিবাজ। নেশার ঘোরেই আবোল-তাবোল বকছে। বুড়িও বাতেলায় কম যায় না। সে ওদের সম্মুখ-সমরে আহ্বান জানিয়ে বলে, 'বৃথা বাক্যযুদ্ধে সময় নষ্ট না করে, মল্লযুদ্ধ শুরু কর—তবেই তো বুঝব কে সত্যিকার বড় পালোয়ান।'

বুড়ির আহ্বানে দুই পালোয়ানের মুখই কেমন যেন চুপসে যায়।

ছয় মনী ওজর তোলে, 'কুস্তি লড়ার আখড়া কৈ?'

বুদ্ধিমতী বুড়ি ওদের দুর্বলতা আগেই ধরে ফেলেছে। সে বলে, 'তোমাদের লড়াই দেখতে কুস্তির আখড়ায় যাব অত শস্তা সময় আমার হাতে নেই। সত্যিই যদি তোমরা লড়তে চাও তবে আমার হাতের ওপর দাঁড়িয়েই তোমরা লড়তে পার।'

যুযুধান নেশুড়ে পালোয়ান দু'টির তখন কী-যে করুণ অবস্থা! এ-কাহিনির টাইপ—১৯৬২সি : মহাশক্তিধর।

অতঃপর জামাই বাবাজির এক কাহিনি। এ-কাহিনির জামাইটিও বাংলা লোককথায় প্রচলিত জামাইয়ের মত বোকা-হাবা নয়, বরং রীতিমত পুরুষকার সম্পন্নই।

কাহিনিটি এ-রকম :

বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি এসেছে জামাই। শুনেছে তার বৌ নাকি অসম্ভব রাগি—মুখে কিছু বলার আগেই হাত ছোটে।

তা, নতুন জামাইকে তো ঘটা করে খেতে বসানো হয়েছে। জামাই যখন মাছে মুখ দিয়েছে, তখন বৌয়ের পোষা বেড়ালটা পাশ থেকে মিঁউ মিঁউ করছিল। জামাইয়ের এক পাশে ডাব আর অন্য পাশে কাটারি রাখা আছে। খাওয়া শেষে জামাইকে ডাব কেটে জল খাওয়ানো হবে। বেড়ালটা খেতে না পেয়ে মিঁউ-মিঁউ করেই চলেছিল। জামাই করে কি, হাতের কাছের কাটারি নিয়ে এক কোপে বেড়ালটার মুণ্ডচ্ছেদ করে, আর বলে, 'আমাকে কেউ বিরক্ত করলে আমি এমন সাজাই দিয়ে থাকি।'

দেখেশুনে রাগি বৌটি তার একেবারে চুপসে গেল। এমন জামাই বাবাজির পাল্লায় পড়ে ক্রমে সে শান্তশিষ্ট হয়ে উঠল। এ-কাহিনির টাইপ—৯০১ : বৌ-বশীকরণ।

এবার যে লোককথাটি পেশ করব তার কাহিনিগত বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নেই। 'দুর্বলকে সাহায্য করা' এই মোটিফটি, আগেই বলেছি, বাংলা পশুকথার একটি জনপ্রিয় মোটিফ। বর্তমান কাহিনিটি এই মোটিফভুক্তই এক কাহিনি :

এক বাড়িতে তিনটি মোরগ ছিল। একদিন এক শীতের বিকেলে শেয়াল এসে সেই মোরগদের বলে, 'বোনপো, আমাকে তোমাদের এখানে থাকতে দেবে?'

মোরগরা বলে, 'বেশ তো, থাক না।'

রাতের বেলায় শেয়াল মোরগদের শুধায়, 'আজ তোমরা কোথায় শোবে?'

মোরগরা বলে, 'আজ রান্নাঘরের উনুনে ছাই আছে, তাই খড়ের চালেই শোব ভাবছি।'

অনেক রাতে শেয়াল চুপি চুপি খড়ের চালে উঠে একটা মোরগ খেয়ে ফেলে। পরদিন অবশিষ্ট দু'টি মোরগ ভাবে, বোধ হয় তাদের অন্য ভাইটি বেড়াতে গিয়েছে। রাতের বেলায় শেয়াল আবার তাদের শুধায়, 'আজ তোমরা কোথায় শোবে?'

মোরগ দু'টি জানায়, 'আজ চালে ধুলো পড়েছে, ভাবছি উনুনেই শোব।'

সে-রাতেও শেয়াল চুপিচুপি আরেকটা মোরগ খেয়ে ফেলে।

পরের দিন ঘুম ভেঙে ভাইকে দেখতে না পেয়ে শেষ মোরগটার সন্দেহ হয়। সে সারাটা রাত জেগে বসে থাকে। অনেক রাতে শেয়াল যখন তাকে খেতে গেল তখন মোরগ বলে, 'মামা তুমি চোখ বোজ, আমিই তোমার মুখে ঢুকছি।'

শেয়াল যেই চোখ বুজল, অমনি মোরগ উড়ে পালাল। এ-কাহিনির টাইপ—৭৫ : দুর্বলকে সাহায্য করা। কাহিনি বিচারে এটি খুবই মামুলি, কিন্তু অন্য দিক থেকে খুবই অসাধারণ। বাংলার লোককথায় মোরগের কাহিনি তেমন নেই বললেই চলে, এ-কাহিনির অনন্যতা এখানেই। আর, ব্যতিক্রমী আরো একটি কারণে—ধূর্ত শেয়াল এখানে মোরগগুলির বুদ্ধির কাছে নতি স্বীকার করেছে।

এখন শোনাব এক ঠগের কাহিনি। ঠগের পেশাই হল লোক ঠকানো। কিন্তু এ-কাহিনির ঠগ জব্দ হয়েছে এক সাধারণ মানুষের কাছে। কাহিনিটি এ-রকম :

এক মহাজনের ব্যবসাই ছিল মানুষের অর্থাভাবের সুযোগ নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সোনা-দানা জমিজমা বন্ধক রেখে, টাকা ধার দেওয়া এবং এজন্য চড়া হারে ঋণীর কাছে সুদ আদায় করা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল টাকা সমেত সুদের টাকা মহাজনের কাছে ফেরৎ না দিলে ঋণীর বন্ধকি সোনা দানা বা জমিজমা তামাদি হয়ে যাবে। মহাজন ছুতোনাতায় অভাবী লোককে সাধারণত সে পথেই ঠেলে নিয়ে যায়। কেননা, তাতেই মহাজনের মুনাফা বেশি।

এক গেরস্ত লোক বৌয়ের সোনার গয়না বন্ধক রেখে এক মহাজনের কাছে কয়েকশো টাকা ধার নিয়েছিল। অভাবের তাড়নায় সে সময়মত মহাজনের সুদ মেটাতে পারে না। পরে একদিন চক্রবৃদ্ধি হারে মহাজনের প্রাপ্য সুদ সমেত মূল টাকা নিয়ে সে যখন বৌয়ের গয়না ফেরৎ নিতে যায়, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মহাজন তাকে গয়না ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে। ঋণী ব্যক্তিটি মহাজনের সঙ্গে কোন বচসার মধ্যে না গিয়ে, নীরবে ঘরে ফিরে আসে।

এখন শুরু হয় ঋণী ব্যক্তিটির বুদ্ধির খেলা।

সে তার বন্ধুদের কাছে মহাজনের কুকীর্তি ফাঁস করে অনুরোধ জানায়, তারা যেন

আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু একই সময়ে ঐ মহাজনের কাছে গয়না বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে যায় — পরবর্তী কার্যক্রমের দায়িত্ব সে নিজেই নেবে।

ঋণীর কথামত তার বন্ধুরা একদিন একই সময়ে কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে মহাজনের গদিতে গিয়ে গয়না বন্ধক রেখে যখন টাকা ধার করবার আবেদন করছে তখন মহাজনের চোখমুখে কী দারুণ আনন্দের অভিব্যক্তি! হাসতে হাসতে সে সকলের সঙ্গে কথা বলছে। পান খাওয়াচ্ছে, ধূমপান করাচ্ছে। ঠিক সেই সময়েই ঋণী ব্যক্তিটির অকুস্থলে প্রবেশ এবং সকলের সামনেই সবিনয়ে মহাজনের কাছে সুদ সমেত তার মূলটাকা ফেরতের বিনিময়ে গচ্ছিত গয়নার দাবি পেশ।

এবার বলাই বাহুল্য ঋণী ব্যক্তিকে আর বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হয় না। মহাজন হাসিমুখে তার মূলটাকা এবং সুদ বুঝে নিয়ে গচ্ছিত গয়না ঠিকঠাক তাকে বুঝিয়ে দেয়। না দিলে, অতগুলি খরিদ্দার হাতছাড়া হয়ে যাবে না?

না বললেও চলে, ঋণী গচ্ছিত গয়না ফেরৎ পাবার পর তার বন্ধুরা আর মহাজনের গদিমুখো হয় নি। এ-কাহিনির টাইপ—১৬১৭ : মহাজন ও গেরস্ত।

রঙ্গকথায় কাকতালীয় যোগ

যে যা নয় তা-ই সেজে ঘটনাক্রমে কেল্লা ফতে করে দিচ্ছে—লোক কথায় হামেশাই এমনটি দেখা যায়। বলতে কি, কার্যসিদ্ধির জন্য নায়কের এই নিত্যনব ভূমিকাই লোককথায় এক অনাবিল হাসির উদ্রেক করে। মন্তব্যটির সমর্থনে একটি সাঁওতালি লোককথা শোনাই :

নায়কের নাম অর্জুন । ছোট সংসার তার—বৌ আর ছেলে। বৌটা অসম্ভব রকমের কুঁড়ে, অর্জুন কিন্তু দারুণ পরিশ্রমী। বৌয়ের কুঁড়েমি তাকে সামাল দিতে হয় বটে, কিন্তু এ নিয়ে দু'জনে কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে। কথাটা বোধ ঠিক হল না। কেননা, বাস্তব ঘটনা হল অর্জুন একাই গাল পাড়ে, বৌটা তার রা-ও করেনা। রা করাও তো শ্রমসাধ্য ব্যাপার। খেতে বসে অর্জুন দেখে, খেতে দেবার জায়গাটা পর্যন্ত নিকায় নি বৌ। সে যেমন পারে ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করে নেয়। বৌ কিন্তু আসল কথা বেমালুম চেপে গিয়ে পড়শিদের বলে, 'আমার ছেলের বাপ মন্ত্র-তন্ত্র জানে কিনা, খেতে বসেও ফুঁ দিয়ে মন্ত্র পড়বে তবে খাবে।'

তা, এভাবেই কাটছিল দু'জনের দাম্পত্যজীবন। এরই মধ্যে প্রতিবেশী রাজ্যে ঘটল এক অঘটন। সেখানে এল এক দুর্ধর্ষ রাক্ষস। রাক্ষসটা মানুষজন-জন্তুজানোয়ার ধরে ধরে খেতে লাগল। সে-রাজ্যে বাস করাটাই তখন দায় হয়ে উঠল।

সব দেখেশুনে সে-রাজ্যের রাজা মন্ত্রীমশাইকে আদেশ দিল, 'খুঁজে নিয়ে এসো কোন ভালো ওঝা যে মন্ত্র পড়ে মারবে ঐ রাক্ষসটাকে।'

রাজার আদেশ পেয়ে মন্ত্রী দিকে দিকে পেয়াদা পাঠিয়ে দিল ওঝা পাকড়াও করতে। রাক্ষস মারতে সাহস ভরে কোন ওঝাই এগিয়ে এলনা। কোথাও কোন ওঝার হদিস না পেয়ে শেষে রাজার পেয়াদারা হাজির হল অর্জুনদের গ্রামে। জিজ্ঞেস করল তারা গ্রামবাসীকে,'এ গাঁয়ে কোন ভালো ওঝার সন্ধান পাওয়া যাবে?' কেউ কিছু বলার আগে অর্জুনের বৌ বলে উঠল, 'আমার মরদ বড় গুনিন বটে গো।'

অর্জুন পাশ থেকে বৌকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে, 'ধ্যুৎ, কি যা-তা বকছিস?'

বৌ তখন তার সাহসী সোয়ামিকে বলে, 'তোমার মুখে এমন কথা শোভা পায় না। যাও না গো, অনেক টাকা দিবেক।'

স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তার মধ্যে দুই পেয়াদা এসে অর্জুনকে অনুরোধ করে, 'চলনা ভাই আমাদের রাজ্যে, মন্ত্র পড়ে রাক্ষসটাকে মেরে আমাদের মান বাঁচাও, প্রাণ বাঁচাও।'

অর্জুন তবু নারাজ। সে বলে, 'আমি যাব না—কিছুতেই যাব না।'

বৌ অনুনয় করে বলে, 'ওরা অত করে বলছে, যাওনা গো। যাবার কালে গরু বাঁধার দড়ি আর কুড়ুলটা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলো না যেন।'

পেয়াদা দু'টি ইতিমধ্যে অর্জুনকে রীতিমত বেঁধে ফেলেছে। অগত্যা দড়ি আর কুড়ুল নিয়ে ইস্টনাম জপ করতে করতে বেরিয়ে পড়তে হল তাকে।

পেয়াদারা তাকে নিয়ে হাজির করল তাদের দেশের রাজার কাছে। বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। আঁধার ঘনাচ্ছে চারদিকে।

রাজা অর্জুনকে শুধায়, 'পারবে তো রাক্ষসটাকে মারতে?'

—'আগে তো কিছু ক্রিয়াকর্ম সেরে নিতে হবে, তার পরই না বুঝতে পারব পারব কি পারব না?'

—'খুব ভালো কথা। এবার তাহলে ক্রিয়াকর্ম শুরু করে দাও।'

অর্জুন তখন রাজাকে বলে, 'এখানে তো করা যাবে না, গাঁয়ের শেষপ্রান্তে রাস্তার ধারে বসে শুরু করতে হবে আমার ক্রিয়াকর্ম।'

অর্জুনের কথা শুনে সবাই তাকে নিয়ে গেল গাঁয়ের শেষপ্রান্তে। প্রায় মাঝরাতে তারা পৌঁছল সেখানে। অর্জুন জায়গাটা দেখে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বলল, 'এবার তাহলে একটু জিবিয়ে নেওয়া যাক, একটু পরেই শুরু করব ক্রিয়াকর্ম।'

অর্জুনের কথা শুনে সবাই শুয়ে পড়ল। আসলে অর্জুনের মতলব ছিল অন্য রকম। অর্জুন ফন্দি এঁটেছিল, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন সে গোপনে পালিয়ে যাবে। সত্যিই কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই ঘুমে বিভোর হয়ে নাক ডাকাতে শুরু করে দিল। অর্জুন সতর্ক চোখে চারপাশ দেখে, দড়ি আর কুড়ুল হাতে চুপচাপ সরে পড়ল।

ওদিকে হয়েছে কি, অর্জুন যে-পথ ধরে যাচ্ছিল, বিপরীত দিক থেকে সেই পথ দিয়েই আসছিল সেই মানুষখেকো দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাক্ষসটা।

রাস্তার মাঝে মুখোমুখি তারা। রাক্ষসকে দেখে অর্জুন শুধায়, 'এই তুই কে? কোথায় চলেছিস?'

—'আমি রাক্ষস, চলেছি মানুষ খেতে। কিন্তু তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না, তুমি কে?'

—'চিনবি কি করে? আমি তো এদেশের লোক নই। আমি চলেছিলাম তোরই সন্ধানে। যাক, ভালোই হল দেখা হয়ে গেল।'

—'তুমি আমার খোঁজে চলেছিলে কেন?'

—'ও, তা-ও জানিস না বুঝি? তোর মত অনেক রাক্ষসকে আমি জাদুবিদ্যা শিখিয়েছি। এখন তোকেও শেখাতে চাই।'

—'সত্যি আমাকে জাদুবিদ্যা শেখাবে?

—'শেখাব বলেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু সত্যিই কি তুই শিখতে চাস্?'

—'শিখতে চাই, আলবাৎ শিখতে চাই।'

—'শোন তবে, সত্যিই যদি জাদুবিদ্যা শিখতে চাস তবে একটিও প্রশ্ন করবি না, শুধু আমি যখন যেমন বলে যাব তখন তেমন করবি। নইলে কিন্তু কিছুই শিখতে পারবি না।'

—'ঠিক আছে। আমি আর একটা কথাও বলব না, তুমি যা যা বলবে তাই তাই করব।'

—'ভালো কথা। এবার তাহলে চুপচাপ শুয়ে পড়।'

অর্জুনের কথামত রাক্ষস রাস্তার ওপরই টানটান শুয়ে পড়ল। অর্জুন তার গায়ের চাদরটি দিয়ে বেশ শক্ত করে রাক্ষসের মাথা মুড়ে ফেলল। তারপর গরু বাঁধার দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে ফেলল রাক্ষসের হাত পা। এর পর তার কুড়ুলটা এনে সজোরে পেটাতে থাকল রাক্ষসটাকে। বোকা রাক্ষসটা এভাবেই অর্জুনের হাতে মারা পড়ল। এ-কাহিনির টাইপ—১০৮৮ : দৈত্য ও মানুষ।

চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে আর দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে অর্জুনের এই রাক্ষস-বধের কাহিনিটির মূলে আছে সেই পশুকাহিনি যেখানে এক বুড়ো চাষা এক ভয়ংকর বাঘকে জাদুবিদ্যা শেখানোর অছিলায় থলি-বন্দি করে, দড়ি দিয়ে বেঁধে লাঠি পিটিয়ে মেরেছিল।

এ কাহিনির নায়ক অর্জুন-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে রাক্ষসভীতি থাকা সত্ত্বেও, পরিস্থিতির চাপে তাকে রাক্ষস-নিধন যজ্ঞে অংশ নিতে হয়েছে। ওঝা সেজে ঘটনাক্রমে সে কৃতকার্যও হয়েছে। কিন্তু কোন কোন লোককথায় দেখা যায় যে নায়কের কার্যসিদ্ধি ঘটে তার চরিত্রের কাকতালীয় যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে। নায়ক-চরিত্রের এভাবে নতুনদিকে সহসা মোড় নেওয়া যে কোন কাহিনির ক্ষেত্রেই—লোককথার তো বটেই, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শুভ 'একুশ' সংখ্যাটির জাদুমাহাত্ম্যে লোককথার সেই বোকা আর গরিব ব্রাহ্মণ যখন রাতারাতি অতি চালাক-চতুর আর স্বচ্ছল হয়ে ওঠে তখন আমাদের নজর কেড়ে নেয় সেই সাধারণ চরিত্রটি। সত্যি বটে, ঘটনাক্রম কিংবা কাকতালীয় যোগাযোগই এগিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণের সকল মুস্কিল আসান করে দিতে। নইলে রাজকন্যার লক্ষ টাকার গলার হার হারাবে কেন, কেনইবা রাজার চরেরা হারের সন্ধান দিতে বিফল হবে, আর কেনইবা সেই হারানো হারের সন্ধান পেতে রাজাকে এই ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হতে হবে?

এটি একটি লম্বা কাহিনি। একটু কাট-ছাঁট করেই বলি:

জনশ্রুতি, বিদেশ থেকে ফিরে বোকা বামুন দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গৃহস্থ কিছু হারালে সে তার হারাধনের সন্ধান করে দেয়। দম্পতির মধ্যে মনোমালিন্য হলে, তাদের ভেতর বনিবনা করে দেয়। এমন কি কারো গরু হারালেও, তার সন্ধান বলে দেয় এই ত্রিকালদর্শী জ্যোতিষী। প্রচারের ঢক্কানিনাদে (এ-ব্যাপারে বামনির ভূমিকাই

প্রধান) স্বয়ং রাজামশাইও জেনে গেছেন জ্যোতিষী'র অনেক কীর্তিকথা। অতএব মেয়ের গলার হার হারানোয় যখন তাঁর নিজস্ব সূত্র থেকে কোন হদিস মিললনা, তখন তলব করা হল সেই ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর। রাজা জ্যোতিষীকে সরাসরি জানালেন, 'সাতদিনের মধ্যে মেয়ের চুরি যাওয়া হার বার করে দিতে পারলে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাবে, নইলে গর্দান যাবে।' রাজকন্যার গলার হার কে বা কারা চুরি করতে পারে তা ভাবতে ভাবতেই ছ'টা দিন কাবার। রাতে জ্যোতিষী ভাবে, আগামী দিনের মধ্যে যদি হারের হদিস না দিতে পারি, তবে পৈতৃক প্রাণটা যাবে।

ঘরের মধ্যে একা একা পায়চারি করতে করতে সে বিলাপ করে ওঠে, 'হায় জগদম্বা, শেষে এই ছিল তোর মনে? মারলি তো মারলি, একেবারে ধনে-প্রাণেই মারলি?'

বিলাপধ্বনি বোধ হয় একটু সোচ্চারেই হয়ে গিয়েছিল। জ্যোতিষীর বাড়ির পাশ দিয়ে এ-সময় যাচ্ছিল জগা মালিনী। রাজবাড়ির মালিনী সে। জ্যোতিষীর বিলাপধ্বনি শুনে তার চক্ষু ছানাবড়া। সে তক্ষুনি ঘরে এসে জ্যোতিষীর পা জড়িয়ে কাঁদতে থাকে, 'দোহাই ঠাকুর' এমন কাজ কক্ষনো করবনি—আমাকে তুমি বাঁচাও, রাজকন্যার হার আমিই চুরি করেছিলাম—রাজার কানে তুমি এ-কথা তুলোনি ঠাকুর।'

চতুর ব্রাহ্মণ ততক্ষণে বুঝে গেছে, কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে। তাকে তখন আর পায় কে? সে পা ছাড়িয়ে জগা মালিনীকে বলে, 'এবারকার মত তোকে মাফ করে দিলাম। এক্ষুনি তুই হারটা একটা হাঁড়ির মধ্যে ঢেকে রাজবাড়ির খিড়কি-পুকুরের পাড়ে পাঁকের মধ্যে পুঁতে দিয়ে আয়।'

জগা মালিনী প্রাণ-মান বাঁচাতে সেই রাতেই রাজকন্যার হারটা জ্যোতিষীর কথা মত পুকুরপাড়ে পাঁকের মধ্যে হাঁড়ি-সমেত রেখে এল।

পরদিন সকালে ব্রাহ্মণ যথা সময়েই রাজসভায় হাজির হল। রাজামশাই কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকালেন। ব্রাহ্মণ দরবারের অনতিদূরে চোখ বন্ধ করে ধ্যানে বসে আছে। কিছু পরে চোখ মেলে, সে রাজাকে জানাল,' 'রাজামশাই আমি ধ্যানে স্পষ্ট দেখতে পেলাম আপনার কন্যার হার এ-বাড়ির খিড়কি পুকুরের পাড়ে পাঁকের মধ্যে হাঁড়ি-সমেত অক্ষত আছে।'

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'যান, এখুনি লোক লাগিয়ে পুকুরপাড়ে তল্লাশি চালান।'

জ্যোতিষীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গণনা না ফললে, এখুনি তোমার গর্দান যাবে।'

জ্যোতিষী রাজার কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে সগর্বে বলল, 'বেদবাক্যি বিফল হলেও হতে পারে, কিন্তু এ-শর্মার গণনা কোনদিনই ভুল প্রমাণ হবে না।'

সত্যিই একটু পরে মন্ত্রীমশাই এসে জানালেন, পুকুরপাড়ের পাঁকের মধ্যে হাঁড়ি-সমেত রাজকন্যার হার মিলেছে। রাজা তখন সিংহাসন থেকে নেমে আনন্দে ব্রাহ্মণকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রতিশ্রুতিমত সহস্র স্বর্ণমুদ্রাও জ্যোতিষীর হাতে তুলে দিলেন তিনি। এ-কাহিনির টাইপ—১৬৪১: সবজান্তা।

এ-কাহিনির প্রতিতুলনায় মনে পড়ে এক বোকা জামাইয়ের সাঁওতালি কাহিনি :

সঙ্গে কিছু উপঢৌকন আনেনি বলে জামাই বাবাজির শ্বশুরবাড়ি ঢুকতে ভারী লজ্জা। সে বাড়ির পেছনের দরজার কাছে এসে লুকিয়ে ঘরের মধ্যে কী কথা হচ্ছে, শুনতে থাকে। বাড়ির সবাই খেতে বসেছে। সে শোনে তার শাশুড়ি বলছে,'জামাই আজ আসবে। আসতে অনেক রাত হয়ে যাবে। ওর জন্য দু'টো পিঠে তুলে রাখি।'

এ-কথা শোনার পরই জামাই সামনের দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকল। সবাই তাকে আদর করে ডেকে নিল। হাত-পা ধুয়ে জামাই খেতে বসলে, শাশুড়ি তার পাতে দু'টো পিঠে দিল। খাওয়া শেষ হতে, শাশুড়ি ভদ্রতা করে বলল, 'বাবা, তোমাকে আর দু'টো পিঠে দেব?'

বোকা জামাই জবাবে বলে, 'হ্যাঁ মা, আরো পেলে ভালো হত, কিন্তু আপনার তো আর পিঠে নেই।'

সবাই অবাক, মুখে মুখে রটে গেল জামাইবাবুর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা। এমনকি রাজার কানেও গেল সেই কথা। ঠিক সেই সময়েই রাজার একটা সোনার বাটি চুরি যায়। রাজামশাই জামাইকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে, তাকে সোনার বাটি খুঁজে বার করার দায়িত্ব দিলেন। জামাই বেচারা খুবই ভয় পেল। কোনমতে সাতদিন সময় চেয়ে বাড়িতে ফিরে এল। আসল সোনার বাটি চোর জামাইয়ের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা আগেই শুনেছিল। সেও ভয়ে কাঁটা। জামাইয়ের সঙ্গে চুপি চুপি এসে সে তাদের রান্নাঘরে লুকিয়ে রইল। চোরের নাম সর্বনাভ।

বাতে বৌ জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, কী অত চিন্তা করছ?'

—'সর্বনাশ হয়েছে বৌ সর্বনাশ হয়েছে।'

চোর শুনল 'সর্বনাভ করেছে'। জামাই সত্য ঘটনা জেনে গেছে ভেবে সে ছুটে এসে জামাইয়ের পদতলে লুটিয়ে পড়ে বলল, 'আমাকে বাঁচান, দু'টো দিন সময় দিলেই আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব।'

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও, পরে নিজেকে সামলে নিয়ে জামাই বলে, 'দু'টো দিন তোকে সময় দিতে পারি, তার আগে বল, কোথায় আছে সেই সোনার বাটি?'

—'পুকুর ঘাটের এক ফাটলের মধ্যে তা লুকানো আছে।'

জামাই তাকে পালাবার জন্য দু'দিন সময় দিল। চোর পালালে জামাই লোক দেখিয়ে ধ্যানে বসল রাজবাড়িতে। ধ্যানমগ্ন জামাই হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'দেখতে পেয়েছি। পুকুর ঘাটের ফাটলের মধ্যে আছে রাজার সোনার বাটি।'

রাজার লোকজন তখুনি পুকুর ঘাটের ফাটল থেকে সোনার বাটি বের করে আনল। রাজা বোকা জামাইকে অনেক টাকাকড়ি দিলেন। এ-কাহিনির টাইপ—১৬৪১: সবজান্তা।

লোককথার ভাণ্ডারে আর এক ধরনের কাহিনি আছে, ঘটনাক্রমে কিংবা কাকতালীয় যোগাযোগে নয়, মানুষের প্রখর বুদ্ধিই যেখানে সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ

করে। এমনই একটি কাহিনি এখন শোনাই। এ-কাহিনিতেও রাক্ষস আছে, খোক্কস আছে, আছে নাপিত ভায়াও। লেখাবাহুল্য, বুদ্ধিমান মানুষের প্রসঙ্গ উঠলে, নাপিতের কথা উঠবেই। এখন কাহিনি শুনুন:

খোক্কসদের ওপর রাক্ষসদের বেজায় জুলুম। ওদের রাজ্যে রাক্ষসরা প্রায়ই বেড়াতে আসে। আদর-যত্নে একটু ত্রুটি হলেই তারা খোক্কসদের বেধড়ক পেটায়।

তা, এক রাক্ষস এসেছে খোক্কসদের রাজ্যে বেড়াতে। পাহারাদারদের সজোরে এক লাথি কষিয়ে সে বলে, 'যা তোদের রাজাকে গিয়ে বল, আমি বেড়াতে এসেছি। এক মাস এখানে থাকব। অতিথিশালা সাফসুফ করে রাখে যেন। আপ্যায়নে কোন ত্রুটি হলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।'

রাক্ষসের লাথি খেয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খোক্কস পাহারাদার তখুনি ছোটে তাদের রাজার কাছে। খোক্কসরাজও খবর পেয়ে জোড়হস্তে রাক্ষসের সামনে এসে বলে, 'আপনি আমাদের রাজ্যে বেড়াতে এসেছেন, এতো আমাদের পরম সৌভাগ্য'।

রাক্ষস অতিথিশালায় বেশ জাঁকিয়েই বসে। হুকুমমাত্র গা টিপে দেওয়া, না চাইতেই সুস্বাদু খাবারদাবার পাওয়া—এমন সুখ কোথায় জুটবে?

মাস শেষ হয়ে গেল, তবু রাক্ষসের যাওয়ার লক্ষণ নেই। এদিকে রাক্ষস-সেবায় খোক্কসরাজের অর্থভাণ্ডারের কাহিল অবস্থা। উদ্বিগ্ন মন্ত্রীমশাই খোক্কসরাজকে বলে, 'শুনেছি মানুষের বুদ্ধির কাছে রাক্ষসরা পেরে ওঠে না। যদি অনুমতি দেন তবে আমি কোন মানুষের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।'

নিরুপায় খোক্কসরাজ বলে, 'আপনি যা ভালো বোঝেন, তাই করুন। আমি আর কিছু ভেবে উঠতে পারছি না।'

মন্ত্রীমশাই কালক্ষেপ না করে, পরের দিনই বেরিয়ে পড়ে মানুষের সন্ধানে। খোক্কসের দেশে তো মানুষ মেলে না, কাজেই তাকে দেশান্তরে যেতে হয়। নতুন দেশের পথে ঘুরতে ঘুরতে, আত্মহত্যায় উদ্যত এক নাপিতের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে যায় এক গাছের তলায়। মন্ত্রী নাপিতকে গাছে উঠতে দেখে শুধায়, 'আচ্ছা ভাই তুমি গাছে উঠছ কেন?'

নাপিত তখন বলে, 'আমাদের দেশে সবাই চুলকাটা আর দাড়ি কামানো ছেড়ে দিয়েছে, আমার পেশাও তাই লাটে ওঠার জোগাড়। বৌয়ের গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে আমি গাছে উঠে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি।'

মন্ত্রী নাপিতকে আত্মহত্যায় মানা করে বলে, 'অর্থাভাবেই তো তুমি আত্মহত্যা করতে চাও? কিন্তু সে সমস্যা আমি যদি দূর করে দিতে পারি?'

নাপিত দাঁড়িয়ে যায়। বলে, 'আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছিনা। একটু খোলসা করে বলুন তো?' মন্ত্রী তখন নিজের পরিচয় দিয়ে, তাদের রাজ্যে রাক্ষসের বেয়াদপি নিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত নাপিতকে শোনায়।

সব শুনে নাপিত বলে, 'রাক্ষসটাকে জব্দ করা কিছু কঠিন কাজ নয়। আমার পরামর্শমত চললে, দিন পনেরোর মধ্যেই খতম হয়ে যাবে বাপধন।'

মন্ত্রীমশাই নাপিতের কথায় ভরসা পেয়ে বলে, 'তবে চল ভাই, এখুনি আমার সঙ্গে চল।'

ধূর্ত নাপিতের এবার কপট দ্বিধার পালা। সে চোখ গোল গোল করে বলে, 'আপনাদের দেশে নিয়ে গিয়ে শেষে আমার কোন ক্ষতি করবেন না তো? '

মন্ত্রী নাপিতের কথা শুনে হাসতে হাসতে বলে, 'একটু আগে তুমিই তো মরতে যাচ্ছিলে ভাই? আমার সঙ্গে গেলে তোমার লাভ বৈ ক্ষতি হবে না।'

অতঃপর নাপিত চলল মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে খোক্কসরাজ্যে। রাজামশাই সমাদরে বরন করে নিল নাপিতকে। নাপিত রুদ্ধদ্বারকক্ষে খোক্কসরাজ আর তার মন্ত্রীর কাছে রাক্ষস-জব্দের পরিকল্পনাটি পেশ করল।

নাপিতের পরিকল্পনানুসারে রাক্ষসের জন্য দ্বিতীয় একটি অতিথিশালা নির্মাণ করতে হবে অচিরেই। ঘরটি হবে ত্রিশ হাত লম্বা আর বিশ হাত চওড়া। উচ্চতা বারো হাত হলেই চলবে। কিন্তু প্রস্তাবিত ঘরের নীচে এমন গর্ত করতে হবে যার গভীরতা হবে পঞ্চাশ হাত। গর্তের ওপর বিছিয়ে রাখতে হবে বাঁশের চাঁচড়ে তৈরি পলকা পালকের বিছানা।

রাক্ষস এখন যেমন আছে, থাকুক; ঘর তৈরি হয়ে গেলে তাকে ঐ নতুন অতিথিশালায় শোওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

নাপিতের অভিনব ঐ পরিকল্পনা খোক্কসরাজ এবং তার মন্ত্রীর মনে ধরল। খোক্কসরাজের নির্দেশে পনেরো দিনের কাজ পনেরো ঘন্টায় সেরে ফেলল সে-দেশের রাজমিস্ত্রি আর জোগানদারেরা।

বাইরে থেকে অতিথিশালাটি দেখতে খুবই সুন্দর। যেমন প্রশস্থ, তেমনি সুসজ্জিত।

রাতে খোক্কসরাজ রাক্ষস-সমীপে করজোড়ে সুসংবাদটি দিয়ে বলল, 'আপনার সম্মানে আমরা নতুন একটি অতিথিশালা নির্মাণ করেছি, অনুগ্রহ করে যদি পদধূলি দেন।'

খোক্কসরাজের কথায় গলে গিয়ে রাক্ষস তখুনি বাইরে থেকে নতুন অতিথিশালাটি দর্শন করে এসে বলল, 'খাওয়া সেরে আজ রাতেই যাচ্ছি ঐ পালকের বিছানায় শয়ন করতে।'

পেট পুরে খানাপিনা সেরে রাক্ষসটি যেই না নতুন অতিথিশালার বিছানায় শুয়েছে, অমনি একেবারে পঞ্চাশ হাত গভীরে নেমে গেল। নাপিত ভায়া তখন খোক্কস জোগাড়েদের মাটি ফেলে গর্তটি ভরাট করার নির্দেশ দিল। এ-কাহিনির টাইপ—১০৮৮ : দৈত্য ও মানুষ।

লক্ষণীয়, অর্জুনের রাক্ষস-নিধন, বোকা-ব্রাহ্মণের ভাগ্যপরিবর্তন, নাপিতভায়ার রাক্ষসবধের

কথা—এসবের পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সক্রিয় থেকেছে এদের বৌয়েরা। অর্জুনের বীরত্বই বলুন আর বোকা ব্রাহ্মণের জ্যোতিষীগিরিই বলুন কিংবা নাপিত ভায়ার চতুরতার কথাই বলুন—সবার মূলে আছে তাদের স্ত্রী-রাই। ব্রাহ্মণ আর নাপিতের দজ্জাল বৌ অথবা অর্জুনের বজ্জাত বৌ-রা একটি ব্যাপারে একমত : স্বামীকে বীর সেজেই হোক, জ্যোতিষী সেজেই হোক অথবা বুদ্ধি খাটিয়েই হোক — ঘরে প্রচুর টাকা কামিয়ে আনতে হবে।

অর্জুন এবং ব্রাহ্মণের কাহিনিতে কার্যসিদ্ধি ঘটেছে কাকতালীয় যোগাযোগে। নাপিতভায়ার কাহিনিতে অবশ্য বুদ্ধির জয় হয়েছে। এতে নায়কের কার্যসিদ্ধির মূলে আছে তার সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত বুদ্ধিবৃত্তি।

এমনই আর একটি কাহিনি এবার হাজির করি :

আদুল গাঁয়ের নিধিরাম সর্দার। রোগা লিকলিকে চেহারা। লোক তাকে তালপাতার সেপাই বলে ঠাট্টা করে। রোগা হলে হবে কি, নিধিরামের কিন্তু সাহস অসম্ভব। বাঘ-ভালুক-চিতা—কোনটা সে মারেনি?

একবার একটা বাঘ নিধিরামের দু'টো ছাগল খেয়ে ফেলে। নিধিরাম গাঁয়ের লোকদের বলে, 'চললাম জঙ্গলে, বাঘটাকে না মেরে আর ঘরমুখো হচ্ছিনা।'

গাঁয়ের লোকেরা নিধিরামকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'এমন কাজটি ক'রোনা বাপু, খালি হাতে বাঘ মারতে যেও না। বাগে পেলে বাঘ তোমায় ছেড়ে কথা কইবে না। বাড়ির বারান্দায় বসে গাল ফুলিয়ে মুখে মুখে বাঘ-ভালুক যা ইচ্ছে মেরে যাও, সত্যি-সত্যি বাঘ মারতে যেওনা।'

নিধিরাম গ্রামবাসীদের রেগেমেগে বলে, 'তোমরা আমাকে ঠাট্টা করছ, আমি কিন্তু সত্যিই বাঘ মারতে চললাম।'

নিধিরাম সঙ্গে একটা থলি নিয়ে প্রথমে গেল বাজারে। বাজার থেকে কিছু কেনাকাটা সেরে, লম্বা-লম্বা পা ফেলে এবার সে চলল বনের পথে। পরিচিত লোকেরা, যারা নিধিরামকে যেতে দেখেছিল, তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে সে বলতে লাগল, 'আজ এসপার কি ওসপার করে ছাড়ব।'

নিধিরামের হম্বিতম্বি দেখে পরিচিতজনেরা তার মায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'এবার নিধিরাম নির্ঘাৎ বাঘের ভোগেই গেল।'

নিধিরামের মা প্রতিবেশীদের কথা শুনে মরাকান্না জুড়ে দিল।

নিধিরাম অবশ্য রীতিমত তৈরি হয়েই বনে গিয়েছিল। বেশ বড় এক মাংসখণ্ড বাজার থেকে কিনে, তাতে মিশিয়েছিল বিশ ভরি আফিং। তারপর এক উঁচু গাছের ওপর বসে বাঘের জন্য অপেক্ষা করছিল।

বাঘটা এল আরো কিছুক্ষণ পর। নিধিরামের দিকে লুব্ধ চোখে চেয়ে মেঘমন্দ্রস্বরে হুংকার ছাড়ল। এরপর নিধিরামকে ধরবার জন্য লাফ মারল। নিধিরামের দেহ খুবই

পাতলা। সে গাছের মগডালে দিব্যি বসে রইল, বাঘ লাফিয়েও তার নাগাল পেল না।

বাঘটা তা বলে নিধিরামকে খাওয়ার আশাও ছাড়ল না। সে এক লহমায় দেখে নিয়েছে যে নিধিরামের হাতে কোন হাতিয়ার নেই। মগডালে আর কতক্ষণ বসে থাকবে বাপধন। প্রয়োজনে তাকে নীচে নামতেই হবে।

গাছের তলায় বসে বাঘ গভীর মনোযোগের সঙ্গে গা চাটতে লাগল আর নিধিরাম সে-গাছের মাথায় বসে গুনগুন সুরে গান গাইতে লাগল।

নিধিরামের গলায় এই পরিস্থিতিতেও গান বেরুচ্ছে দেখে অবাক বাঘ হাঁ করে ওপর দিকে চাইল। সুযোগ পেয়ে নিধিরাম সেই আফিংমিশ্রিত মাংসখণ্ডটি টুক করে নীচে ফেলে দিল। লক্ষ্য ছিল টিপ করে একেবারে গলার মধ্যে ফেলা। হল না।

বাঘ ওপর থেকে ফেলা মাংসখণ্ডটি প্রথমে শুঁকল। চাটল। না, ভালোই আছে। তারপর টপ করে মুখে পুরে দিল।

নিধিরাম তখন ডালে বসে গান জুড়েছে : খেয়ে দেয়ে ঘুম যা। আর কিছু চাস না।

বাঘটা তবু আরো মাংস খাওয়ার লোভে ওপর দিকে তাকিয়ে ছিল। নিধিরাম তখন সংগীতচর্চায় মগ্ন। ওপর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই এক সময় বাঘ বাবাজির চোখ দু'টি বুজে এল। খানিক পড়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল বাঘ।

নিধিরাম এবার নীচে নেমে এসে বাঘটাকে নেড়েচেড়ে দেখে নিল। বেঘোর ঘুমে অচৈতন্য সে। এবার থলি থেকে কাটারি বার করে বাঘের গলাটা কেটে ফেলল। এক কোপে হল না, কয়েকটা কোপ দিতে হল।

বাঘের মুণ্ডুটা এক হাতে ধরে, অন্য হাতে থলি নিয়ে নিধিরাম দ্রুত পায়ে বাড়ির পথে রওনা দিল। গাঁয়ে পৌঁছাতেই গ্রামবাসী তাকে ছেঁকে ধরল। নিধিরাম তাদের বুক চিতিয়ে বলল, 'আমার বাপু যেমন কথা তেমন কাজ। এক কাটারির কোপেই বাঘ খতম। তোমরা জনাবিশেক মিলে দা-বল্লম নিয়ে এখন বনে যাও, তিন ক্রোশ দূরে এক উঁচু পাকুড় গাছের তলায় বাঘটার ধড় পড়ে আছে। মাংস তোমরা ভাগ করে নিও, চামড়াটা কিন্তু আমার।'

গাঁয়ের লোকেরা হতবাক। নিধিরামকে তারা রীতিমত সমীহ করতে শুরু করল। কচিকাঁচারা আওয়াজ তুলল, 'নিধিরাম সর্দার জিন্দাবাদ। এ-কাহিনির টাইপ— ১৬৪০ : বাঘ-মারা বীর।

চাতুর্যদ্বারা কার্যসিদ্ধির যে প্রয়াস ইতিমধ্যে বেশ ক'টি কাহিনিতে ফুটে উঠেছে, তাকে বাংলা লোককথার একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করলে বোধ হয় ভুল হবে না।

বাঙালি-স্বভাবে বীরত্বের ভূমিকা গৌণ। এ-কারণে বাংলার লোককথায় বীরত্বব্যঞ্জক

কাহিনি খুব কম। বাঙালি গল্প-কথায় বীরত্বের অভাবটুকু বুদ্ধি দিয়েই ঢেকে দিতে চায়। দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্যে দিয়ে কার্যসিদ্ধির চেয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে জয়লাভের কাহিনির অতএব অধিক্য দেখা যায় বাংলা লোককথায়।

আগে ক'টি কাহিনিতে আমরা লক্ষ্য করেছি, বেশ কিছুটা ঝুঁকি নিয়েও, স্বামীর উন্নতির পথে তাদের স্ত্রী-রা যোগ্য সহধর্মিণীর ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এবার যে কাহিনিটি হাজির করব তাতে স্বামীর উন্নতি তো দূরকথা, কারাবাসের আয়োজন পাকা করে ফেলেছিল বৌ। নিজের উপস্থিতবুদ্ধির সাহায্যে সে-যাত্রায় স্বামী বেচারা কোনক্রমে রেহাই পেয়েছিল। এবার সেই কাহিনি শুনুন : এক গরিব চাষা গেছে বনে ফলমূল সংগ্রহে। ঘরে আছে বৌ। বৌটা এমনিতে খারাপ নয়। কিন্তু একটাই দোষ তার, কোন কথাই পেটে ধরে রাখতে পারে না। একবার কোন কথা তার কানে ঢুকলে নিমেষে সারা গাঁয়ে তা রাষ্ট্র হয়ে যায়।

গরিব চাষার বরাত ভালো, বনে গিয়ে সে এক গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। মনে তার আনন্দ ধরে না, আবার চিন্তাও কম নয়। বৌ টের পেলে সারা গাঁয়ে ঢোল পিটিয়ে রটাবে। মুস্কিল হচ্ছে বৌয়ের কাছে চেপে গেলে, যখন জানতে পারবে—হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে।

ভাবতে ভাবতে চাষার মাথায় এক বুদ্ধি চাগাড় দিল। গুপ্তধনটা আবার মাটিতে পুঁতে, ঐ-জায়গাটায় বিশেষে এক চিহ্ন এঁকে, সে বাড়ি ফিরে এল। নদীর কাছাকাছি এসে দেখে জলে একটা মাছ ছটফট করছে। মাছটা জালে ধরে, হাতে ঝোলাতে ঝোলাতে আবার সে বাড়িমুখো হাঁটতে লাগল। আর একটু এগিয়ে, তাবই পাতা ফাঁদে দেখে একটা খরগস আটকা পড়েছে। খরগসটাকে ফাঁদ থেকে বের করে চাষা মাছটাকে ফাঁদে রাখে। খরগসটাকে সে জড়িয়ে নেয় তার জালের মধ্যে।

বাড়ি ফিরতে সেদিন চাষার একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল। উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বৌকে জানাল, 'উনুনে আঁচ দিয়ে বেশ কিছু সরু চাকলি বানাও তো'।

—'সেকি, এত রাতে সরু চাকলি?'

—'যা বলছি, কর তো। গুপ্তধনের হদিস পেয়েছি আমি। আজ রাতেই গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।'

বৌয়ের আনন্দ আর ধরেনা। তখুনি উনুন জ্বেলে সরু চাকলি বানাতে বসে যায় সে। চাষাকে খুব খাতির করে বলে, 'গরম গরম খেয়ে নাও তো।' চাষা একটা সরু চাকলি মুখে দেয় তো গোটা তিনেক গিন্নির চোখের আড়ালে থলিতে পোরে।

চাষার বৌ বিগলিত গলায় বলে, 'আজ যে তুমি গো-গ্রাসে গিলছ, সরু চাকলি জোগানে তোমার সঙ্গে পেরে ওঠাই দায় হয়ে উঠল দেখছি।'

—'বহু দূর যেতে হবে, তায় গুপ্তধনের হাঁড়িটা বেজায় ভারী, তাই পেটপুরে খেয়ে নিচ্ছি।'

সরু চাকলিতে থলিটা যখন ভরে গেল তখন চাষা বৌকে বলে, 'আমার পেট ভরে গেছে। নাও, এবার তুমিও কিছু খেয়ে নিয়ে চল আমার সঙ্গে।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক'টা সরু চাকলি গলায় পুরে চাষার বৌ কর্তার সঙ্গে বনের পথে রওনা দিল।

রাত্রি গভীর। পথ এবড়ো-খেবড়ো। চাষা আগে আগে যায়, আর একটা দু'টো করে সরু চাকলি থলি থেকে তুলে গাছের ডালে লটকে রেখে যায়। পেছনে আসতে আসতে গাছে ঝুলতে থাকা সরু চাকলিগুলো চোখে পড়ে চাষার বৌয়ের। সে অবাক হয়ে চাষাকে বলে, 'দেখ দেখ কত সরু চাকলি হয়েছে গাছে!'

—'এ আর এমন কি, একটু আগে দেখলে না সরু চাকলির বৃষ্টি হচ্ছিল?'

—'হচ্ছিল বুঝি? আমার চোখে পড়েনি। আসলে আমি মাটির দিকে চোখ রেখে হাঁটছিলাম, যাতে গাছের শেকড়ে পা বিঁধে হুমড়ি খেয়ে না পড়ি।'

চাষা এবার গিন্নিকে বলে, 'দাঁড়াও ওখানে একটা খরগস ধরার ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম — একবার দেখে আসি চল।'

ফাঁদের কাছে গিয়ে চাষা একটা মাছ বের করে আনে।

'আরে মাছ এভাবে ফাঁদে এসে কীভাবে ধরা দিল?'— চাষার বৌয়ের চক্ষু চড়ক গাছ!

—'তাও জাননা বুঝি, জলের মাছের মত ডাঙ্গার মাছও তো আছে?'

—'জানতাম না তো, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসও করতাম না।'

এরপর চাষা আর তার বৌ এল নদীর ধারে। চাষার বৌ বলল, 'এখানে কাছেপিঠে নিশ্চয় তোমার জাল পাতা আছে — চল একবার দেখে আসি।'

ওরা খুঁজতে খুঁজতে জালটা বার করল বটে, কিন্তু তুলে দেখল জালের মধ্যে একটা খরগোস!

'মাগো, কীসব বিদিগিচ্ছিরি কাণ্ড! কী-যে সব হচ্ছে আজ, খরগস কিনা মাছের জালে আটকা পড়ল।'

—'এতে অবাক হবার কি আছে? জীবনে যেন জল খরগোস দেখনি?'

'সত্যিই কোনদিন দেখিনি গো'—চাষার বৌ সবিস্ময়ে স্বীকার করে।

ইতিমধ্যে কখন যেন ওরা গুপ্তধনের এলাকায় এসে পড়েছে। চতুর চাষা আগেই চিহ্ন রেখে গিয়েছিল, তাই চিনতে দেরি হয়নি। জায়গাটার কাছে আসতেই চাষার তৎপরতা বেড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি মাটি খুঁড়ে মোহরের হাঁড়িটা বের করে আনল। সত্যিই বেশ ভারী, তবু চাষার খুশির শেষ নেই মনে। এ-ভার বইতেও যে কী আনন্দ। হাঁড়িটা মাথায় চাপিয়ে, বৌকে সঙ্গে নিয়ে চাষা চলল বাড়ির দিকে। কাহিনির এ-অংশটুকুর টাইপ—৫৬৪ : মোহর ভর্তি হাঁড়ি।

চাষার বাড়ি যেতে হলে জমিদারবাবুর বাড়ির সামনে দিয়েই যেতে হবে। জমিদারবাড়ির কাছে এসে ওরা শোনে 'ব্যা-ব্যা' রবে ভেড়া ডাকছে। বৌ চাষার গা-ঘেঁষে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ওটা কিসের শব্দ? আমার ভীষণ ভয় করছে।'

—'দৌড়ে চল শিগগির, ভূতে জমিদারবাবুকে গলা টিপে মারছে, আমাদের ওরা যেন দেখতে না পায়।'

বৌ পড়ি-কি মরি ছুটে এক দৌড়ে বাড়ি।

গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে চাষা আর তার বৌ ঘুমাতে আসে। শোওয়ার আগে বৌকে চাষা সতর্ক করে দেয়, 'দ্যাখ বৌ, গুপ্তধনের সংবাদ পাঁচকান করবিনে যেন। লোবে টের পেলেই বিপদ হবে।'

—'কী যে বল, ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পাবে না।'

পরদিন ওরা ঘুম থেকে উঠল দেরি করে। আসলে আনন্দের উত্তেজনায় অনেক রাত অব্দি ওদের কারুরই ঘুম আসেনি। বৌ উনুনে আঁচ দিয়ে জল আনতে গেল পুকুরে। পড়শিরা শুধাল, 'আজ বড় বেলা হল লা?'

—'আর বলনা, কাল রাতে বাইরে গেছিলাম কি না, তাই ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল।'

--'রাতে বাড়ি ছিলি না? গিয়েছিলি কোথায়?'

—'আমার সোয়ামি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে তো, তাই গেছিলাম তা আনতে।'

ব্যস, আর যায় কোথায়। সারা দিন গাঁয়ে কেবল একটিই আলোচনা—গুপ্তধন আর গুপ্তধন।

সন্ধে-নাগাদ কথাটা কানে পৌঁছে গেল জমিদারবাবুরও। তিনি শুনেই চাষাকে তলব করে এনে বললেন, 'গুপ্তধন পেয়েছো তো আমায় জানাওনি কেন?'

চতুর চাষা অম্লানবদনে বলে, 'গুপ্তধন? জীবনে এমন কথা কানেও শুনিনি।'

জমিদারবাবু বিরক্তকণ্ঠে বললেন, 'বাজে কথা রাখ, তোমার বৌ তো সবাইকে বলে বেড়িয়েছে।'

—'ওর কথা বাদ দিন বাবু, এমন সব কথা ও বলে বেড়ায় যার কোন মাথা-মুণ্ডু নেই।'

'বটে? তবে তো ডেকে তাকে পরখ করতে হয়?'—জমিদারবাবু তখুনি চাষার বৌকে ডেকে পাঠালেন। চাষার বৌ আসতেই জমিদারবাবু তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার স্বামী গুপ্তধন পেয়েছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, পেয়েছেই তো।'

—'তোমরা দু'জন কাল রাতে গুপ্তধন আনতে বনে গিয়েছিলে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলামই তো।'

—'সব কথা খুলে বল তো মা।'

—'প্রথমে তো আমরা বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, দেখছি গাছে গাছে সরু চাকলি ঝুলে রয়েছে।'

—'গাছে-গাছে সরু চাকলি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, সরু-চাকলির বৃষ্টি হয়েছিল তো তার আগে।'

'সরুচাকলির বৃষ্টি?'—জমিদারবাবুর চোখ কপালে ওঠে।

—'তারপর খরগোস ধরার ফাঁদে গিয়ে দেখি, একটা মাছ আটকে রয়েছে সেই ফাঁদে। মাছটা ফাঁদ থেকে বের করে এনে চলতে লাগলাম। নদীর কাছাকাছি এসে দেখি, নদীতে জাল পাতা। জাল খুলে দেখি তার মধ্যে একটা খরগোস। খরগোসটাও সঙ্গে নিয়ে চলি। এরপরই আমার স্বামী বনের মধ্যে যেখানে গুপ্তধন ছিল, সে-জায়গাটার সন্ধান পেল। মোহর-ভর্তি হাঁড়িটা নিয়ে আমরা যখন আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম, তখনই তো হুজুরের গলা টিপে ধরেছিল ভূতে।'

চাষার বৌয়ের কথা শুনে জমিদারবাবু খুবই কুপিত হন। তিনি মাটিতে রাগে পা ঠুকতে ঠুকতে বলে ওঠেন, 'এক্ষুনি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।'

চাষা এবার জমিদারবাবুকে বলে, 'শুনলেন তো হুজুর, আমার বৌয়ের কথার ছিরিছাঁদ এমনই। এমন পাগলকে নিয়ে আমার ঘর করতে হচ্ছে — তাহলেই বুঝুন।'

'বেশ ভালোই বুঝেছি। এবার ভালোয়-ভালোয় বিদেয় হও, নইলে'—

জমিদারবাবুকে কথাটা আর শেষ করতে হল না, তার আগেই চাষা ওখান থেকে চম্পট দিল। এ-কাহিনির টাইপ—১৩৮০ : অবিশ্বাসী বৌ।

এতাবৎ যেসব কাহিনি শোনানো হল, তাতে নায়ক বুদ্ধি খাটিয়ে ঘটনাক্রমে কার্যসিদ্ধিতে সফল হয়েছে। এখন যেসব কাহিনি শোনাব তাতেও বুদ্ধির সাহায্যে কার্যসিদ্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু সে-বুদ্ধি সুবুদ্ধি নয় মোটেই, কুবুদ্ধি। তাতে কোথাও কোথাও আবার মিশে আছে প্রতিশোধস্পৃহা। প্রথম কাহিনিটি একটা মিকির উপাখ্যান। পূর্ব ভারত এবং বাংলাদেশে আদিবাসী উপজাতি সমাজ বলতে বোঝায় মূলত নিষাদ আর কিরাত সমাজ। প্রথমটির মধ্যে পড়ে কোল-ভিল-মুণ্ডা-সাঁওতাল। আর দ্বিতীয়টার মধ্যে পড়ে মিকির-কাছাড়ি-গারো-মিনিয়ং-খাসিয়া ইত্যাদি। নিষাদেরা দলবদ্ধভাবে বাস করে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বীরভূম-মেদিনীপুর জেলায় এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশ ঝাড়খণ্ডে। কিরাতেরা বাস করে মূলত উত্তর ভারতের পাহাড়ি এলাকা এবং বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায়। যে মিকির কাহিনিটি এখানে পেশ করব তার নাম 'ছয় মাতুলের পাতালযাত্রা।' কাহিনিটি এ-রকম :

এক গাঁয়ে এক দুঃখিনী বিধবা। স্বামী তার কোলে একটা ছোট্ট ছেলে রেখে হঠাৎই গত হয়। বিধবাটির ছয়-ছয়টি উপার্জনশীল ভাই। বিধবা ভাইদের কাছে আসে সাহায্যের আশায়। ভাইরা কিন্তু বোনকে কিছুই সাহায্য করে না। অগত্যা বিধবা ঐ-গাঁয়ের

শেষপ্রান্তে একটা ঘর বেঁধে, বনের কাঠ বিক্রি করে কোনমতে ছেলেটাকে বড় করতে থাকে।

কালক্রমে ছেলেটা শেয়ানা হয়ে ওঠে। সে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া হাত-খরচা থেকে কিছু কিছু জমিয়ে একদিন একটা বাছুর কিনে ফেলে।

বাছুরটাকে খাইয়ে-পরিয়ে দিব্যি নধরকান্তি করে তুলেছে সে। মামারা একই গাঁয়ে থাকলেও, ভাগ্নের কোন উপকারে তো লাগেই না, উল্টে হিংসের জ্বালায় করে কি, বাছুরটাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে।

ভাগ্নে মৃত বাছুরটিকে দেখে মনে মনে খুবই ব্যথা পায়, কিন্তু একটুও মুষড়ে পড়েনা। সে সহজেই বোঝে, এই কম্ম তার মামাদেরই। কিন্তু সেজন্য প্রকাশ্যে কাউকে দোষারোপ বা গালমন্দ না করে সে করে কি, মরা বাছুরটার ছাল ছাড়িয়ে একটা ঠ্যাং কেটে বস্তার মধ্যে পুরে, রাতের আঁধারে ভিন গাঁয়ের এক গোঁড়া ব্রাহ্মণের ঘরের কোণে রেখে আসে।

পরদিন সকালে ব্রাহ্মণের দরজায় নিজেই কড়া নেড়ে ব্রাহ্মণকে ডেকে সে বলে, 'কী মশাই? আপনার ঘরে টাটকা গো-মাংসের গন্ধ পাচ্ছি কেন?'

ব্রাহ্মণ তো ছেলেটার কথা শুনে দারুণ রেগে ওঠেন, 'কি বলছিস নচ্ছার? তোর মুখে পোকা পড়ুক। জানিস না এটা ব্রাহ্মণের বাড়ি, এখানে গো-মাংস আসবে কোত্থেকে? দ্যাখ খুঁজে পেতে দ্যাখ, যদি বার করতে না পারিস তবে তোর একদিন কি আমার একদিন।'

ভাগ্নে তো এমন কথারই অপেক্ষায় ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের ঘরে ঢুকে পড়ল। আর কেউ না জানুক সে তো নিজে জানে গরুর ঠ্যাং কোথায় পড়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি সেটা সংগ্রহ করে এনে ব্রাহ্মণকে বলে, 'বড় যে বড়াই করছিলেন, এখন দেখুন তো এটা কি?'

ব্রাহ্মণ ভাগ্নের কারসাজি ঠিকই ধরেছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করলেন না। কেননা তা করলে প্রতিবেশীরা টের পেয়ে যাবে। সে মহা অনর্থ হবে।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চিন্তা করে তিনি ভাগ্নেকে কাছে ডেকে বললেন, 'বাছা তোকে আমি এক থলি স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি, দোহাই তোর, এ-নিয়ে আর হৈ-চৈ করিস না।'

ব্রাহ্মণের কাছে এক থলি স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে ভাগ্নে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে আসে এবং মাকে বলে, 'মামাবাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি চাল মাপার ধামাটা নিয়ে এসো তো মা।'

মা ভাইদের কাছ থেকে চাল মাপার ধামাটা চেয়ে নিয়ে আসে।

ওদিকে, মামারা অবাক। দিনে দু'মুঠো ভাত জোটে না যাদের, তারা চাল মাপার ধামা নিয়ে কি করে?

ছোটমামা চুপিচুপি আগে ব্যাপারটা বুঝতে বেড়ার আড়াল থেকে সব কিছু দেখে। তার তো চক্ষু স্থির। ভাগ্নে তাদের ধামায় টাকার পাহাড় জমিয়ে গুনতে লেগেছে।

ছোটমামা সে-দৃশ্য আর বেশিক্ষণ দেখতে পারল না। বাড়ি ফিরে অন্য ভাইদের জানাল। সব মামা মিলে তখন ভাগ্নেকে ডেকে পাঠাল। ভাগ্নে এলে, তারা শুধায়, 'এত টাকা পেলি কোথায়?'

—'ভিন গাঁয়ে আমার মরা বাছুরের মাংস বেচে ঐ টাকা পেয়েছি।'

—'গো-মাংসের এত চাহিদা?'

—'তাও তো সবাইকে দিয়ে উঠতে পারিনি। আমার বাছুরটা তো ছোট ছিল, তাই তার মাংসও কম।'

ভাগ্নের কাছে গাঁয়ের নাম জেনে, মামারা নিভৃতে আবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিল। তাদের অনেক গরু আছে। সেগুলো কেটে মাংস বিক্রি করলে তবে তো কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আমদানি হবে।

মামারা সেই রাতেই গরুগুলো মেরে বস্তা-বোঝাই গোমাংস নিয়ে ছুটল ভাগ্নের মুখে-শোনা গ্রামটিতে।

'গরুর মাংস চাই গো' ডাক শুনে গাঁয়ের মানুষ হাঁই-হাঁই করে তেড়ে এল। চারদিক থেকে তারা ঘিরে ধরল ছয় মামাকে। তাদের মধ্যে আগের রাত্রে ভাগ্নের কাছে বেকুব বনে যাওয়া ব্রাহ্মণটিও ছিলেন। তিনিই প্রথম প্রহার শুরু করলেন, তারপর আর সকলে তাদের হাতের সুখ মিটিয়ে নিল। মাংস-বোঝাই বস্তাগুলো ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অনেক দূরে মাটিতে পুঁতে দিল। মামারা কোন গতিকে পিতৃদত্ত প্রাণ সঙ্গে করে বাড়ি ফিরল।

ভাগ্নে মামাদের গো-মাংস বিক্রির পরিণামের কথা চিন্তা করে আর তার ফলে নিজের কি হাল হতে পারে তা ভেবে আগেভাগেই মা আর ঘর-সংসারের টুকিটাকি সবকিছু নিয়ে বাড়ির অদূরেই একটা বটগাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল।

প্রহৃত মামারা ভাগ্নের ওপর এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে সেই রাতে গাঁয়ে ফিরে তাদের প্রথম কাজ হয়েছিল ভাগ্নের ঘরে আগুন দেওয়া।

ঘরে আগুন দিতে দেখেও কিন্তু ভাগ্নে মামাদের বাধা দিতে গেল না। সে বরং পরদিন সকালে তার ঘর-পোড়া ছাই বস্তা-বোঝাই করে আরেক নতুন গাঁয়ে হাজির হল। সেই গাঁয়ের মানুষেরা তখন অজ্ঞাত এক চোখের রোগে সবাই আক্রান্ত। হাকিম-বদ্যি সারাতে পারছে না সে-রোগ। ভাগ্নে সেই গাঁয়ে তখন চোখের রোগ সারাবার দৈব ওষুধ হিসেবে সেই ছাই বিক্রি করতে লাগল। দৈব ওষুধের নামে গাঁয়ের রোগীরা হুড়মুড় করে হাজির হল ভাগ্নের কাছে। ভাগ্নে তাদের বলল, 'আমার দেওয়া এই ছাই চোখের পাতায় কিছুক্ষণ ঘষতে পারলে, চোখের রোগ উধাও হয়ে যাবে।'

গাঁয়ের লোকেরা ভাগ্নের ওষুধের গুণের কথা শুনে, রাশি-রাশি টাকা দিয়ে ভাগ্নের দেওয়া ছাই কিনতে লাগল। গদ্গদ কণ্ঠে তারা বলল, 'আমাদের রোগ সারলে বাবা আমরা তোমার গোলাম হয়ে থাকব।'

ভাগ্নে এবার গাঁয়ের লোকদের তার ওষুধ ব্যবহারের বিধি জানিয়ে দিল, 'আমি যখন এ-গাঁ ছাড়িয়ে নিজের গাঁয়ের দিকে রওনা হব, তখন বেশ কিছুটা পথ পেরিয়ে আমি একটা সংকেত দেব। একমাত্র তখনই চোখের পাতায় তোমরা ছাই ঘষতে থাকবে, আগে করলে কোন কাজ হবে না।'

এইসব বলে ভাগ্নে তো ছাই নিয়ে গিয়েছিল যেসব বস্তায়, তা টাকা-বোঝাই করে নিজের গাঁয়ের পথে রওনা দিল। সে চোখের আড়ালে চলে গেলে, গ্রামবাসীরা চিৎকার করে জানতে চাইল, 'এবার কি আমরা ছাই ঘষতে শুরু করব?'

দূর থেকে ভাগ্নের জবাব ভেসে এল, 'আর একটুক্ষণ সবুর কর, তাড়াহুড়ো করলে, দ্রব্যগুণ নষ্ট হবে।'

নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে ভাগ্নে আরো কণ্ঠ চড়িয়ে বলে, 'এবার তোমরা যতক্ষণ ইচ্ছে চোখের পাতায় ছাই ঘষ।'

গ্রামবাসীরা তখন ভাগ্নের কথামত চোখের পাতায় ছাই ঘষতে শুরু করল। তারপর তাদের যে কী দুর্গতিই না হল, তা আর কহতব্য নয়। অনেকের চোখ বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল, অনেকে চিরতরে অন্ধ হয়ে গেল। তারা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগল, 'এক মাঘে শীত যায় না, পরে কোথাও যদি ব্যাটাকে দেখতে পাই, তবে আস্ত চিবিয়ে খাব।'

ভাগ্নে গাছতলায় ফিরে এসে আবার মাকে মামাবাড়ি পাঠাল ধামা আনতে। এবারও সেই ছোটমামা এল বোনের সঙ্গে ধামা চাওয়ার রহস্য ভেদ করতে। ভাগ্নে তখন বস্তা থেকে টাকাগুলো বার করছে। মামা অবাক গলায় ভাগ্নেকে শুধায়, 'এত টাকা ফের কোথায় পেলি তুই?'

ভাগ্নে বীরদর্পে জানায়, 'এ হল আমার পোড়া ঘরের ছাই বেচে পাওয়া টাকা। যে-গাঁয়ে ছাই বেচতে গিয়েছিলাম তারা বলছে এত অল্প ছাইয়ে তাদের কুলোবে না, আরো ছাই চাই। আমার কুঁড়ে ঘরটা তো খুব ছোট, তাই কম ছাই বেচে এতগুলো টাকা পেয়েছি। তোমাদের বাড়ি তো বড়, তাই তার ছাই বেচলে এত টাকা পাবে যে বয়ে আনতে মুটে ডাকতে হবে।'

আশা সত্যিই কুহকিনী। ভাগ্নের কথায় বিশ্বাস করে মামারা স্থির করে যে এমন সুযোগ হাত-ছাড়া করা মোটেই সমীচীন হবে না। ভাগ্নের কাছে ছোটমামা আগেই ছাই বিক্রির গ্রামখানির শুলুক-মুলুক জেনে নিয়েছিল। এবার সব ভাই মিলে তাদের বসতবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর বস্তা-বোঝাই ছাই নিয়ে যেই বেচতে গেল সেই চোখের রোগীদের গাঁয়ে, তখন মামারা যে কী নাস্তানাবুদই না হল তা ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। এ-কাহিনির টাইপ—১৫৩৯ : চাতুর্য ও প্রতারণা।

আগের কাহিনিটির প্রতিতুলনায় মনে পড়ে মেদিনীপুর জেলার দুহমুন্ডা গ্রামে শোনা একটি কাহিনি। কাহিনির নায়ক নেউলকুমার। রাজপুত্র সে। রাজার সাত রানি। কারোরই কোন সন্তান ছিল না। সন্ন্যাসীর দেওয়া আম খেয়ে প্রথম ছ'রানির ছ'টি স্বাভাবিক সন্তান হয়েছে। ছোটরানির আম জোটেনি, জুটেছিল আমের আঁটি। আমের আঁটি খাওয়ায় তার কোলে এসেছে নেউল।

ছোটরানির মনে দুঃখের শেষ নেই। বিরলে বসে বসে কাঁদে সে। নেউলকুমার মাকে কাঁদতে দেখে সান্ত্বনা দেয়, 'মা তুই কাঁদিস নে। আমি ছোট হতে পারি, কিন্তু কাজে কারো চেয়ে কমতি যাইনে।'

ছয় রাজকুমার তাদের মামাবাড়ি যাচ্ছে বেড়াতে, হাতি-ঘোড়ায় চেপে। নেউলকুমারও ওদের দেখে জিদ ধরে, 'মা, আমিও মামাবাড়ি যাব।'

ছোটরানি লজ্জায় নেউলকুমারকে মামাবাড়ি পাঠাতে চায় না, কিন্তু ছেলের আব্দার সে মামাবাড়ি যাবেই।

গেলও সে। যথারীতি দিদিমার কাছে খুব আদর-যত্নও পেল। মামা কিন্তু ভাগ্নেকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারলনা। রীতিমত অবজ্ঞাই ফুটে উঠল তার চোখেমুখে। সে একদিন ভাগ্নেকে বলল, 'যা তো, আমার ছেলেটাকে নদীর ধার থেকে একটু ঘুরিয়ে আন তো।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেউলকুমার তার মামাতো ভাইটিকে নিয়ে নদীতীরে বেড়াতে গেল। যেতে যেতে ভাইটির পথে বেজায় পায়খানা পেয়েছে। সে নেউলকুমারকে অনুনয় করে বলে, 'দাদা, আমাকে ঝোপের ভেতর নিয়ে চল, পায়খানা করব।'

তা শুনে নেউলকুমার ভাইয়ের কাছে এক অদ্ভুত শর্ত রাখল, 'তোর কথামত শুধুই পায়খানা করতে পারবি, পেচ্ছাপ করা কিন্তু চলবে না।'

এই অসম্ভব শর্ত শুনে ভাই বেচারা কাঁদতে লাগল। ভাইয়ের কাছে গিয়ে নেউলকুমার তখন চুপিচুপি বলে, 'তোকে এখুনি রেহাই দিতে পারি, যদি তুই দিদিমার মোহরের ঠেক-ঠিকানা ঠিক-ঠিক বলতে পারিস।'

বাঁচার গরজে মামাতো ভাই তখন নেউলকুমারকে দিদিমার গুপ্ত ধনের শুলুক-ঠিকানা কবুল করে বলল, 'তুলসীতলার কাছে মাটির নীচে সেসব কলস ভরে পোঁতা আছে।'

ফিরে এসে নেউলকুমার সে রাতেই মাটির নীচ থেকে মোহর ভাণ্ডার বার করে এবং তা গাছের পাতাসহ বুড়ো ছাগলটাকে খাইয়ে দেয়।

পরদিন সকাল হতেই নেউলকুমার জানাল যে সে বাড়ি ফিরে যাবে। দিদিমা আদরের নাতিকে আরো কিছুদিন থেকে যেতে অনুরোধ করে, কিন্তু নাতির গোঁয়ের কাছে তাকে হার মানতে হয়। তখন দিদিমা তাকে বলে, 'তোর অন্য ভাইরা তো হাতি-ঘোড়ায় চেপে বাড়ি ফিরবে, তুই আমার কাছে কি চাস?'

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে নেউলকুমার মোহরগর্ভ বুড়ো ছাগলটাকে দেখিয়ে বলে, 'আমি কেবল ঐ ছাগলটাই চাই, আর কিছু নয়।'

দিদিমা নাতির আর্জি শুনে বলে, 'দুর বোকা, চাইবার আর জিনিস পেলিনা?'

নেউলকুমার তবু নাছোড়বান্দা। অগত্যা, সে বুড়ো ছাগলটার পিঠে চেপেই বাড়ি ফিরে এল।

বাড়ি ফিরেই নেউলকুমার হাঁকে, 'মা, এখুনি লাঠি আর পাটি নিয়ে আয় তো।'

ছোটরানি ছেলের কথায় অবাক। কিন্তু আদেশ না মেনেও উপায় নেই। ছোট হলেও, নেউলের মেজাজ সর্বদাই সপ্তমে চড়া। পান থেকে একটু চুন খসলেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ছাড়বে।

পাটি বিছিয়ে, ছাগলটাকে তার ওপর খুঁটিতে বেঁধে রেখে, লাঠি দিয়ে এরপর নেউলকুমার ছাগলের পেটে সজোরে পেটাতে লাগল। ঠিক সেই সময় আবার নেউলকুমারের ছয় ভাই ঘোড়া চেপে তাদের মামাবাড়ি থেকে ফিরে আসে। তারা দেখে নেউলকুমার ছাগলটাকে পেটাচ্ছে আর ছাগলনাদার সঙ্গে অসংখ্য মোহর বার হচ্ছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অন্য ভাইদের ছাগলটার ওপর লোভ হল। তারা ছাগলটাকে চেয়ে বসল নেউলের কাছে।

ইতিমধ্যে নেউলকুমার গুনে দেখে গতরাতে ছাগলটাকে যতগুলি মোহর সে খাইয়েছিল, একটি বাদে সবই উশুল হয়ে গেছে। সে ভাইদের প্রস্তাব শুনে জানাল, হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সে এই মোহরপ্রসূ ছাগলটিকে দিতে রাজি।

ভাইরা ভাবে একদিনেই যদি এত মোহর পাওয়া যায় তবে সহস্র মোহর পেতে আর ক'দিন লাগবে? তারা তখুনি নগদ সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় বুড়ো ছাগলটিকে নেউলকুমারের কাছ থেকে কিনে নেয়।

পরবর্তী ঘটনা সহজেই অনুমেয়। নেউলের ভাইদের হাজার পেটাপেটি সত্ত্বেও ছাগল আর একটি মাত্র মোহর দিয়েছিল। রাগের চোটে তারা মারতে মারতে ছাগলটাকে মেরেই ফেলল। নেউলকুমারের চালাকি ধরতে পেরে তারা তার ঘর জ্বালিয়ে দিল। তারপর? ঐ ছয় মাতুলের পাতালযাত্রার কাহিনিতে যা-যা ঘটেছে, তাই-তাই ঘটতে লাগল।

দু'টি কাহিনিই লম্বা কাহিনি। গল্প দু'টির প্রথমাংশের টাইপ—৭০৮ : বিস্ময় বালক। দ্বিতীয় অংশের টাইপ যথারীতি—১৫৩৯ : চাতুর্য ও প্রতারণা।

নানা রঙের রঙ্গকথা

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা। বলিহারি যাই, বাঙালি রসিকের চিন্তা-মুন্সিয়ানায়। ভয়াবহ ভূতকেও সে অনায়াসে ইহলোকে জাতপাতের অঙ্গনে টেনে আনে।

শুধু ইহলোকেই নয়, পরলোকেও বাঙালি ভূত-সমাজে দেখি জাতপাতের বালাই ষোলো আনা। ব্রাহ্মণ মরলে ব্রহ্মদৈত্য, মুসলমান মরলে মামদো ভূত। এছাড়া, শাঁখচুন্নি-গেছো-মেছো-হাঁড়ি-বেরু-গোভূত-গৌরাঙ্গ ভূত—আরো কত কি!

ইহজীবনে ব্রাহ্মণ যেমন বর্ণশ্রেষ্ঠ, তেমনি প্রেতজীবনেও ব্রহ্মদৈত্যই হল ভূতশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মদৈত্যের চাল-চলন রীতিমত ভারিক্কিগোছের! অন্যান্য ভূতের মত আনুনাসিক কণ্ঠে তিনি কথা বলেন না। তৎসম-বহুল শুদ্ধ শব্দই ব্যবহার করেন তিনি। সাধারণভাবে বেলগাছেই তাঁর বাস, নিদেন পক্ষে তেঁতুল গাছে। দয়া-মায়া-মমতা ইত্যাকার মনুষ্যোচিত সুকুমার বৃত্তিগুলি প্রেতজীবনেও তাঁর মধ্যে বিরাজ করে। শাস্ত্রীয় সংগীত শ্রবণে তিনি মোটেই নিরুৎসাহী নন, তা বলে বেসুরো গলার গানে তার কানের অনুমোদন নেই একেবারেই। কারো কাছে কোন উপকার পেলে তিনি তা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, বরং প্রত্যুপকারে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। বণিক পুত্র গজাননের গাওয়া সেই রাসভ-সংগীতের কথা মনে পড়ে? থাক সে কথা। এখন যে ব্রহ্মদৈত্যের কথা বলব তিনি-ও যথারীতি বিল্ববৃক্ষবাসী, করুণাময় ও পরোপকারী। কিন্তু তাঁর চরিত্রের সে-সব গুণে নয়, এখানে রঙ্গসৃষ্টি হয়েছে বরং আদিরসের সুষম ব্যবহারে। ভূমিকা ছেড়ে কাহিনিতে আসা যাক :

এক যে ছিলেন রাজা। তাঁর রানির কোন ছেলে হয় না, হয় শুধুই মেয়ে। তাঁর এত সম্পদ এত ঐশ্বর্য! অপুত্রক অবস্থায় তিনি গত হলে, এ-সব তো সাত ভূতে লুটেপুটে নেবে। এদিকে, রানি আবারো গর্ভবতী হয়েছেন। রাজা সাফ কথা শুনিয়ে দিয়েছেন রানিকে, 'এবারো তোমার পেটে মেয়ে এলে, তোমাকে আর তোমার মেয়েকে কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেব।'

কিন্তু হায়, এবারো রানির যথারীতি একটি মেয়েই হল। কিন্তু এ-কথা রাজার কানে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। বাঁচার তাগিদে দাইয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রানি বাইরে মিথ্যে রটিয়ে দিলেন যে তাঁর একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। মেয়েটিকে ছেলের পোশাক পরিয়ে সর্বদা তিনি আগলে রাখলেন। রানির পুত্র সন্তান প্রসবের সংবাদে রাজপ্রাসাদে আনন্দের হুল্লোড় বয়ে গেল। বাইরে একটা খুশি-খুশি ভাব বজায় রাখলেও, রানি কিন্তু ভেতরে ভেতরে সর্বদাই তটস্থ হয়ে রইলেন। মেয়েটিকে কোনভাবে যেন রাজা কাছ থেকে দেখতে না পারেন, নানা অছিলায় রানি সেই কাজই করে গেলেন।

রাজা তো ইতিমধ্যে গণৎকার ডেকে জন্মলগ্ন জানিয়ে পুত্রের কুষ্ঠি-বিচার করালেন। রানি তার আগেই টাকা দিয়ে গণৎকারকে কব্জা করে ফেলেছেন। গণৎকার গণনা করে বললেন, 'আপনার পুত্রের সব কিছুই শুভসূচক, তবে একটা কথা'—

গণৎকারের ইতস্ততভাব দেখে রাজা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বলুন খুলে বলুন কি ব্যাপার?'

গণৎকার তখন জানালেন, 'ছেলের আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার আগে আপনি যদি তার মুখদর্শন করেন তবে তার মৃত্যু হবে।' রাজা গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা কাউকে আর বললেন না। পুত্রের মঙ্গলের জন্য নিজের সন্তান দেখার কৌতূহল দমন করলেন।

দেখতে দেখতে মেয়েটি বড় হয়ে উঠল। বোধ-বুদ্ধি হলে মেয়েকে তার মা-ই সকল বৃত্তান্ত বলে সাবধান করে দিলেন, যেন সে ভুলেও বাইরে না যায়, — কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে।

মেয়েটির যখন বছর সতেরো বয়েস তখন রাজার সাধ হল পাশের রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিয়ে দেন। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই পুত্রবধূর মুখ দেখে যেতে চান। এতে তো নিশ্চয় গণৎকারের আপত্তি থাকতে পারে না?

আর কারো নয়, রাজার সাধ বলে কথা। সুতরাং তা পূর্ণ হতেও সময় লাগল না। পাশের রাজ্যের রাজা সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজি হলেন। চলল বিয়ের তোড়জোড়।

রানিকে ডেকে রাজা বললেন, 'ঐ সময় আমাকে রাজকাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হবে, তুমিই ছেলেকে নিয়ে যাবে — আমার প্রতিনিধিত্ব করবে।'

রাজার না-যাওয়ার আসল কারণ রানির বুঝতে অসুবিধা হল না, গণৎকারের সেই ভবিষ্যদ্বাণী 'আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার আগে রাজা যদি পুত্রের মুখ দেখে ফেলেন, তবে পুত্রটি মারা যাবে'—সেই নিষেধবাণী-ই রাজার যাওয়ার অন্তরায়। রানির পক্ষে এটা ভালোই হল। কিন্তু মেয়েকে ছেলে করার ছল যে এবার ধরা পড়ে যায়। রানি অনেক ভেবেও কোন সমাধান খুঁজে পান না।

সত্যিই এসে গেল সেই আজগুবি বিয়ের দিন। রানি চিন্তায় পাগলপারা হলেও, বাইরে প্রকাশ করলেন না। রাজা মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করে ছেলেকে মায়ের সঙ্গে পাঠালেন পাশের রাজ্যে। পথে যেতে যেতে, পাল্কিতে বসে মা-মেয়ে ভাবতে থাকে কি করে এ-সমস্যার সমাধান করা যায়। এভাবে তো মুখ হাসাতে ভিন রাজার বাড়ি যাওয়া যায় না। পাল্কির ভেতর থেকে সহসা রানি বেহারাদের হুকুম দেন পাল্কি থামাতে।

ঝোপঝাড়ের কাছেই পাল্কি থেমেছিল। সাধারণত প্রাকৃতিক কাজ করবার প্রয়োজনেই এভাবে পাল্কি থামানো হয়। বেহারারা তাই পাল্কি নামিয়ে কিছু দূরে বিশ্রাম করতে লাগল। শোভাযাত্রা পাশের রাজ্যের রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল।

রানি ও রাজকন্যা একটা বেলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে তখন খুব কান্নাকাটি করছেন। তাঁদের কান্না শুনে বেলগাছ থেকে নেমে এলেন এক ব্রহ্মদৈত্য। ব্রহ্মদৈত্যকে চিনতে

পেরে রানি তাঁকে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মদৈত্য শুধালেন, 'তোমরা কাঁদছ কেন মা, তোমাদের কি কোন বিপদ ঘটেছে?'

রানি তখন তাঁর সন্তান হওয়া থেকে রাজার নির্মম আদেশ, গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী, পাশের রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে ইত্যাদি সবকিছু বলে স্বামীকে সত্য গোপন করার পাপও স্বীকার করলেন ব্রহ্মদৈত্যের কাছে।

ব্রহ্মদৈত্য রানির এই অকপট স্বীকৃতিতে বোধ হয় সন্তুষ্টই হলেন। বললেন, 'তুমি পাপ করনি, আত্মরক্ষার জন্য ছলনার আশ্রয় নেওয়ায় শাস্ত্রের অনুমোদন আছে।'

ব্রহ্মদৈত্যের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে রানি তখন তাঁকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন, 'ঠাকুর, আমাদের সমস্যার কি সমাধান হবে না?'

ব্রহ্মদৈত্য খানিক ভেবে বললেন। 'তোমার সমস্যার আমি একটা আপাত—সমাধান করে দিচ্ছি — স্থায়ী সমাধান পরে ভেবে দেখব।'

রানি যেন এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলেন। আকুল আগ্রহে ব্রহ্মদৈত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠাকুর এ-সমস্যার সমাধান কি ভাবে করবেন?'

ব্রহ্মদৈত্য রানির প্রশ্নের জবাব দিতে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। তিনি শুধু বললেন, 'তা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি এখন মেয়েটিকে আমার কাছে রেখে, কিছুটা দূরে গিয়ে অপেক্ষা কর।'

এরপর ব্রহ্মদৈত্য মেয়েটিকে গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়ে মায়াবলে তাকে ছেলে এবং নিজেকে মেয়েতে পরিবর্তন করলেন। মেয়েটির সাজপোশাক আগে থেকেই পুরুষের মত ছিল, এখন সে সত্যিকার পুরুষমানুষ হয়েই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

রানির চোখে খুশির ঝলক। মেয়েটিরও। ব্রহ্মদৈত্য ওঁদের যাবার আগে শুধু এ-কথাটাই বললেন, 'প্রয়োজন মিটলেই কিন্তু আবার এসে মেয়ে হয়ে যেও।'

মা ও মেয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে পাল্কিতে উঠে বসে। মাথা থেকে তাদের দুশ্চিন্তার পাহাড় নেমে গেছে। এখন রাজাকে ডেকে এনে সন্তানের মুখ দেখাতেও রানির কোন আপত্তি নেই। গণৎকারের মানার কারণ আর কেউ না জানুন, তিনি তো জানেন।

যথাসময়ে রাজবাড়িতে পৌঁছে, শুভলগ্নে রাজকন্যার সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে হয়ে গেল। পরদিন বিকেলে বৌ নিয়ে রানির ফেরার কথা। কিন্তু সেই গণৎকারের গণনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি প্রস্তাব রাখলেন, 'বৌ-জামাইকে আরও ছ'মাস এখানেই থাকতে হবে। ছ'মাস না পূর্ণ হলে বাবা ছেলের মুখ দেখতে পারবেন না। তাঁর ইচ্ছে, একই সঙ্গে তিনি পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখেন।'

কন্যাপক্ষ রানির প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন, 'এ তো উত্তম প্রস্তাব। আরও ছ'মাস মেয়ে-জামাইকে কাছে পাওয়া যাবে।'

কন্যাপক্ষের সম্মতি পেয়ে এবার রানি স্বামীকে চিঠি লিখে এক জ্যোতিষীর নিষেধের কথা বললেন। জ্যোতিষীর কথানুসারে আরও ছ'মাস বধূকে বাপের বাড়ি থাকতে হবে।

রাজা ভেবে দেখলেন তাঁর গণৎকারও কুষ্ঠি-বিচার করে এই সময়সীমাই বেঁধে দিয়েছিলেন। ছ'মাস পেরোলেই রাজপুত্রের বয়স আঠারো পূর্ণ হবে। উত্তর দিলেন, 'তুমি আগামী ছ'মাস ওদের কাছে থেকে ওদের তত্ত্বাবধান করবে।'

আসলে রানি ছলাকলা করে আরও ছ-মাস হাতে রাখলেন শুধু ব্রহ্মদৈত্যকে এড়িয়ে চলার জন্য। মাস-কয়েকের মধ্যেই ব্রহ্মদৈত্য নিশ্চয় নিরাশ হয়ে বাসা বদল করবেন। আমাদের যে-সমস্যা ছিল তা মিটে গেছে। কাজেই ওঁর সঙ্গে মোলাকাৎ না হওয়াই ভালো। তাছাড়া, ওঁর কথামত ফের রাজকুমার মেয়ে হলে তো সেই একই সমস্যা দেখা দেবে?

ছ'মাস কেটে গেলে বর-বধূকে পাল্কিতে নিয়ে রানি ফিরছেন। ফেরার পথে সেই বেলগাছ! ডালে যথারীতি বসে আছেন ব্রহ্মদৈত্য—থুড়ি, দৈত্যানী!

রানি ওঁকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। পাল্কি থামিয়ে নিজেই এগিয়ে গিয়ে ওঁকে নমস্কার করলেন। ব্রহ্মদৈত্যের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা। উনি মুখ ঘুরিয়ে এক মনে কি যেন ভাবছেন। রানি ভাবলেন ঠাকুর বোধ হয় সময়মত না ফেরার জন্য রেগে গেছেন। তিনি কল্পিত নানা বিপদের কাহিনি শুনিয়ে বললেন, 'এখন যদি ইচ্ছে হয় তবে বলুন আমার মেয়েকে ডাকাই।'

রানির কথা শুনে গম্ভীর গলায় ব্রহ্মদৈত্য বললেন, 'বড়ই বিলম্ব হয়ে গেছে, আর তা হয় না।'

রানি ভাবলেন এ-বুঝি ঠাকুরের অভিমানের কথা। তিনি ঠাকুরের অভিমান ভাঙানোর জন্য নানা অনুনয়-বিনয় করলেন। তখন ব্রহ্মদৈত্য রানিকে বললেন প্রস্তাব-প্রত্যাখানের আসল রহস্যটি। হয়েছে কি, সতেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করার পর ব্রহ্মদৈত্য তো রাতারাতি সুন্দরী যুবতীতে পরিণত হলেন। ফুল ফুটলেই ভ্রমর আসে। অনেক ভূতই এসে তখন তাঁকে প্রেম নিবেদন করলেন। রানির ফেরার কথা চিন্তা করে প্রথম দিকে তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। কিন্তু মাস পেরিয়ে গেলেও যখন মা-মেয়ের ফেরার নামটি নেই, তখন একদিন তিনি কোন ব্রহ্মদৈত্যের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। এখন ফের পুরুষ হবেন কি করে?

ব্রহ্মদৈত্যের এই কথায় রানি মনে মনে খুব খুশি হলেন, কিন্তু মুখে দুঃখের ভাব করে সহানুভূতি জানিয়ে দ্রুত বেলতলা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। কাহিনির মধ্যে রানি রাজাকে সত্যি ঘটনা লুকিয়ে রেখে প্রতারিত করেছেন (টাইপ—৫০৫) এমন একটা ভাব আছে বটে, কিন্তু অভিনিবিষ্ট পাঠে বোঝা যায় কাহিনির প্রাণশক্তি ধারণ করে আছে রানির দুঃখে করুণাপরবশ ব্রহ্মদৈত্যের রাজকুমারীকে ছেলেতে রূপান্তরকরণ

এবং কার্যসিদ্ধির পর নানা অছিলায় চতুরা রানির ব্রহ্মদৈত্যের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা। এ-কাহিনির আসল টাইপ—৩২৯ : দৈত্যের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা।

এ-কাহিনির ব্রহ্মদৈত্য-চরিত্রে যে পরোপকারী অভিপ্রায় আছে তা নির্দিষ্ট করতে গিয়ে দেখি টমসন-কৃত মোটিফ-ইনডেক্স যেন যথেষ্ট নয়। ইনডেক্সের এইচ—৯৮৪.১ সংখ্যক মোটিফের ব্যাখ্যানে বলা হচ্ছে—ব্রহ্মদৈত্যের মাধ্যমে কাজ সমাধা করা এবং ই—৫৯৬.১ সংখ্যক মোটিফে বলা হচ্ছে — ভূত মানুষের হয়ে কাজ করে, দু'টি মোটিফেরই অন্তরালে কারো নির্দেশের সুর যেন বাজে।

এ-কাহিনির ব্রহ্মদৈত্যও মানুষের হয়ে কাজ করেছেন বটে, কিন্তু কারো চাপিয়ে দেওয়া নির্দেশে নয় — বিবেকের তাড়নায়। রানির আকুল আবেদনে সাড়া দিয়েই ব্রহ্মদৈত্য মায়াবলে রূপ-পরিবর্তন করেছিলেন। পাশ্চাত্যদেশের লোককথা-ভাণ্ডারে পরোপকারী ব্রহ্মদৈত্যের মত কোন ভূতের নজির নেই বলেই কি টমসনের ইনডেক্সে এই ফাঁক (শেক্সপিয়রের নাটকে হ্যামলেটের বাবা ভূত হয়েও উপকারী, কিন্তু পুরোপুরি পরোপকারী কি তাঁকে বলা যায়? আসলে ওদেশের লোকবিশ্বাসে ভূত হল অনিষ্ট শক্তি। শেক্সপিয়রের ভূত-কল্পনাও সেই লোকবিশ্বাসের ওপর ভর করেই বেড়ে উঠেছে। কিন্তু এদেশের লোকবিশ্বাসে ভূত কেবল অনিষ্টশক্তিই নয়, শুভশক্তিও। এদেশের ধর্মবিশ্বাসেও অতএব লোকবিশ্বাস অনুসারে মৃতের আত্মা মৃত্যুর পরে প্রেতলোকে অবস্থান করে। মৃতের আত্মীয়-স্বজন দ্বারা শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া চুকে যাবার পর, সেই আত্মা পিতৃলোক গমন করে। আত্মার তখন স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এদেশের লোকবিশ্বাসে ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। এদেশের মানুষের বিশ্বাস, মুক্তিকাঙ্ক্ষী মৃতজনের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম যদি যথাযথ হয় এবং তার যদি পরোপকারজনিত পুণ্য থাকে, তবে সে অবশ্যই প্রেতলোক থেকে পিতৃলোকে যাবার ছাড়পত্র পায়। মৃত পরোপকারী ব্রাহ্মণেরাই কেবল ব্রহ্মদৈত্য হবার যোগ্যতা অর্জন করে, সকলে নয়।) থেকে গেল? হয়তো তাই।

রানিকে জটিল সমস্যা থেকে না হয় উদ্ধার করেছিলেন প্রেত ব্রহ্মদৈত্য তাঁর কুহকশক্তিতে, কিন্তু ইহজগতের এক অতি-বাস্তব সমস্যা থেকে মন্ত্রীমশাইকে উদ্ধার করবে কে? এর উত্তর জানতে হলে আমাদের বোবা-কালা এক রাখালের সেই সাঁওতালি কাহিনির শরণ নিতে হবে :

এক দেশে এক রাজা ছিল। একদিন তার ধারণা হল যে তামাম দুনিয়ায় সে-ই সকলের চেয়ে বড়। কিন্তু এই ধারণার কথা নিজের মুখে সে বলে কি করে? সভা ডাকা হল তাবড় তাবড় পণ্ডিতদের নিয়ে। রাজা তাদের বোঝাল, 'আমার মনে এক নতুন উপলব্ধির জন্ম হয়েছে সম্প্রতি—তোমরা কেউ কি তার হদিস দিতে পার?'

প্রশ্ন শুনে পণ্ডিতেরা মাথা চুলকোল, চুল ছিঁড়ল—কিন্তু উত্তর দিতে পারল না।

বিরক্ত রাজা মন্ত্রীমশাইকে বলল, 'এখানে বসে বসে সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়। তিনদিনের মধ্যে আমার সেই লোককে চাই, যে আমার মনের গোপন খবর বলতে পারবে। নইলে তোমার গর্দান যাবে।'

বেচারা মন্ত্রীমশাই কাচুমাচু হয়ে বাড়ি ফিরে এল। মুখ তার গম্ভীর, মেজাজ খাট্টা। তিনদিনের একদিন যায়-যায়। আর দু'দিনের মধ্যে সে তেমন লোক কোথায় পাবে, যেখানে বড় বড় পণ্ডিতেরা ব্যর্থ?

বাবাকে বিমনা দেখে ছোট মেয়েটি শুধায়, 'বাবা তুমি এমন মন-মরা হয়ে কি ভাবছ বল তো?'

মন্ত্রী তার মেয়েকে তার ভাবনার কথা বলে। সব শুনে ছোট মেয়ে বলে, 'ও এই ব্যাপার? এর জন্য অত ভাবনার কি আছে? তেমন লোক আমার সন্ধানে আছে যে রাজার মনের খবর বলে দেবে। এখন তুমি হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসবে চল তো।'

মন্ত্রী ভাবে মেয়ে বুঝি তাকে খাওয়ানোর জন্য মিথ্যে স্তোক দিচ্ছে। তবু সে মেয়ের কথায় হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে। দু'দিন বাদে যা হবার তা তো হবেই, তার জন্য এখন থেকে না খাওয়ার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া তার ছোট মেয়েটির বুদ্ধির ওপর মন্ত্রী মশাইয়ের যথেষ্ট আস্থা আছে। বলা যায় না, সত্যিই হয়তো মেয়েটাব সন্ধানে তেমন কেউ আছে যে রাজাব মনের খবর বাতলাতে পারবে।

পরের দিনও কেটে গেল। আজই হল সেই সাংঘাতিক দিন। আজকের মধ্যেই রাজার মনের খবর জানা সেই লোকটিকে দরকার।

মন্ত্রীমশাই ব্যাকুল কণ্ঠে মেয়েকে শুধায়, 'কই তোর সেই লোক?'

ছোট মেয়ে নিরুত্তাপ গলায় জানায়, 'লোক তৈরিই আছে বাবা, তুমি খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে নাও।'

মন্ত্রী খেতে খেতে ভাবে, আজই বুঝি শেষ-খাওয়া। মেয়ে কাকে জোগাড় করেছে, কে জানে।

ওদিকে, ছোট মেয়ে ততক্ষণে ডেকে এনেছে তাদেব বোবা-কালা মাঠের রাখালটাকে। সম্পত্তি বলতে তার তিনটি ভেড়া, তাই নিয়েই সে সুখে থাকে। মনের আনন্দে মন্ত্রীমশাইয়ের গরু-বাছুর মাঠে চরায়। তা, সেই বোবা-কালা রাখালটাকে বাবার কাছে হাজির করে দিয়ে ছোট মেয়ে তাকে ইঙ্গিতে বলে, 'তোমাকে আজ বাবার সঙ্গে রাজার কাছে যেতে হবে। রাজামশাই যা-যা জিজ্ঞেস করবে, উত্তর দেবে।'

বোবা-কালা রাখালটা কি বোঝে কে জানে, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

রাখালকে দেখে ঐ ঘোর বিপদের মধ্যেও মন্ত্রীমশাই হাসি সামলাতে পারে না! মেয়েকে বলে, 'ও-যে বোবা-কালা, ও কি করে রাজার কথার জবাব দেবে?'

মেয়ের সাফ জবাব, 'ও না পারলে, আর কেউই পারবে না। তুমি ওকে একবার নিয়ে গিয়েই দ্যাখ না?'

অগত্যা সেই বোবা-কালাকে নিয়েই মন্ত্রী রাজ-দরবারে হাজির। লোকে লোকারণ্য। সবাই উৎসুক সেই লোককে দেখতে যে রাজার মনের খবর বলতে পারবে। রাজা

বসে আছে সিংহাসনে। মন্ত্রী বসে আছে তার নির্দিষ্ট আসনে। রাজামশাই মন্ত্রীকে শুধায়, 'মন্ত্রীমশাই পেয়েছ সেই লোক?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।'

—'হাজির কর তাকে দরবারে।'

'হাজির তো আছে হুজুর, এই তো সেই লোক'—বলে মন্ত্রী বোবা-কালা রাখালকে রাজার কাছে দাঁড় করিয়ে দেয়। রাজা রাখালের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে, রাখালও ড্যাবডেবিয়ে দেখতে থাকে রাজাকে।

রাজা হঠাৎ-ই দেখায় তার একটি আঙুল। রাখাল সঙ্গে-সঙ্গে দেখায় রাজাকে দু'টি আঙুল। রাজার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাজা এবার রাখালকে তিনটি আঙুল দেখায়। তিনটি আঙুল দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাখাল সজোরে তার মাথা ঝাঁকিয়ে অসম্মতি জানায় এবং সত্বর দরবার ছেড়ে চলে যায়। ব্যাপার-স্যাপার দেখে মন্ত্রী কূল-কিনারা পায় না। রাজামশাই কিন্তু ভারি খুশি। ওদিকে, যারা দেখতে এসেছিল তারা অবাক চোখে এ-ওর দিকে তাকায়।

রাজা পেয়াদা ডেকে হুকুম করে, 'যাও, লোকটিকে এখুনি ফিরিয়ে নিয়ে এসো।'

দুই পেয়াদা ছোটে রাখালের কাছে। রাখাল কিন্তু পেয়াদাদের ফিরিয়ে দেয়। রাজা শুনে বলে, 'বেশ ওকে এখন বিরক্ত করনা, একা থাকতে দাও।'

এবার মন্ত্রীর দিকে চেয়ে রাজা বলে, 'মন্ত্রী, তুমি ঠিক লোকই এনেছ। আমি যা ভাবছিলাম, ও লোকটা আমাকে তা বলে গেছে।'

মন্ত্রীর তবু ধন্দ কাটে না। সে রাজাকে বলে, 'অপরাধ নেবেন না হুজুর, একটা কথা জিজ্ঞেস্ করব?'

—'কর।'

—'হুজুর, আপনারা দু'জনে যা বুঝতে পারলেন, আমরা কিন্তু তার কিছু বুঝিনি। কথাটা যে কি হল, তা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন?'

রাজা তখন মন্ত্রীকে বুঝিয়ে বলেন, 'আমি একটা আঙুল দেখিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি কি একাই জগতের সবচেয়ে বড় রাজা, না আরও কেউ আছে? উত্তরে ও দু'টো আঙুল দেখিয়ে বলল, না আপনারা দু'জন আছেন — আপনি আর ঈশ্বর। সে-কথা শুনে আমি ওর কাছে জানতে চাইলাম, তিনজন রাজা কি নেই? ও প্রবল জোরে মাথা নেড়ে অসম্মাতি জানিয়ে চলে গেল।'

রাখালেব ইঙ্গিতের রাজা-কৃত সেই ব্যাখ্যা মন্ত্রীর মনঃপূত হল, অন্যরাও মেনে নিল।

রাজার কাছ থেকে প্রচুর পারিতোষিক নিয়ে মন্ত্রী সন্ধেবেলায় বাড়িতে ফিরল। ফিরেই সে রাখালকে ডেকে জানতে চাইল রাজার কাছে তার সাংকেতিক উত্তরের বিশদ বিবরণ। রাখাল ইঙ্গিতে বোঝাল, 'রাজা আমার কাছে একটা ভেড়া চেয়েছিল।

আমি বললুম তুমি রাজা বটে, তাই একটা কেন দু'টো ভেড়াই নাও। কিন্তু রাজা তখন তিনটে ভেড়াই চেয়ে বসল। তিনটে দিলে আমার থাকবে কি, তাই ঘাড় নেড়ে, অসম্মতি জানিয়ে, আমি দরবার ছেড়ে চলে এলাম।'

রাখালের ব্যাখ্যা শুনে মন্ত্রীমশাই থ' হয়ে গেল। সে ভাবে, যে-যার ভাব বুঝেছে, কিন্তু প্রাণ বেঁচেছে আমার। আর এটা সম্ভব হয়েছে আমার ছোট মেয়ের বুদ্ধিতে। এ-কাহিনির টাইপ—১৭০৪ : ইঙ্গিতের অর্থ।

এই আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিতে কথা বলা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় বোকা কালিদাসের সঙ্গে বিদূষী রাজকন্যার সেই বিয়ের কাহিনিটি :

রাজকন্যা কেবল বিদূষীই নয়, বুদ্ধিমতীও। তাকে যে বিয়ে করবে অতএব তাকেও বেশ পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমতী হতে হবে। আর সেই পাত্রের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করবে স্বয়ং রাজকন্যাই।

অনেক রাজপুত্র আসে, পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। অনেক পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করে। অপমানিত রাজপুত্র আর পণ্ডিতেরা তখন রাজকন্যাকে জব্দ করার জন্য মতলব আঁটে। কালিদাস যে কত বোকা, তার পরিচয় পাওয়া গেছে, কিছুক্ষণ আগেই — সে যে গাছে বসেছিল কুড়ুল দিয়ে সেই গাছের ডালই কাটছিল। বোকা কালিদাসকে শেখানো হল রাজসভায় যে-যাই বলুক, সে যেন কোন কথা না বলে। কথা বললে, রাজকন্যার সঙ্গে আর তার বিয়ে হবে না।

কালিদাস রাজসভায় যথাসময় সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজকন্যার মুখোমুখি হল। রাজকন্যাকে বোঝানো হল কালিদাস মস্ত পণ্ডিত — ইঙ্গিতেই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, কথা বলার কোন প্রয়োজনই হয় না।

রাজকন্যা মনে মনে কৌতুক অনুভব করে। সে মাটিতে আঙুল রেখে জানতে চায়, 'পৃথিবী কি স্থির?'

বোকা কালিদাস কিছু না বুঝেই তার হাতের আঙুলগুলো মাথার চারপাশে বন বন ঘোরাতে থাকে। রাজকন্যা ভাবে, কালিদাস জানাতে চাইছে পৃথিবী স্থির নয়, অবিরত ঘুরছে।

কালিদাস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হল। রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হল। তারপর যে কী হল, সে তো আর এক কাহিনি। এ-কাহিনির টাইপ ৫১৬এ : বিদূষী রাজকন্যা দ্বারা পাণিপ্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ।

বিদূষী রাজকন্যার পতি-নির্বাচনের কথা শোনানোর পর, এবার শোনাই এক পণ্ডিতম্মন্য চাষার কথা :

অল্প কিছু লেখাপড়া শিখেই এক চাষার পো নিজেকে খুব দিগ্‌গজ পণ্ডিত ঠাওড়াতে লাগল। চাষার পো শুনেছিল পড়াশোনায় দিগ্‌গজ হলে পণ্ডিতেরা তর্কযুদ্ধে অন্য পণ্ডিতদের হারিয়ে 'পণ্ডিত সার্বভৌম' ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেন। তাই সে-ও ভাবল তর্কযুদ্ধে পণ্ডিতদের হারাতে সে বাইরে বেরিয়ে পড়বে।

যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। চাষার পো তর্কযুদ্ধে নামার জন্য বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু মুশকিল এই যে সে এখন যাবে কাদের কাছে? সত্যিকার বড় পণ্ডিতদের কাছে গেলে যদি তাঁরা তাকে তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দেন? চাষার পো স্থির করে যে বাথানে গয়লারা গরু চরাতে যায় — ওদের সঙ্গেই বরং তর্কযুদ্ধ শুরু করা যাক।

বিদ্যের জাহাজ চাষার পো চলেছে গয়লাদের তর্কযুদ্ধে হারাতে। পথে পড়ল খোড়ো নদী। নদীর ওপারে বিল-জমিতে গয়লাদের বাথান। সেখানে বহু গয়লা গরু চরাচ্ছে। চাষার পো সেখানে গেল। গয়লাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হল। তর্ক-সভাও বসল। স্থির হল চাষার পো যা বলবে তার মানে বলে দিতে হবে গয়লাদের। গয়লারা মানে বলতে না পারলে চাষার পো-কে পেট ভরে দুধ খাওয়াবে। আর বলতে পারলে, চাষার পো-র মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চাপিয়ে গাঁ-পরিক্রমা করাবে।

গয়লারাই প্রথম শুধাল, 'তা চাষার পো, তোমার বলার কথাটা কি বাপু?'

—'গব্য গড়াং' কথাটার অর্থ কি?

উপস্থিত গয়লারা অর্থোদ্ধার করতে পারল না বটে, তবে তারা চাষার পো-কে এই বলে আশ্বস্ত করল যে তাদের মোড়ল দুধ বেচতে কাটোয়া গেছে, ফিরে এলেই অর্থ বলে দেবে।

গয়লাদের মোড়ল ফিরে এলে তাকে চাষার পো-র বৃত্তান্ত জানানো হল। মোড়ল তখুনি চাষার পো-কে ডেকে অবজ্ঞার ছলে বলল, 'তুই কোন কথার মানে জানতে চাস?'

চাষার পো ফের বলল, 'গব্য গড়াং' কথার অর্থ কি?

মোড়ল চাষার পো-র কথা শুনে হো-হো হেসে বলে উঠল, 'দূর বেটা, গোটা কথাটা তুই জানিস না, জানিস শুধু এই ছত্রটা।'

চাষার পো সকৌতুকে শুধাল, 'গোটা কথাটা তবে কি?'

মোড়ল তখন সহাস্যে গড়গড়িয়ে বলতে শুরু করল :

'প্রথমে গোবর মাটি ছড়াং
তারপর পত্র পড়াং
তারপর জল ছড়ছড়াং
তারপর চিঁড়েব্য চড়াং
তারপর গব্য গড়াং।

অর্থাৎ কিনা, প্রথমে গোবর মাটি দিয়ে জায়গাটা নিকোতে হবে তারপর পাতা পড়বে। পাতার ওপর জল ছিটোতে হবে। তারপর চিঁড়ে, তারও পর গব্য অর্থাৎ দুধ বা দই দিতে হবে। সুতরাং গোটা ব্যাপারটাই ফলার খাওয়ার ব্যাপার—বুঝলি?'

প্রথম তর্কযুদ্ধেই চাষার পো-র করুণ অভিজ্ঞতা হল। মোড়লের মধ্যস্থতায় তাকে

অবশ্য শেষ পর্যন্ত ন্যাড়া হতে হয়নি, গাধার পিঠেও চড়তে হয়নি, কিন্তু গয়লাদের কাছে গো-হারান হারতে হয়েছে।

'অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী' বলে একটা কথা আছে না? চাষার পো-র অবস্থা হয়েছিল তা-ই। সে নিজেও জানত 'গব্য গড়াং' কথাটার কোন অর্থ হয় না, তবু ঐ নিরর্থক শব্দটির অর্থ জানতে চেয়ে সে গয়লাদের বোকা বানাতে চেয়েছিল, কিন্তু ওস্তাদেরও ওস্তাদ থাকে, তা বোধ হয় সে জানত না। মোড়ল হল সেই ওস্তাদের ওস্তাদ। তাৎক্ষণিকভাবে কতগুলো নিরর্থক শব্দ সাজিয়ে এবং তার জুৎসই ব্যাখ্যা করে সে চাষার পো-কে বোকা বানিয়ে ছাড়ে।

এ-কাহিনির টাইপও—১৯২০ : মিথ্যে কথা বলার প্রতিযোগিতা।

বেশ কিছু অর্জিত বিদ্যার কথা শোনার পর এবার আমরা মানুষের স্বভাব-রহস্যে প্রবেশ করব। প্রথমেই শোনাই চারজন কুঁড়ের কথা :

আজব রাজার তাজ্জব খেয়াল। রাজ্যের কুঁড়েদের সমাদরে পুষছেন তিনি এক প্রাসাদে। কুঁড়েরা সেখানে খায়দায় আর ঘুমোয়, কাজকম্মের কোন বালাই নেই তাদের।

দিনকে দিন কুঁড়েদের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজার টনক নড়ল। সন্দেহ হল তাঁর সত্যিকার কুঁড়ে নয় এমন অনেকেই হয়তো কুঁড়েদের খাতায় নাম লিখিয়ে প্রাসাদে ঠাঁই নিয়েছে। রাজা এখন তাই সত্যিকার কুঁড়ে যাচাইয়ের ব্যবস্থা করলেন। মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি একদিন কুঁড়েদের প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিলেন।

প্রাসাদে আগুন জ্বলছে দেখে নকল কুঁড়েরা সকলের আগে পালিয়ে বাঁচল। কুঁড়ে বটে, কিন্তু তেমন উঁচু জাতের কুঁড়ে নয় যারা — তারাও একে একে বেগতিক বুঝে সটকে পড়ল। কিন্তু আগুন জ্বলছে দেখেও, শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল মাত্র চারজন। দাউ দাউ আগুন জ্বলছে, তবু তারা নট নড়ন-চড়ন। খুব নিশ্চিন্তেই ঘুমোচ্ছে তারা। ওদের মধ্যে একজন সেই লেলিহান অগ্নিশিখার তাপে অল্প চোখ খুলে, পাশের জনকে বলে, 'দেখ ভাই, কত সূর্য উঠেছে আকাশে।'

যাকে বলা হচ্ছে সেই দ্বিতীয়জন তা শুনে বলে, 'চোখ খোলার ঝক্কি পোয়াতে পারব না ভাই।'

ততক্ষণে আগুন আরও এগিয়ে এসেছে। তৃতীয় জন শুয়ে শুয়েই বলে, 'পি-পু'— অর্থাৎ পিঠ পুড়ছে। অত বড় কথা বলার শ্রম স্বীকার করতে সে রাজি নয়, তাই এই সংক্ষেপীকরণ।

চতুর্থজন আর এক কাঠি সরেস। তৃতীয় জনের সংক্ষিপ্ত বচনের অনুকরণে সে-ও বলে, 'ফি-শু' অর্থাৎ ফিরে শুয়ে পড়।

রাজার আগে থেকেই নজর পড়েছিল এই চারজনের ওপর। এখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে এই চারজনই হল সত্যিকার কুঁড়ে। রাজার হুকুমে তক্ষুনি আগুন নিভিয়ে ফেলা হল। ঐ চারজন কুঁড়েকে রেখে অন্যদের প্রাসাদ থেকে খেদানো হল।

এ-কাহিনির টাইপ—১৯৫০এ : চারজন জবর কুঁড়ে।

চার জবর কুঁড়েকে রাজা আদর করে ঠাঁই দিয়ে ছিলেন, সে-কাহিনি শুনলেন। কিন্তু সকল কুঁড়ের ভাগ্যে তো এমন সমাদর জোটে না। সমাদর তো দূর কথা, এক কুঁড়ে বৌয়ের বাড়ির লোকেদের এবং গাঁয়ের লোকেদের হাতে কী নির্যাতনই না ঘটেছিল, এবার সে-কাহিনিই শোনাই সাঁওতালি লোককথা থেকে :

কোন এক গাঁয়ের বধূ। বড্ড কুঁড়ে। কাজ দেখলেই ভিমরি খায়। ব্যামোর ওজর তুলে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। কাঁদে, গোঙায়।

আষাঢ়-শ্রাবণে ধান রোয়ার সময় বাড়ির সকলেই যায় মাঠে, কুঁড়ে বৌ শুধু যায় না। সে অসুখের ছুতোয় ঘরে বসে থাকে। সকলে বেরিয়ে গেলে, বোকা-ঠকানো হাসি হাসে। রান্নাঘরের এখানে ওখানে হাতড়ে ভাত-ডাল-তরকারি জোগাড় করে খায়।

শ্বশুরমশাই পুরুষ মানুষ। অত প্যাঁচ-ঘোচ বোঝে না। অসুস্থ রোগীকে একা ফেলে কাজে যেতে তার মন কেমন-কেমন করে। তার মনে হয় বৌটার ভালো চিকিৎসা করানো দরকার। সাঁওতাল সমাজে রোগের চিকিৎসা করানো মানেই ওঝাকে ডাকা। সমাজের সেরা দুই ওঝাকে বৌয়ের চিকিৎসার জন্য শ্বশুরমশাই ডেকে আনল। দুই ওঝার একজন বৌয়ের নাড়ি টিপে আর একজনের মুখের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে চাইল। দ্বিতীয় ওঝাও এবার বৌয়ের নাড়ি দেখে প্রথমজনের দিকে মুখ টিপে হাসল। শ্বশুরমশাই উৎকণ্ঠিত, আতংকিত পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও। না জানি বৌমার কি কঠিন ব্যাধি হয়েছে। প্রথম ওঝাই প্রথম মুখ খুলল, 'আমরা বৌয়ের ব্যামো ধরে ফেলেছি। দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আমরা আজই এ-রোগের ওষুধ জোগাড় করে রাখছি, তবে প্রয়োগ হবে আগামীকাল সূর্যোদয়ের ঠিক পরেই — এখানে নয়, গ্রামের তেমাথায়। বৌকে নিয়ে আপনারা সকলে সেখানে অপেক্ষা করবেন—আমরা যথা সময়েই ওখানে পৌঁছে যাব।'

শ্বশুরমশাই ওঝাদের আশ্বস্ত করল এই বলে যে পরের দিন সকালে সব কাজ ফেলে তারা বৌকে সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে গ্রামের তেমাথায় উপস্থিত থাকবে।

ওদিকে ওঝারা বৌকে দেখে সোজা চলে গেল কাছের জঙ্গলে। সেখানে মাটি খুঁড়ে তারা বের করল দুটো পেল্লাই আকারের মেটে আলু, ওদের ভাষায় যার নাম পটলকোন্ডা।

পরদিন সকালে গ্রামের তেমাথায় ওঝারা আসবার আগেই শ্বশুরমশাই আর তার পরিবারের সদস্যরা বৌকে নিয়ে হাজির।

তারা দাওয়াই হিসেবে যেমন পটলকোন্ডা এনেছিল, তেমনি এনেছিল এক কৌটো সিঁদুর। সিঁদুর লেপে প্রথমে তারা বৌয়ের মুখখানি চিত্তির-বিচিত্তির কারে দিল। এরপর একটা বড় দড়ির দুইপাশে শক্ত করে পেল্লাই দুই পটলকোন্ডা বেঁধে বৌয়ের গলায় মালার মত পরিয়ে দিল। বুকের দু'পাশে পেল্লাই পটলকোন্ডা দুটি ঝুলতে থাকল। দ্বিতীয়

ওঝা এবার বৌকে হুকুমের সুরে বিধান দিল. 'বৌমা এই অবস্থায় তোমাকে তিনবার গ্রামের শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে এখানে আসতে হবে। তোমার পাশে পাশে প্রথম ওঝা যাচ্ছে।'

অগত্যা কুঁড়ে বৌকে ঐ-বেশে হাঁটতে হল। যেতে যেতে গ্রামবাসী যারাই দেখে তারাই মুখ টিপে হাসে। কেউ কেউ আবার মুখরোচক মন্তব্য জুড়ে দেয়। সবই কুঁড়ে বৌকে হজম করতে হয়। প্রথমবার গ্রাম পরিক্রমা করেই তার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হল তাতে দ্বিতীয়বার করতে আর সে উৎসাহ বোধ করল না। নিজের ঘরে ফিরে এল — ফিরে এল এক নতুন মানুষ হয়ে। গাঁয়ের মানুষের বিদ্রূপ সহ্য করার চেয়ে কুঁড়েমি ত্যাগ করাই বোধ হয় ভালো—মনে এই বিশ্বাস নিয়ে।

শ্বশুরমশাই এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঘরে ফিরে দেখে সে দিব্যি চাল ঝাড়ছে কুলো দিয়ে। অনেক আগেই গোবর দিয়ে উঠান লেপা হয়ে গেছে।

স্বামী ভাবল বৌয়ের এবার সত্যিই ব্যামো সেরেছে।

এ-কাহিনির টাইপ—১৪০৫ : কুঁড়ে তাঁতি বৌ।

কুঁড়ের কথা যখন হল তখন কিপ্টের কথাই বা বাদ যায় কেন? এবার এক কিপ্টের কথা শোনাই:

এক যে ছিল কিপ্টে — তাকে হাড়-কিপ্টে বলাই বোধ হয় ঠিক। লোকটা প্রচুর টাকা-পয়সা রোজগার করত, কিন্তু মরে গেলেও, পাই-পয়সা খরচ করত না। সামান্য খেয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকত। এজন্য তাকে খুবই কষ্ট স্বীকার করতে হত। তবু সে তা মেনে নিত টাকা জমাবার নেশায়।

একদা এ-হেন কঞ্জুস লোকটাও ঠিক করল যে সে বিয়ে করবে। কিন্তু এমন কিপ্টে মানুষের তো আর যে-সে পাত্রী চলে না। লোকটা চায় তার বৌ হোক একেবারে 'নিখাকি মা' — অর্থাৎ যে কিছুই খাবে না। যদি বৌ পেট পুরে খায় তবে যে খরচ বেড়ে যাবে! খরচ বাড়লে টাকা জমাবে কি করে?

কিপ্টে যেমন চায় তেমনি পাত্রী পায়। অনেক খুঁজে, অনেক বাজিয়ে, অবশেষে কিপ্টে লোকটা মনোমত এক পাত্রীকে ঘরে আনে।

কিন্তু হায়, বিয়ের পরদিন সকালবেলাতেই লোকটা দেখে কি, নতুন বৌটি একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি চিবুচ্ছে। বৌয়ের সেই রাজসিক (?) আহারদৃশ্যের আঘাত সহ্য করতে না পেরে কিপ্টে লোকটা তখুনি মারা গেল।

এ-কাহিনির টাইপ—১৪০৭ : হাড়-কিপ্টে।

কিপ্টের পর এক গোঁয়াড়ের কথা :

বাপ আর ছেলে। ছেলে কখনই বাপের কথা শোনে না। বাপ যদি বলে 'ভাত খা', ছেলে সেদিন উপোস করে। বাপ যদি বলে 'উত্তরদিকে যা', ছেলে নির্ঘাৎ দক্ষিণদিকে হাঁটবে। বাপ যদি বলে, 'শুয়ে থাক', ছেলে অবশ্যই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে।

এভাবেই বাপ-বেটার দিন কাটে।

একদিন বর্ষাকালে একটা খাড়ি পেরোতে গিয়ে ছেলে বিপদে পড়ে। খাড়ির খরস্রোত ছেলেটাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে অতল গহ্বরে। নিজেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সে তখন এক গরুর লেজ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে।

পাড়ে দাঁড়িয়ে আতংকিত চোখে দৃশ্যটি দেখছিল ছেলেটার বাপ। ছেলে তার গরুর লেজ ধরতে পেরেছে দেখে বাপ তখন বলে ওঠে, 'জীবনে আমার কোন কথাই তো শুনলি না, আজ অন্তত একটা কথা শোন — গরুর লেজটা ছাড়িস না।'

বাপের কথা শেষ হতে না হতেই ছেলেটা গরুর লেজ ছেড়ে দিয়ে ভেসে গেল নদীর অতল গহ্বরের দিকে।

এ-কাহিনির টাইপ—৯১০এ : অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান।

এক পাগল বিপজ্জনকভাবে এক নড়বড়ে সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে। তাকে ঐভাবে দাঁড়াতে দেখে দর্শকেরা সতর্ক করে দিচ্ছে তাকে, 'পাগল তুই সাঁকো নাড়াস না।'

এ-কথা শুনেই পাগল প্রবলবেগে সাঁকো নাড়াতে থাকে, এবং সাঁকো ভেঙে নদীতে ডুবে যায়;

এ-কাহিনি টাইপও—পূর্ববৎ ৯১০এ : অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান।

এবার এক দল ঠগের কথা :

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাট থেকে দিনের শেষে বেশ শস্তায় একটা ছাগল কিনে বাড়ি ফিরছেন। পথে পড়লেন এক দল ঠগের পাল্লায়। ঠগেরা বৃদ্ধটির হাতে ছাগটা দেখে নিজেদের মধ্যে নিমেষে শলা-পরামর্শ করে নিল, মতলব তাদের যে করেই হোক ছাগলটাকে বাগানো চাই। শুরু হয়ে গেল তাদের তৎপরতা।

ব্রাহ্মণের ফেরার পথের ধারে একশো গজ অন্তর তারা দাঁড়িয়ে গেল। ব্রাহ্মণ কিছু দূর যেতেই ঠগেদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করল, 'মশাই, কুকুরটা কত টাকায় কেনা হল?'

ব্রাহ্মণ প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'এটা কুকুর হতে যাবে কেন, এটা তো ছাগল।'

ঠগটা মুখে কিছু বলে না, শুধু অবিশ্বাসের হাসি হাসতে থাকে।

ব্রাহ্মণ আরও কিছু দূর যেতে এবার দ্বিতীয় ঠগ এগিয়ে এসে বলে, 'ঠাকুর মশাই. ভারি সুন্দর তো কুকুরটা—এটা কি দানে পেলেন?

ব্রাহ্মণ আবার খেঁকিয়ে ওঠেন, 'এটা কুকুর নয়, ছাগল। কেউ দান করতে যাবে কেন? হাট থেকে কিনে আনছি।'

আগের ঠগটির মতই এ-ও ব্রাহ্মণের কথায় হেসে ওঠে। ব্রাহ্মণ এগিয়ে চলেন। আবারও একজন এগিয়ে এসে ছাগলকে কুকুর বলায় ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হয় — শেষ বেলার আলোয় ব্যাপারি তাকে ছাগলের বদলে কুকুর গছিয়ে দিল না তো?

কিছু দূর যেতে আর এক ঠগ এগিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে শুধায়, 'ঠাকুর মশাই, আপনি শেষে কুকুর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন? ছি-ছি!'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন তাঁর ভুল হয়েছে মনে করে ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে ছাগলটাকে রাস্তায় ফেলে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। ঠগেরা তখন সেই ছাগলটা বগলদাবা করল।

এ-কাহিনির টাইপ—১৫৫০ : গৃহস্থ ও ঠগ।

প্রবাদকথা সাধারণত হারিয়ে যাওয়া কোন লোককথার সারাৎসারের ব্যঞ্জনা বহন করে থাকে। অবশ্য এই যে লোককথাটির ব্যঞ্জনবাহী হয়ে ওঠা প্রবাদকথাটি, কালবিচারে স্বভাবতই হয় মূল লোককথার চেয়ে অনেক অর্বাচীনতর। জনমানসে মূল লোককথাটি দৃঢ়মূল লাভ করার পর, ধীরে ধীরে একদা তা থেকে প্রবাদবাক্যটির সৃষ্টি হয়। প্রবাদবাক্যটি সৃষ্টি হবার পর আমরা হয়তো মূল লোককথাটি ভুলেও যাই, কিন্তু বেঁচে থাকে তা থেকে গড়ে ওঠা প্রবাদবাক্যটি। গুণবিচারে মূল লোককথাটি আভাসে-ইঙ্গিতে বলা হয়। তা থেকে উদ্ভূত প্রবাদ বাক্যটি কিন্তু শ্রোতার মন তীব্র তীক্ষ্ণ হীরের মতই বিদ্ধ করে। প্রবাদকথা মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার দর্পণ। প্রবাদবাক্যটির পেছনে যে-কাহিনি লুকিয়ে থাকে কোনোভাবে তারই পুনরাবর্তন যখন মানুষের চোখের সামনে ঘটে, তখন মানুষ প্রবাদবাক্যটি আওড়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। লেখাবাহুল্য, মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রবাদবাক্য ব্যবহারের জুড়ি মেলা ভার। এমনি একটি প্রবাদবাক্যের দৃষ্টান্ত অন্তরালবর্তী কাহিনি-সহ হাজির করলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে।

খেজুর গাছ তেলপানা হয়েছে।

কোন এক কথকঠাকুর আসর জাঁকিয়ে কথকতা পরিবেশন করে চলেছেন সেদিন। কথকতার বিষয় ছিল মনুষ্যকৃত হরেক রকম পাপের শাস্তি! বলতে বলতে কথকঠাকুর ভ্রষ্টা নারীর প্রসঙ্গে এলেন এবং নাটকীয়তা এনে অঙ্গভঙ্গির সাহায্য ভ্রষ্টা নারীর শাস্তির ফিরিস্তি দিয়ে বললেন, 'ভ্রষ্টা নারীকে কাঁটাওয়ালা খেজুরগাছের ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়।'

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিল কথকঠাকুরটির রক্ষিতাও। ভ্রষ্টা নারীর শাস্তি-বিধানে এহেন সুপারিশ শুনে, রক্ষিতাটি তো আর কথকঠাকুরের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে রাজি নয়। ঠাকুরের সঙ্গে সংস্পর্শ রাখা মানেই তো ঠাকুরের কথামত পাপের বোঝা বাড়ানো।

কথকঠাকুর পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে রক্ষিতাটিকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন, 'বহু পাপী টেনে নিয়ে যাওয়ার ফলে খেজুর গাছটি এখন বেশ তেলপানা হয়েছে, মসৃণ হয়ে গেছে। ওর ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেলেও নারীর দেহ আর রক্তাক্ত হয়না।

এ-কাহিনির টাইপ—১৫৩৯ : চাতুর্য ও প্রতারণা।

'ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার' প্রবাদবাক্যটির পেছনে যে-রহস্য লুকিয়ে আছে তার উন্মোচন ঘটেছে অনেক আগেই এক আধুনিক 'ভায়রাব'-এর কল্পনায়—যা এ গ্রন্থের 'রঙ্গকথায় কাকতালীয় যোগ' নিবন্ধে ধরা আছে। ছোট্ট করে এই সুযোগে

বলে ফেলি আরো দুটি প্রবাদকথার পেছনকার কাহিনি। প্রথম ঠগের কাহিনি :

ঐ রোগেই ঘোড়া মরে।

এক সময় এক ভদ্রলোক প্রবঞ্চক এক প্রতিবেশীর জিম্মায় বিশ্বাস করে তাঁর ঘোড়াটি রেখে বিদেশ বেড়াতে বেরোলেন। কয়েকমাস পর বিদেশ থেকে ফিরে তিনি প্রতিবেশীর কাছে তাঁর ঘোড়াটি ফেরৎ চান। ঠগ প্রতিবেশীটি তখন কুম্ভীরাশ্রু ফেলতে ফেলতে মাঠের ওপর পড়ে থাকা কিছু হাড়-গোড় দেখিয়ে বলেন, 'হায়-হায় আপনার ঘোড়াটি কি আর বেঁচে আছে? রোগভোগ কিছু নেই, হঠাৎই একদিন মারা যায়। ঐ দেখুন হাড়গুলো পড়ে আছে।'

প্রতিবেশীর শোক প্রকাশের বহর দেখে ভদ্রলোকটির মনে সন্দেহ জাগে। তিনি তো আর গরু-ঘোড়ার মত ঘাস খেয়ে চলেন না। অবাক হয়ে তিনি প্রতিবেশীকে শুধান, 'সে কী? ওগুলো তো গরুর হাড়?'

ঠগ প্রতিবেশীটি তথাপি দমবার পাত্র নন। তিনি অম্লানবদনে বলেন, 'আমার গরুটার ওলাওটায়ই কাল হল, আর আপনার ঘোড়াটাও মরে ঐ রোগে।'

এ-কাহিনির মোটিফ—এইচ ১১৮০।

দ্বিতীয় কাহিনি : অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

এক গাঁয়ে এক তাঁতি ছিল। অন্যসব লোককথার মতই এ-গল্পের তাঁতিটিও ভারি বোকা। সে খুব যত্ন করে তাঁত বুনছে। শাড়ি বানিয়ে হাটে বিক্রি করতে যাবে।

শাড়ি বোনা শেষ হল। বেজায় পরিশ্রম হয়েছে। হাটে যাবার আগে দাওয়ায় বসে একটু মৌজ করে তামাক টানছে। সামনে রয়েছে সদ্যবোনা শাড়ি। হুঁকোয় আরাম করে টান দিতে দিতে বোকা তাঁতি ভাবে : হাটে বিক্রি করে যে টাকাকড়ি আসবে তা দিয়ে প্রথমে কিনবে একটা মুরগি, তারপর কিনবে একটা গরু। সবশেষে ঘরে আনবে একটা ফুটফুটে সুন্দরী জরু।

বোকা তাঁতি সুন্দরী জরুর চিন্তার এমনই মশগুল ছিল যে তার হাতের হুঁকো থেকে আগুন ছিটকে কখন যে সামনে রাখা শাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, বেচারার সে খেয়ালও নেই। সম্বিৎ যখন ফেরে তখন আর কিছু করারও নেই। এভাবেই বোকা তাঁতির সাধ-আহ্লাদের অগ্নিসৎকার ঘটল।

এ-কাহিনির টাইপ—১৪৩০ : স্বপ্ন দেখে বিপাকে পড়া।

বোকা তাঁতির তামাক খেয়ে বেহাল অবস্থার কথা তো শুনলেন, এবার শুনুন গুলিখোরদের হাল-হকিকৎ। এটি অবশ্য প্রবাদকথা নয়, সাদামাটা খোশগল্পই। একদা দু'জন নেশাগ্রস্ত গুলিখোরের মধ্যে কথা হচ্ছে :

১ম গুলিখোর।। আজ পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখি জলে আগুন লেগেছে আর কই মাছগুলো গাছে উঠেছে।

২য় গুলিখোর।। দূর বোকা, কই মাছ কি গরু যে গাছে উঠবে?

এ-কাহিনির টাইপ হতে পারত ১৯২০ : মিথ্যে কথা বলার প্রতিযোগিতা, কিন্তু এক্স ১০২০ : অতিশেয়োক্তি দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি নিয়েই তুষ্ট থাকি।

পাগলা গারদের পটভূমিতে এ-কাহিনিটিই একটু অন্য মাত্রা খুঁজে নেবে।

গারদের পাগলাগুলো ভাবছে তারা সুস্থ অথচ কর্তৃপক্ষ তাদের আটকে রেখেছে। তারা তাই স্থির করেছে, সমবেত হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে যাবে এবং মুক্তি চাইবে।

যারা এসব আলোচনা করছিল তাদের একজনের সন্দেহ হল অন্য আর একজনের সুস্থতা সম্পর্কে। পরখ করার জন্য সে সন্দেহভাজনকে শুধাল, 'বল তো আমার পকেটে কি আছে?'

সন্দেহভাজন হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'কি আছে আবার? একটা আস্ত দোতলা বাস।'

প্রথমজন তাই শুনে বলে, 'ও বুঝেছি। বাসটা যখন আমি পকেটে পুরেছিলাম নিশ্চয় তখন তুই দেখেছিস।'

এ-কাহিনির মোটিফও আগেরটির মতই এক্স—১০২০ : অতিশয়োক্তি দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি। অতিরিক্ত মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এবার কালাদের পালা :

পথে দু'জনের দেখা। দু'জনেই কানে শোনে না। প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে শুধায়, 'আপনি বুঝি হাটে যাচ্ছেন?'

দ্বিতীয়জন সে-কথা শুনে বলে, 'না-না, আমি হাটে যাচ্ছি।'

প্রথমজন তাই শুনে বলে, 'ও, তাই বলুন, আমি ভাবলাম আপনি বুঝি হাটে যাচ্ছেন।'

এ-কাহিনির টাইপ—১৬৯৮ : কালা মানুষ এবং তাদের কথাবার্তা।

এবার এক পাদরি এবং বৃদ্ধার কথা :

গ্রামাঞ্চলে এক পাদরি তাঁর বক্তৃতায় খ্রিস্টধর্মের জয়গান গেয়ে চলেছেন। সবাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা শুনছেন। পাদরি সাহেবের বক্তৃতা শেষ হলে শ্রোতারা একে একে সবাই বিদায় নিল, কেবল এক বৃদ্ধা তাঁর আসনে বসে, তখনও অঝোরে কেঁদে চলেছেন। বৃদ্ধাকে ঐভাবে কাঁদতে দেখে পাদরি ভাবলেন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়েই বৃদ্ধা কাঁদছেন। পাদরি এগিয়ে এসে বৃদ্ধাকে শুধালেন, 'বুড়িমা, আপনি কাঁদছেন কেন?'

বৃদ্ধা অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি কাঁদছি বাবা আমার এক হারিয়ে যাওয়া ছাগলের শোকে — সেই ছাগলটারও ঠিক তোমার মতই দাড়ি ছিল কি না, তাই তোমায় দেখে আমার তার কথা মনে পড়ে গেল।'

এ-কাহিনির টাইপ—১৮৩৪ : পাদরি ও বৃদ্ধা।

এ-কাহিনিটি আমাদের আর একটি কাহিনিকে মনে পড়িয়ে দেয় :

রাতে মাঠে বসেছে কালোয়াতি গানের আসর। শ্রোতার সংখ্যা অনেক। গায়ক বেশ তন্ময় হয়ে গেয়ে চলেছেন। দীর্ঘ আলাপের পর গায়ক যখন চোখ মেলে তাকালেন, তখন দেখতে পেলেন এক শ্রোতা বৃদ্ধই কেবল চাদর গায়ে বসে আছেন। গায়ক তাঁর আসরে বসেই বৃদ্ধকে সাগ্রহে শুধালেন, 'আমার গান শোনার জন্য আপনি একা বসে আছেন?'

বৃদ্ধ চোখ কচলাতে কচলাতে বলেন, 'কি করব বাছা, আমার তো কোথাও আর যাবার উপায় নেই, তুমি যে পাটাতনে বসে গান গাইছ, ওটা আমারই—গান শেষে ওটা তো আমাকেই ঘরে নিয়ে যেতে হবে।'

এ-কাহিনির টাইপও আগেরটির মতই—১৮৩৪।

রঙ্গকথা : গোপাল ভাঁড় এবং

নদিয়াপতি কৃষ্ণচন্দ্রের হাস্যরসিক সভাসদ গোপাল সম্পর্কে এই ছড়াটি আজ প্রবাদপ্রতিম :

নুনের ভাঁড় তেলের ভাঁড়, তাকে কে বলে ভাঁড়?
ভাঁড়ের মধ্যে ছিল এক নদের গোপাল ভাঁড়।

গোপাল ভাঁড়ের রঙ্গকথা যেমন হাস্যোজ্জ্বল, তাঁর জীবনকথা তেমনি রহস্যাবৃত। এমন কি যে নদিয়াপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ হিসেবে তাঁর নাম অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে আছে, কিছু কিংবদন্তি ছাড়া তার সমর্থনে কোন সাক্ষী-সবুদও নেই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সব সভাসদদেরই ভূমিদান করেছিলেন। গোপাল-গবেষকরা তন্নতন্ন ঘেঁটেও সে-তালিকায় গোপাল ভাঁড়ের নাম খুঁজে পাননি। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। তাঁর রাজসভার বিশদ বিবরণে বৈদ্য-কালোয়াত-নর্তকসহ 'কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়'। হায়, সেখানে একবারের জন্যও গোপালের নাম উচ্চারণ করেননি তিনি। এইসব দেখেশুনে বাংলাসাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাসকার সুকুমার সেন তো উনিশ শতকের পালাকার গোপাল উড়ের সঙ্গে গোপাল ভাঁড়কে অভিন্নজ্ঞান করেছেন। তথাপি নথিপত্রেব ইতিহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই লোকমুখে গোপাল ভাঁড় কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পাশে সভাসদ হিসেবে সসম্মানে স্থান করে নিয়েছেন।

লোকমুখের গোপালচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে পাকাপোক্ত আসন লাভ করেন সম্ভবত কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের বদান্যতায় ইংরেজি সন ১৮৭৪-এ। তাঁর 'বঙ্গভূষণ' কাব্যগ্রন্থে বাঙালিশ্রেষ্ঠদের নিয়ে রাজকৃষ্ণ যে সনেট-প্রশস্তি রচনা করেন তাতে মাননীয় রাধাকান্ত দেববাহাদুরের পরেই স্থান পান রসিকরাজ। সুলতানি রাজসভা এবং মোগল দরবারের আদলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায়ও জনাদেশে একজন বিদূষকের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ১৮৩০-এ বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ লিখলেন, 'তৎকালীন বঙ্গদেশের মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা অদ্বিতীয়রূপে শোভিত ছিল। ... ... তাঁহার ভাঁড় অন্য ২ ভাঁড়ের ন্যায় পাণ্ডিত্য ও রসিকতাবিষয়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিল, তাঁহার অনেক ২ রহস্যকথা অদ্য পর্যন্ত প্রচরদ্রুপ চলিত আছে। তাহা সকল যদি সংগ্রহ করা যায় তবে আমোদ-প্রমোদের অত্যুত্তম পুস্তক হয়।'

কাশীপ্রসাদ-কাঙ্ক্ষিত 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনাবস্থার কৌতুক সংগ্রহ নাটক' পয়ারে বেঁধে দ্বিজ শ্যামাচরণ লেখেন 'কৌতুকবিলাস'। ১৮৪৩-এ কলকাতার সিমুলিয়ার কমলালয় যন্ত্র থেকে সেই বই ছাপা হয়ে বেরোয়। আরো পরে, ১৮৮০ থেকেই গোপাল আখ্যান হটকেক হয়ে ওঠে মসজিদ বাড়ির সমুন্নত-সাহিত্য-কার্যালয় এবং বটতলার

প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী বসাক অ্যান্ড সন্সের দৌলতে রীতিমত গদ্য-গল্পের মাধ্যমে। তখন থেকেই নতুন-নতুন নামে, নতুন-নতুন কিছু গল্প সংবলিত হয়ে গোপাল রহস্যকথা ক্রমশ স্ফীত কলেবর প্রাপ্ত হতে থাকে।

গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে প্রচলিত রঙ্গকথাগুলি দেড় শতকেরও বেশি সময় পেরিয়ে এখনো এমন জনপ্রিয় যে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষও তার রঙ্গকথার বই সাগ্রহে সংগ্রহ করে এবং তা পাঠ করে নির্মল আনন্দ উপভোগ করে। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই করা এই রঙ্গকথাগুলি আমাদের একটি জরুরি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রশ্নটি হল, কোন গুণে গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত এই রঙ্গকথাগুলির এই অসামান্য জনপ্রিয়তা? এই জনপ্রিয়তার পেছনে কি কোন পরিকল্পিত চিন্তাভাবনা সক্রিয়, নাকি নিছক জনমনোরঞ্জনেই এর চরম সার্থকতা?

প্রশ্নটির সদুত্তর পেতে গেলে আমাদের সে-সময়ের আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিটুকু বুঝে নিতে হবে। পাশাপাশি তখনকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

কৃষ্ণচন্দ্র যখন নদিয়াপতি তখন নবাবি আমল। আলিবর্দি মুর্শিদাবাদের নবাব (১৭৪০-১৭৫৬), মুর্শিদাবাদের নবাবকে মোটা রকম রাজস্ব দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার হালেই ছিলেন। মধ্যযুগের রাজা-রাজড়াদের প্রায় সকলেই রাজকাজ চুকে গেলে, দিনের একটা সময় বিনোদনে অতিবাহিত করতেন। কেউ সুন্দরীর আসঙ্গলিপ্সায় লিপ্ত হতেন, কেউ বা বিদূষকের রঙ্গরসিকতায় — কেউ বা একই সঙ্গে দু'টিরই সমন্বয় ঘটাতে চাইতেন।

রঙ্গরসিকতা করে কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করার জন্যই গোপালকে গ্রাম থেকে রাজার সভাসদ হিসেবে আনা হয়েছিল। গোপাল এসেছিলেন নিচুতলার লোকসমাজ থেকে। সংগত কারণেই তদানীন্তন বাংলাব লোকসমাজের অভাব-অভিযোগ-আদেশ ও অভিপ্রায় গোপালের মাধ্যমে মূর্ত হয়েছিল। বাংলায় তখন গ্রামীণ লোকসমাজ ও নাগরিক অভিজাত সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈষম্য তীব্র ছিল না। গ্রামের মানুষ আর শহরের মানুষের মধ্যে মানসিক যোগসূত্র অটুট ছিল। গ্রাম আর নগরের মধ্যে ভেদাভেদের রোগটা প্রথম দেখা গিয়েছিল ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব সংঘটনের মধ্যে দিয়ে এবং খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। বরং কালবিচারে বাংলা সে-ঘটনার অনেক পরেও রোগমুক্ত ছিল। প্রতিষেধকের ভূমিকা পালন করেছিলেন সেদিন বাংলার কুটিরশিল্পীরা। তাঁরা সেদিন গ্রাম ও শহরের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক সেতুটি রক্ষা করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন নিজেদেরই গরজে।

এইসব কুটিরশিল্পী সেদিন গ্রাম থেকে শুধু যে বেতের বোনা ধামা-কুলো-গামছা-শাড়ি নিয়ে আসতেন তা নয়, বেচা সারা হলে, শহর থেকে গ্রামে নিয়ে যেতেন গ্রামের মানুষের মনের খোরাক—যাত্রাপালা-তরজা-কবিগান-পাঁচালি প্রভৃতি হরেক কিসিম আনন্দের উপকরণ।

উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়ল

বঙ্গোপসাগরের কূলে। বিশশতকের গোড়া থেকেই যন্ত্রশিল্প জাঁকিয়ে বসল বাংলার শহরগুলিতে। ঔপনিবেশিক স্বার্থে বৃটিশ রাজশক্তি মদত জোগাতে লাগল যন্ত্রশিল্পকে। চড়া হারে দেশি কুটিরশিল্পের ওপর কর বসানো হল। যাঁরা সেই কর দিতে পারতেন না তাঁদের ওপর চলতো অমানুষিক পীড়ন। ঢাকার মসলিন উৎপাদন বন্ধ করতে নিরীহ বস্ত্রশিল্পীদের হাতের আঙুল কাটার মতো নৃশংস ঘটনাও ঘটতে লাগল। যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় বাংলার কুটিরশিল্প পরাভব মানল, আর তখনই ভেঙে পড়ল গ্রাম ও শহরের মধ্যে গড়ে-ওঠা দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক সেতুটি।

গ্রামীণ লোকসমাজের সঙ্গে যোগরহিত হয়ে শহুরে মানুষ ক্রমশ সব ব্যাপারেই উন্নাসিক হয়ে উঠলেন। লোকসংস্কৃতিকে তাঁরা অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করলেন। স্বরচিত দুর্গের বাসিন্দা সেইসব শহুরে মানুষ সাহিত্য-সংগীত-নাটক ইত্যাদির বিচারে শ্লীলতার ধুয়ো তুলে লোকসংস্কৃতির সিংহভাগ অচ্ছুৎ গণ্য করে খারিজ করে দিতে চাইলেন। বলার কথা এই যে, গোপালের রঙ্গকথায় যে স্থূলতা আজকের শহুরে শিক্ষিত মানুষের চোখে ধরা পড়ে, সেদিনের নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে তা কিন্তু বেশ উপভোগ্য ছিল। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দর কাব্যগ্রন্থটি কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতারই ফলশ্রুতি।

গোপাল-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এইখানে যে তিনি মহারাজের বেতনভুক হলেও আত্মমর্যাদাকে কখনো বিকিয়ে দেননি। রাজসভার সভাসদ হয়েও তিনি যে গরিব সমাজ থেকে উঠে এসেছিলেন সেই সমাজের প্রতি সহমর্মিতা বরাবর বজায় রেখেছিলেন। মন্তব্যের সমর্থনে গোপালের একটি রঙ্গকথা শোনাই :

একটি যুবক মজুরের কাজ করে কোনমতে সংসার চালাত। কয়েকদিন যাবৎ কোন কাজ জোটাতে না পারায় সে সপরিবারে অভুক্ত আছে। পেটের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সে গ্রামের এক মহাজনের কাছে এসেছিল টাকা ধার চাইতে। মহাজন তার প্রস্তাব শুনেই জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নামে জমিজমা কত আছে?'

যুবকটি সবিনয়ে বলল, 'অভাবের জ্বালায় আগেই সব বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছি।'

যুবকটির জবাব শুনে মহাজন সাফ জানিয়ে দিল, 'তবে যা হতভাগা, এখানে তোর কিস্যু জুটবে না।'

মহাজনের কথা শুনে যুবকটি কাঁদতে কাঁদতে তার পা দুটি জড়িয়ে ধরে বলল, 'আপনি সদয় না হলে আমার পরিবার না খেয়ে মরে যাবে, অনুগ্রহ করে আমায় কিছু টাকা ধার দিন। আমি গতরে খেটে সুদে-আসলে পাই পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দেব।'

মহজনের মাথায় খেলল নতুন ফন্দি। সে সস্নেহে যুবককে বলল, 'পা ছাড়, একটা কাজ করতে পারবি?'

মহজনের কথায় যুবকটি যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। সে উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'কি কাজ?'

—'আজ সারা রাত বাইরের পুকুরে ঠাণ্ডা জলে গলা চুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি? দ্যাখ যদি পারিস একশো টাকা নগদ পুরস্কার পাবি।'

পৌষ মাসের হাড়-কাঁপানো শীতের রাত। বরফ-ঠাণ্ডা পুকুরের জলে সারা রাত গলা চুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানে মৃত্যুকেই ডেকে আনা। দু'দিন পেটে কিছু পড়েনি। পেটের জ্বালায় মহাজনের ঐ নৃশংস প্রস্তাবে যুবকটি সম্মতি দিতে বাধ্য হল। মহাজন যুবকটিকে বলল, 'আজ ঠিক রাত বারোটায় তুই পুকুরে নামবি, কাল সকাল দশটায় পাড়ে উঠবি। তোকে পাহারা দেবে আমার দু'জন পাহারাদার।'

যথাসময়ে যুবকটি পুকুরে নামে এবং বিস্ময়করভাবে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত জলে গলা চুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই অবস্থায় সেখান থেকে সে সোজা চলে আসে মহাজনের বাড়িতে এবং পূর্ব-প্রতিশ্রুতিমত মহাজনের কাছে একশো টাকা দাবি করে।

মহাজন এবার বেশ বিপাকে পড়ে যায়। একটা অবাস্তব প্রস্তাব দিয়ে আসলে সে যুবকটিকে ভাগাতেই চেয়েছিল, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে সেটা তার খেয়াল ছিল না। অগত্যা মহাজন টাকা না দেবার ফিকিরে যুবকটিকে বলে, 'ইচ্ছে থাকলেও তোকে তো টাকাটা দিতে পারছি না রে।'

—'কেন বাবু?'

—'কেন বুঝতে পারছিস না তো? কথা ছিল ঠাণ্ডা জলে গলা চুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে — তাই তো?'

—'হ্যাঁ বাবু, আমি তো পুকুরের ঠাণ্ডা জলেই দাঁড়িয়েছিলাম।'

পাশে দাঁড়ানো পাহারাদারও যুবকটির কথায় সায় দিল। কিন্তু ভবি সহজে ভোলবার নয়। মহাজন জানায়, 'আমার বাড়ির বারান্দা থেকে ঝাড় লণ্ঠনের আলো তোর মুখে এসে পড়েছিল কিনা?'

—'হ্যাঁ বাবু, তাতো একটু পড়েছিলই।'

—'সেই আলোতেই পুকুরের জল গরম হয়ে গিয়েছিল। কাজেই একশো টাকা তোর ভাগ্যে আর জুটল না।'

ধুরন্ধর মহাজনটির কু-যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে সরলমতি যুবকটি কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় নামল।

গোপাল তখন ঐ রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলেন। ক্রন্দনরত যুবকটিকে দেখে শুধান, 'বাছা তুমি এমন কাঁদো কেন?'

যুবকটি চোখ মুছে গোপালকে সবিস্তারে সেই পাষণ্ড মহাজনের নির্মম রসিকতার কাহিনি শোনায়। গোপালের হাসিমাখা মুখখানি মুহূর্তে যুবকটির কথায় জ্বলে ওঠে। তবু যুবকটিকে শান্ত গলায় বলেন, 'ভেঙে পড়িস না তুই, দু'চারদিনের মধ্যেই মহাজনটিকে এমন শায়েস্তা করব যে বাছাধন জীবনে আর কখনও কোন গরিব মানুষকে

নিয়ে এমন রসিকতা করতে সাহস করবে না। তোর প্রাপ্য টাকা তোকে ও দেবে না তো ওর বাপ দেবে।'

দিনকয়েক পরে গোপাল তাঁর বাড়িতে এক অভিনব ভোজসভার আয়োজন করলেন। রাজমন্ত্রী ছাড়াও নগরের আমন্ত্রিতদের মধ্যে সেই ধুরন্ধর মহাজনটিও ছিল। স্বয়ং নিজে গিয়েই গোপাল তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আমন্ত্রিতরা গোপালের বাড়িতে হাজির। গোপাল তাঁদের বাগানে বসানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা যায়, খাওয়ানোর কোন লক্ষণ নেই আমন্ত্রিতদের। রাজমন্ত্রী অভিজ্ঞ, তিনি অনুমান করে নেন, ভোজসভা ডেকে গোপাল নিশ্চয় অন্য কোন মতলব সিদ্ধ করতে চান। মন্ত্রীমশাই মিটিমিটি হাসেন, আর বলেন, 'কই হে গোপাল, খাবারদাবার আনো — আর কতক্ষণ হাত গুটিয়ে বসে থাকব?'

মহাজন তো আরও বিরক্ত। তার কথায় গৃহস্বামীর প্রতি কটাক্ষ ফুটে ওঠে, 'এইভাবে অতিথিদের অপদস্থ করতে হয়, চলুন দেখি, কোথায় আপনার রান্নাবাড়া হচ্ছে?'

দেখা যায় গাছের ডালে হাঁড়ি বসানো, আর অনেক নীচে উনুননের আঁচ। — 'এইভাবে ভাত রান্না হচ্ছে?'

—'কেন হবে না? আলবাৎ হচ্ছে। যদি আপনার বাড়ির বারান্দার লণ্ঠনের আলোয় পুকুরের জল গরম হতে পারে, তবে এই উনুনের আঁচে গাছের ডালে রাখা ঐ হাঁড়ির ভাত নিশ্চয় গরম হবে।'

রাজমন্ত্রীসহ অন্যান্য আমন্ত্রিতরা তখন গোপালকে জিজ্ঞেস করেন, 'কি ব্যাপার গোপাল?'

গোপাল তখন গাছের তলায় দাঁড়ানো সেই গরিব যুবকটিকে ডেকে, তার মুখ দিয়েই সমস্ত বৃত্তান্ত আমন্ত্রিতদের শোনান।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রাজমন্ত্রী মহাজনটিকে তিরস্কার করে বলেন, 'কথামত একশো টাকা তো পুরস্কার হিসেবে দিতে হবেই, তাছাড়াও একশো টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে জরিমানা বাবদ।'

মহাজনের ভোজ-খাওয়া শিকেয় উঠল। গরিব যুবকটিকে তখুনি দু'শো টাকা দিয়ে মহাজনটি মাথা হেঁট করে গোপালের বাড়ি থেকে চলে গেল। এ-কাহিনির টাইপ— ১২৬২ : দূরস্থ আলোয় পুকুর গরম হওয়া।

কাহিনিটি বীরবলের রঙ্গকথায়ও গৃহীত হয়েছে। সেখানে গরিব যুবকের জায়গায় মল্লবীরের উপস্থিতি কাহিনিটিতে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে।

এখন যে রঙ্গকথাটি শোনাব তাতে ফুটে উঠেছে গোপালের উপস্থিতবুদ্ধি আর অসামান্য ব্যক্তিত্ব — বেপরোয়া রসিকতাও! কাহিনিটি এ-রকম :

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপালের ছেলেকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার ছেলেটির দেখছি একেবারে রাজার মতই চেহারা।'

আপাত-সরল এই স্তোকবাক্যটি কিন্তু গোপালকে অন্যভাবে বিদ্ধ করল। কৃষ্ণচন্দ্রের কথার মধ্যে তিনি শ্লেষের আভাস পেলেন। মহারাজ তাঁর পিতৃত্ব নিয়েই খোঁচা মারছেন এই ভেবে তিনিও পাল্টা শ্লেষ-বাণ হানলেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, আমি রাজপুত্রের বাপ।'

মহারাজের প্রতি সরাসরি এহেন সাংঘাতিক কটাক্ষ গোপালের পক্ষে করা সম্ভব হয়েছিল তৎকালীন বাংলার লোকসমাজের উদার অনুমোদনেই। আভিজাত্যের উচ্চাসন থেকে নেমে এসে, একজন সাধারণ মানুষের মতই মহারাজও যে গোপালের সঙ্গে এই ধরনের স্থূল রসিকতায় মেতে উঠেছিলেন, তার পেছনেও রয়েছে ঐ লোকসমাজের সাগ্রহ সম্মতি। এর মোটিফ—এক্স ১০ : ব্যঙ্গ ও ঠাট্টা।

অনুরূপ মোটিফযুক্ত গোপালের আর একটি রঙ্গকথা, যেখানে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে তাঁর দুঃসাহসও মিশে আছে :

কৃষ্ণচন্দ্র একদিন রাজদরবারে গোপালকে প্রশ্নবাণে ঘায়েল করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা গোপাল বল তো তোমাতে আর গাধাতে কতটা তফাৎ?'

উত্তর যেন গোপালের ঠোঁটের আগায় আগাম মজুতই ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে রাজা বসেছিলেন যে সিংহাসনে, তার দূরত্ব হাত দিয়ে মাপতে শুরু করলেন। মাপাজোকার কাজ শেষ হলে, 'তিনি রাজা-মশাইকে বললেন, 'এবার তফাৎটা বলব রাজামশাই?'

কৌতুকের হাসি মুখে নিয়ে রাজা বললেন, 'বলার জন্যই তো জিজ্ঞেস করা, কি বলবে বল?'

—'রাজামশাই, মেপে দেখলাম আমার সঙ্গে গাধার তফাৎ ঠিক তিন হাত মাত্র।'

তিনহাত দূরবর্তী রাজামশাই গোপালের জবাব শুনে অবশ্য রুষ্ট হননি আদৌ, বরং খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়ে উদার মনে নিজের গলার সোনার হার গোপালের গলায় পরিয়ে দিলেন।

এবার যে-রঙ্গকথাটি শোনাব সেটিতেও বোঝা যাবে বেতনভুক্ কর্মচারী হলেও গোপাল রাজার কাছে নিজেকে মোটেই বিকিয়ে দেননি, বরং একজন প্রকৃত গুণীর মর্যাদায় রাজসভায় মাথা উঁচু করেই কাজ করে গেছেন। কাহিনিটি এ-রকম :

মহারাজ সেদিন খুশিমনে রাজসভায় বসলেন। এতদিন পর গোপালকে জব্দ করার একটা ভালো উপায় বার করা গেছে।

কিছুক্ষণ পর গোপাল রাজসভায় আসতেই মহারাজ বললেন, ওহে গোপাল, কাল রাতে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি — শুনবে নাকি?'

গোপাল সাগ্রহে জানালেন, 'বলুন না মহারাজ'।

মহারাজ তখন উৎসাহভরে বলতে লাগলেন, 'স্বপ্নে কি দেখলুম জানো? তুমি আর

আমি অজানা জায়গায় বেড়াতে গেছি। আশেপাশে কোন মানুষ নেই। দু'ধারে দু'টো বিশাল দিঘি। মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ। একটা দিঘি ক্ষীরের, অন্যটি গুয়ের। তুমি আর আমি সেই সরু পথ দিয়ে বেশ চলছিলুম। তুমি হঠাৎ পা হড়কে একেবারে গুয়ের দিঘিতে গিয়ে পড়লে, আর আমিও পা হড়কে পড়লুম গিয়ে ক্ষীরের দিঘিতে। এরপরই আমার ঘুম ভেঙে গেল, স্বপ্নও গেল টুটে।'

মহারাজের মুখে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে গোপাল-বাদে অন্যসব সভাসদরা হেসে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন গোপাল এবার আচ্ছা জব্দ হয়েছে। রাজসভার এক পণ্ডিত গোপালকে ঠাট্টা করে বলেই ফেললেন, 'দেখ হে গায়ে এখনও গু-টু লেগে আছে কিনা।'

গোপাল মুখ ব্যাজার করে তখন মহারাজের উদ্দেশে বললেন, 'আমি ও ঠিক ঐ একই স্বপ্ন দেখেছি মহারাজ।'

মহারাজ উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'তুমিও তাহলে একই স্বপ্ন দেখেছ?'

—'হ্যাঁ মহারাজ'।

মহারাজের প্রশ্ন আর গোপালের স্বীকারোক্তি শুনে সভাসদেরা আর এক প্রস্থ হেসে নিলেন।

গোপাল আগের কথার জের টেনে মহারাজকে জানালেন, 'আপনার ঘুম ভেঙে গেলেও, আমি আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম, তাই আরো কিছু দেখতে পেয়েছিলুম। যদি অনুমতি দেন তবে তা নিবেদন করি।'

—'অনুমতি দিলুম, তুমি বল।'

গোপাল ঠাণ্ডা গলায় বলতে শুরু করলেন, 'তারপর সবটাই গা-চাটাচাটির ব্যাপার হুজুর।

—আপনি সেই ক্ষীরের দিঘি থেকে উঠলেন, আমিও গুয়ের দিঘি থেকে উঠলুম।

—'তারপর?'

—'জায়গাটা খুবই নির্জন এবং অন্ধকার। আপনি সেই নির্জন আঁধারে আমাকে বললেন, এসো আমরা পরস্পর গা চাটি। তখন আমি আপনার গা চাটতে থাকলুম আর আপনি আমার।'

এ-কাহিনিটির টাইপ—৭২৫ : স্বপ্ন। উল্লেখযোগ্য মোটিফগুলি হল—ডি ১৮১২.৩.৩: স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখা এবং এফ ৭১১.২.২ : ক্ষীরের দিঘি। কাহিনিটি 'বীরবলের গল্প'-এ হুবহু গৃহীত হয়েছে — শুধু কৃষ্ণচন্দ্রের জায়গায় এসেছেন আকবব এবং গোপালের জায়গায় বীরবল। উইলিয়ম কেরি 'ইতিহাসমালা'-য় অবিকল এই কাহিনিটিই গ্রহণ করেছেন (১৮১২)। অবশ্য সেখানে রাজাটির নাম প্রতাপাদিত্য এবং ভাঁড়টি হলেন জনৈক মহেশ দাস।

গোপালের আর একটি রঙ্গকথাও এখানে হাজির করি, যেখানে দেখি মহারাজের

সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে তিনি বক্তব্য পেশ করেছেন। গোপালের আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের এ-কাহিনিটিও একটি উজ্জ্বল উদাহরণ :

রাজবাড়িতে যাত্রাগান হওয়ায় গোপাল আর সে-রাতে বাড়ি ফিরতে পারেননি। ভোররাতে যাত্রা দেখে অতিথিশালায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরদিন সকালে কৃষ্ণচন্দ্র অতিথিশালার কাছ দিয়ে যেতে গোপালের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিবিনিময় হল। গোপাল মহারাজকে নমস্কার করলেন। গোপাল তখনই ঘুম ভেঙে উঠেছিলেন।

সেদিনই দুপুরবেলা মহারাজ স্নান করতে গিয়ে স্নানাগারে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর সামনের পাটির একটি দাঁত ভেঙে গেল। মহারাজ মনে করে দেখলেন সকালবেলায় সবার আগে তিনি কার মুখ দেখেছেন। মনে পড়ল, গোপালের মুখই তিনি সবার আগে দেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদের ডেকে তিনি আদেশ দিলেন, 'গোপালকে ধরে এনে এক্ষুনি শূলে চড়াও। ব্যাটা অনামুখো। ওকে প্রথমে দেখেই আজ আমার দাঁত ভেঙেছে।'

রক্ষীরা হৈ-হৈ করতে করতে গোপালকে ধরতে গেল। গোপাল তাদের বললেন, 'শূলে চড়তে আমার কোনই আপত্তি নেই — বিশেষ করে এটাই যখন আমার প্রতি রাজাদেশ, কিন্তু তার আগে একবার আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

গোপালের অনুরোধে তাঁকে বেঁধে নিয়ে রক্ষীরা রাজার কাছে হাজির হল। গোপাল রাজাকে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার অপরাধটা জানতে পারি কি — কি কারণে আপনি আমায় শূলে দিচ্ছেন?'

কৃষ্ণচন্দ্রের তখনও রাগ পড়েনি। তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'তোমার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। সকালবেলা সবার আগে আমি তোমার মুখ দেখেছিলাম বলেই আজ আমায় হোঁচট খেয়ে পড়তে হয়েছে এবং তাতে আমার একটা দাঁত ভেঙেছে। তোমার মত অনামুখোর মরণই ভালো। তুমি বেঁচে থাকলে না জানি আরো কতো লোকের সর্বনাশ হবে।'

মহারাজের কথা শুনে গোপাল নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, 'ঘুম থেকে উঠে আপনি আমার মুখ সর্বপ্রথম দেখেছেন বলে আপনার দাঁত ভেঙেছে বলছেন, আর আমি সর্বপ্রথম আজ আপনার মুখ দেখেছি বলে আমায় শূলে চড়তে হচ্ছে। আপনি দেশের রাজা — দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এখন আপনিই বিচার করে বলুন হুজুর, আমাদের দু'জনের মধ্যে কে বেশি অনামুখো?'

গোপালের যুক্তিপূর্ণ সওয়াল শুনে কৃষ্ণচন্দ্র সানন্দে গোপালের মৃত্যুদণ্ড মুকুব করে দিলেন। এ-কাহিনির টাইপ—৩৬৬ : ফাঁসিকাঠ থেকে মুক্তি। এ-কাহিনিটিও 'বীরবলের গল্প'-এ স্থান পেয়েছে, তবে অনামুখো আসামি সেখানে বীরবল নন, অন্য একজন। বিচারক অবশ্যই বাদশা আকবর এবং অনামুখোর উকিল হলেন বীরবল।

এখন যে রঙ্গকথাটি শোনাব সেটির মধ্যে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে গোপালের ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধির প্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অগাধ আস্থার পরিচয় :

মুর্শিদাবাদ-নবাবের অদ্ভুত ইচ্ছে, মাটির নীচে কি আছে তা গণনার সাহায্যে বলতে হবে। যে-জ্যোতিষী ঠিক গণনা করে বলে দিতে পারবেন তাঁকে নবাব পাঁচ হাজার আশরফি পুরস্কার দেবেন, আর গণনায় বিফল হলে জ্যোতিষীকে আজীবন নবাবের কারাগারে পচতে হবে।

কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে কিছু নামী জ্যোতিষীকে গণনার কাজে নবাব মুর্শিদাবাদে পাঠাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়েই মহারাজ তাড়াতাড়ি নবদ্বীপের কয়েকজন সেরা জ্যোতিষীকে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই নামী জ্যোষিষীরাও গণনা করে মাটির তলায় কি আছে বলতে পারলেন না। ফলে নবাবের কারাগারে আটক হলেন। সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনে মহারাজ খুবই মুষড়ে পড়লেন। কেননা, তাঁর জন্যই ঐ নিরপরাধ জ্যোতিষীদের কারাবরণ করতে হচ্ছে। বিরস বদনে মহারাজকে বসে থাকতে দেখে, গোপাল তাঁকে শুধালেন, 'এমন মুখ-গোমড়া করে বসে আছেন কেন মহারাজ?'

গোপালের প্রশ্নে প্রথমটা মহারাজ যেন একটু ক্ষুণ্ণই হলেন। বললেন, 'সব সময় ভাঁড়ামো ভালো লাগে না গোপাল — আমায় একটু একা থাকতে দাও।'

গোপাল বুঝলেন সমস্যা গুরুতর। তিনি মহারাজের পাশে বসে বললেন, 'দ্বিধা না করে আমাকে সমস্যার কথা খুলে বলুন, আমি কথা দিচ্ছি — যেভাবে পাবি তা সমাধান করে দেব।'

কৃষ্ণচন্দ্র গোপালের আগ্রহের অমর্যাদা করলেন না। বিষণ্ণ গলায় তিনি বললেন, 'এ সমস্যার সমাধান তোমার পক্ষে সম্ভব নয় গোপাল, তবু জানতে চাইছ যখন বলি'— বলে নবাবের অদ্ভুত ইচ্ছে পূরণে নবদ্বীপ থেকে জ্যোতিষী প্রেরণ এবং তাঁদের ব্যর্থ গণনার কারণে কারাগারে বন্দি হওয়া-তক সমস্ত বৃত্তান্তই সবিস্তারে জানালেন। শেষে গোপালের হাত দু'টি ধরে বললেন, 'পারবে গোপাল এই সমস্যা থেকে আমাকে উদ্ধার করতে? নিরপরাধ জ্যোতিষীদের বাঁচাতে — যাঁরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নবাবের দরবারে গিয়েছিলেন?'

গোপাল মহারাজকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'এ আর এমন কি কঠিন কাজ। আমি সহজেই নবাবকে খুশি করে নবদ্বীপের জ্যোতিষীদের কারাগার থেকে মুক্ত করে আনব।'

—'যদি পার তবে আমার তরফ থেকে দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে পুরস্কার দেব।'

পরদিন সকালে উঠে হাতে পালঙ্কের একটি পায়াকে চোদ্দ পর্দা লাল শালু দিয়ে ভালো করে জড়িয়ে, তসরের কাপড় পরে, গায়ে নামাবলি চাপিয়ে, মাথায় লম্বা নকল টিকি বাগিয়ে, খড়মের খটাং খট আওয়াজ তুলতে তুলতে কৃষ্ণনগর থেকে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে গোপাল রওনা দিলেন।

গোপালের সাজপোশাক দেখে প্রথম দর্শনেই নবাব মুগ্ধ। এমন দেখতে যাঁকে, তিনি মহাপণ্ডিত না হয়ে যান না। আর এহেন মহাপণ্ডিতই পারেন তাঁর প্রশ্নের সমাধান করতে।

গোপাল নবাবকে কুর্নিশ জানিয়ে বললেন, 'খোদাবন্দ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আমাকে আপনার দরবারে পাঠিয়েছেন।'

নবাব জানালেন, 'মহারাজ আগেও কয়েকজনকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা কোন কম্মের নয়। তাদের আমি আমার কারাগারে আটকে রেখেছি। তবে আপনাকে দেখে ভরসা হচ্ছে, আপনি বোধ হয় গণনা করে বলতে পারবেন, মাটির নীচে কি আছে। আজ আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত—অতিথিশালায় আহার-বিশ্রাম করুন। কাল সকালে দরবারে এসে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।'

নবাবের অনুমতি পেয়ে গোপাল সেদিনের মতো বিশ্রাম নিতে অতিথিশালায় গেলেন।

পরদিন সকালে যথাসময়ে আবার তিনি নবাবের দরবারে হাজির হয়ে চোদ্দ পর্দায় জড়ানো খট্টাঙ্গ পুরাণের কয়েকটি পর্দা সরিয়ে বললেন, 'খোদাবন্দ, আমার এই খট্টাঙ্গ পুরাণ হল অষ্টবিংশতি পুরাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ। এতে লেখা আছে : সর্বশাস্ত্রসারম্ ইদং খট্টাঙ্গ পুরাণম্। হিন্দু পণ্ডিতা ন কদাপি শক্যং ভূতলগণনম্।।

কৌতূহলী নবাব শুধালেন গোপালকে, 'পণ্ডিতমশাই, আপনার এই শ্লোকের অর্থ কি?'

গোপাল গম্ভীর গলায় জানালেন, 'সকল শাস্ত্রের সার এই খট্টাঙ্গ পুরাণ। হিন্দু পণ্ডিতগণের পক্ষে মাটির নীচে কি আছে তা গণনা করা সম্ভব নয়। হুজুর, আপনি বিনাদোষে হিন্দু পণ্ডিতদের কারাগারে বন্দি করে কষ্ট দিচ্ছেন।'

নবাবের কৌতূহল গোপালের বক্তব্যে আরো বেড়ে যায়। তিনি গোপালের কাছে জানতে চান, 'পণ্ডিতমশাই, হিন্দু পণ্ডিতদের পক্ষে কেন মাটির নীচে কি কি আছে তা বলা অসম্ভব?'

গোপাল তখন শালু-জড়ানো সেই খট্টাঙ্গ পুরাণের আরো কয়েকটি পর্দা সরিয়ে জানালেন 'এই পুরানে আপনার প্রশ্নের জবাবও লেখা আছে : যদা হিন্দু পণ্ডিতা মরিষ্যন্তি তদা তেষাং চিতাং প্রজ্জলন্তি, তে তদা ঊর্ধ্বলোকাং গমিষ্যন্তি। হিন্দু পণ্ডিতা তদা পৃথিবী তথা ঊর্ধ্বলোকং গণনং শক্নোতি।'

নবাব গোপালকে আবার সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে বললেন। টিকি নেড়ে, মুচকি হেসে গোপাল বলতে লাগলেন, 'খোদাবন্দ, এ-শ্লোকের অর্থ অতি সহজ। হিন্দুদের মৃত্যুর পর চিতায় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সেই ধোঁয়া আকাশে উঠে যায়। অতএব হিন্দু পণ্ডিতরা কেবল পৃথিবী এবং ঊর্ধ্বলোক-বিষয়ে গণনা করতে পারেন। যেহেতু মৃত্যুর পর তাঁদের মাটির নীচে কবর দেওয়া হয় না, তাই তাঁদের পক্ষে মাটির নীচে কি আছে তা বলাও সম্ভবপর নয়। অতএব হুজুর, আপনি হিন্দু পণ্ডিতদের কারাগার থেকে মুক্ত করে দিন।'

গোপালের মুখে খট্টাঙ্গ পুরাণের এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনে নবাব তখন মাথা

চুলকোতে লাগলেন, তারপর হার স্বীকার করে বললেন, 'হিন্দু পণ্ডিতদের এভাবে আটকে রাখা মোটেই উচিত হয়নি, আমি এখুনি ওঁদের মুক্ত করার হুকুম দিচ্ছি। কিন্তু পণ্ডিতমশাই, আপনার পুরাণে যখন এত কথা লেখা আছে, তখন মাটির নীচে কি আছে তা বলার লোকদের বিষয়েও নিশ্চয় হদিস আছে?'

নবাবের প্রশ্ন শুনে গোপাল খট্টাঙ্গ পুরাণের আরও কয়েকটি পর্দা সরিয়ে বললেন, 'খোদাবন্দ, সে-নির্দেশও এখানে স্পষ্ট লেখা আছে — যবনং বা ম্লেচ্ছং যদা মরিষ্যন্তি, কবরং তে তদা গচ্ছন্তি, তদা তে শক্যং ভূতলগণনম্। অর্থাৎ যবন বা ম্লেচ্ছ পণ্ডিতদের মৃত্যুর পর কবর দেওয়া হয়। অতএব তাঁরাই শুধু মাটির নীচে কি আছে, গণনা করতে পারেন।'

গোপালের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনে নবাব খুব খুশি হলেন এবং তাঁকে প্রচুর আশরফি বকশিস দিয়ে সসম্মানে বিদায় জানালেন।

গোপাল নবাবের কাছে পাওয়া পুরস্কারের অর্থ আর মহামূল্যবান খট্টাঙ্গপুরাণটি সঙ্গে নিয়ে ফিরতি-পথে সোজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গিয়ে হাজির হলেন। অবশ্য তার আগেই নবদ্বীপের জ্যোতিষীরা সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন।

কৌতূহলী মহাবাজ গোপালকে শুধালেন, 'গোপাল, তুমি এই অসাধ্যসাধন করলে কি করে?'

গোপাল তখন তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবই সম্ভব হয়েছে এই খট্টাঙ্গ পুরাণের কল্যাণে।'

'খট্টাঙ্গপুরাণ?'—মহারাজ যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

গোপাল এবার তাঁর খট্টাঙ্গ পুরাণের চোদ্দ পর্দা লাল শালু সরিয়ে দিতেই খাটের ভাঙা পায়া খানি বেরিয়ে পড়ল। গোপালের কাছে খট্টাঙ্গ পুরাণের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মহারাজ তো হেসেই খুন। তিনি তখন তাঁর প্রতিশ্রুতিমত গোপালকে দু'হাজাব স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন। এ-কাহিনির টাইপ—৯২২ : খট্টাঙ্গ পুরাণ।

এবার শোনাই গোপালের সেই মিষ্টির দোকান থেকে বিনি-পয়সায় মিষ্টি খাওয়ার রঙ্গ কথাটি :

এক দুপুরে বন্ধুকে নিয়ে গোপাল এক মিষ্টির দোকানে ঢুকেছেন। দু'জনেরই খিদে পেয়েছিল খুব। তাই পেট ভরে দু'জনে রসগোল্লা খেলেন। দিচ্ছিল একটি অল্পবয়েসি ছোকরা। খাওয়া শেষ হলে ছোকরাটি হিসেব করে গোপালের কাছে রসগোল্লার দাম বুঝে নিয়ে চাইল। গোপাল বা তাঁর বন্ধুর পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। তবু গোপাল বিচলিত নন। তিনি হাসতে হাসতে ছোকরাটিকে বললেন, 'আমার নাম মাছি। রসগোল্লা খেতে আমার টাকা-পয়সা লাগে না, বিশ্বাস না হয় মালিকের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনে নাও।'

ছোকরাটি যাকে বলে নাছোড়বান্দা। সে গোপালকে সঙ্গে নিয়ে মালিকের কাছে

হাজির। মালিক তখন ভাত খেয়ে গদিতে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। ছোকরাটি তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'মাছি মিষ্টি খেয়েছে, দাম দিতে চাইছে না।'

বিশ্রামে ব্যাঘাত হওয়ায় মালিক বিরক্ত হয়েই বললেন, 'মাছি তো মিষ্টি খাবেই, সে আবার দাম দেবে কি?'

গোপাল আর তাঁর বন্ধু তখন ছোকরাটির দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

রকমফেরে এই কাহিনিতেই দেখা যায় 'রসগোল্লায় মাছি পড়েছে' অথবা 'রসগোল্লা পচা' এই অজুহাতে গোপাল মালিককে দাম দিতে অস্বীকার করেন। এ-কাহিনির টাইপ—১৫৪১ : 'মিষ্টি পচা' খেয়েদেয়ে ক্রেতা এই অজুহাতে দাম দেয় না।

গোপালকে বুদ্ধির দৌড়ে হারাতে নানাভাবে চেষ্টা করেও বিফলমনোরথ মহারাজ এবার শরণ নিয়েছেন তাঁর রাজসভার আর এক উজ্জ্বল হাস্যরসিক সভাসদ হাস্যরামের। এক অভিনব রঙ্গ-লড়াইয়ের আয়োজন করেছেন মহারাজ তাঁর রাজসভায়। লড়াইয়ে একদিকে অংশ নিচ্ছেন গোপাল, অন্যদিকে হাস্যরাম। মহরাজের অনুরোধে গোপালই আসরের সূত্রপাত করলেন অনেকটা কবি-লড়াইয়ের ঢঙে : 'মহারাজ আজ আমি মামাবাড়ির গল্প শোনাব আপনাদের। বিশ্বাস করুন চাই না করুন, মামাবাড়ি-র ব্যাপার-স্যাপার ছিল মহা-মহা। একটা কড়াই ছিল তাঁদের একটা দিঘির মত বিশাল।'

গোপালের কথা শুনে সভার সকলের —- এমন কি স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রেরও চক্ষু চড়ক গাছ। তিনি অবাক গলায় গোপালকে শুধান, 'অমন বড় কড়াই যাঁদের, রান্নাঘরটি তাঁদের না জানি তাহলে কত বড়?'

গোপাল একটু ভেবে নিয়ে ফের বলতে লাগলেন, 'মহারাজ, মামাবাড়ির রান্নাঘরটি তেমন কিছু বড় ছিল না, আর পাঁচজনের মতই অতি সাধারণ আয়তনের।'

—'তবে সেই কড়াইয়ে রান্না হত কেমন করে?'

—'কড়াইতে রান্না করার কথা তো আমি বলিনি। ওটা মামাবাড়ির বিশাল উঠানে পাতাই থাকত। বর্ষার জলে টইটম্বুর সেই কড়াইয়ের পাড়ে বসে মেয়েরা বাসন মাজত, ছেলেরা স্নান করত, বিকেলের দিকে মামারা নৌকাবিহার করতেন, রাতে বাইজি এনে বসানো হত মজলিস।'

গোপালের মামাবাড়ি-বৃত্তান্তের শেষে এবার হাস্যরামের পালা। তিনি শুরু করলেন এইভাবে : 'মহারাজ আমার মামাবাড়ির দেশেও সবকিছু মহা-মহা। একবার হয়েছে কি, মামাবাড়ির দেশে নদীতে স্নান করতে গিয়ে আমি বর্শা গেঁথে একটা পেল্লাই রুই মাছ ধরলাম।'

কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ফোঁড়ন কাটলেন, 'মাছটা ঠিক কত বড় ছিল হাস্যরাম?'

—'জাহাজের মত বিশাল।'

—'অত বড় মাছ রান্না করলে কোথায়?'

—'কেন, গোপালের মামাবাড়ির সেই দিঘি-সমান কড়াইয়ে।'

প্রবল হাস্যধ্বনির মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঐ রঙ্গসভায় হাস্যরামকেই জয়ী সাব্যস্ত করলেন। এ-কাহিনির টাইপ—১৯২০ : মিথ্যে কথা বলার প্রতিযোগিতা।

এই কাহিনির প্রতিতুলনায় বাংলার লোককথা-ভাণ্ডার থেকে একটি রঙ্গকথা এখানে পেশ করা যেতে পারে। এটি হল দুই রাখালের বাগাড়ম্বরের কাহিনি:

দুই রাখাল গাছতলায় বসে গল্প জুড়েছে। একজন তার মনিব সম্পর্কে বলছে, 'আমার কত্তাবাবার গোয়ালে এত গরু ছিল যে দশজন লোক ভোর থেকে গরুর ঘন্টি খুলতে আরম্ভ করত, শেষ হত সেই সন্ধেবেলা।'

অন্য রাখাল তাই না শুনে বলে ওঠে, 'আর আমার কত্তাবাবার একটা এমন উঁচু বাঁশ ছিল যে কখনো বৃষ্টি না হলে, সেই বাঁশ দিয়ে মেঘে খোঁচা দিলে, মেঘ থেকে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ত।'

প্রথম রাখাল দ্বিতীয়জনের কথা শুনে তাকে তেড়ে এসে বলতে থাকে, 'মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পেলি না? তোর কত্তাবাবার যদি অত উঁচু বাঁশই ছিল, তবে তা রাখা হত কোথায়?'

দ্বিতীয় রাখাল অম্লানবদনে জবাব দেয়, 'কেন? তোর কত্তাবাবার গোয়ালে।'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এ-কাহিনিটির টাইপও আগেরটির মতই—১৯২০ : মিথ্যে কথা বলার প্রতিযোগিতা।

এবার শোনাই গোপালের সেই চিঠি লেখার রঙ্গকথাটি :

গোপালের বাড়ির আশাপাশে বহু নিরক্ষর মানুষের বাস। রাজদরবারে গোপালের যাতায়াত আছে জেনে তারা গোপালকে দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলেই মনে করে। তাদেরই একজন এসে গোপালকে ধরেছে, 'বহুকাল পরিবারের কোন খবর পাই না, দয়া করে আপনি আমার স্ত্রী-র কাছে একটা চিঠি লিখে দিন।'

গোপাল চিঠি লিখবেন কি? তিনিও তো নিরক্ষর। অথচ বাইরে সকলের কাছে তা প্রকাশ করা যায় না। গোপাল প্রতিবেশীর প্রস্তাব শুনেই আঁৎকে উঠে 'না' করে দিলেন।

প্রতিবেশী অবাক হয়ে শুধায়, 'কেন চিঠি লিখে দেবেন না?'

গোপালের জলদি জবাব, 'পায়ে ব্যথা'।

—'পায়ে ব্যথার সঙ্গে লেখার কি সম্পর্ক?'

—'আছে-আছে ভায়া, আমার চিঠি লেখার বৈশিষ্ট্যই হল আমি ছাড়া সেই চিঠি অন্য কেউ পড়তে পারেনা — তাই আমাকে গিয়েই পড়ে শুনিয়ে আসতে হয়। পায়ে ব্যথা, অতএব হাঁটতে পারব না। আমি হাঁটতে না পারলে আমার চিঠির মর্মোদ্ধার করবে কে?'

এই একই কাহিনি ভাষান্তরে গৃহীত হয়েছে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের রঙ্গকথায়ও। তবে যেহেতু মোল্লা ছিলেন সুপণ্ডিত ধর্মবেত্তা, তাই তাঁর রসিকতার মধ্যে চরিত্রের নম্রতাই প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে গোপালের রসিকতায় ফুটে উঠেছে চাতুর্য ও প্রতারণা। অতএব গোপালের কাহিনিটির টাইপ—১৫৩৯ : চাতুর্য ও প্রতারণা, কিন্তু মোল্লার রঙ্গকথাটির মোটিফ—এল ২১০: নম্রতা। গোপালের রঙ্গকথায় যেসব মোটিফ আছে, তা হল — কে ৫১০ : মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে যাওয়া, এক্স ৯০০: মিথ্যে কথার মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি ইত্যাদি। দু'টি কাহিনিতেই সাধারণভাবে রসিকতার অভিপ্রায় আছে, যার মোটিফ এক্স—১০ : ব্যঙ্গ ও ঠাট্টা।

এবার শোনাই কয়েকজন সৈনিকের বীরত্বের কথা। একটা তালগাছের তলায় নেশায় বুঁদ হয়ে তারা অতীতের স্মৃতিচারণায় মগ্ন, গোপাল কিছু দূরে বসে আছেন শ্রোতা হিসেবে :

এক সৈনিক নেশার ঘোরে বলল, 'একদিন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে তলোয়ার নিয়ে এত জোরে ছুটে গিয়েছিলাম যে তা দেখে সব শত্রু প্রাণের ভয়ে পড়ি-কি-মরি ছুটে পালিয়েছিল।'

আর একজন তখন বলে ওঠে, 'আমি একাই একবার ডাঁয়ে-বাঁয়ে তলোয়ার চালিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করেছিলাম।'

তৃতীয়জনই বা চুপ থাকে কেন? সে বলে উঠল, 'আমিও একবার যুদ্ধক্ষেত্রে এক সৈনিকের পা কেটে দিয়েছিলাম।'

অন্যরা অবাক হয়ে তাকে প্রশ্ন করল, 'সেকি? গলা না কেটে পা কেটেছিলে?'

সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে গেল, 'গলা আর কাটব কি করে? সেটা তো আগেই কেউ কেটে রেখেছিল।'

মোল্লার রঙ্গকথায়ও এই কাহিনিটি আছে, তবে সেখানে তিনি গোপালের মত বাইরের শ্রোতামাত্র নন, বক্তাদেরই একজন, এবং আড্ডার স্থানও সেখানে তালতলা নয়, একটি সরাইখানা।

কাহিনিটির টাইপ—১৬৪০ : সেনা-মারা বীর।

এবার এমন একটি রঙ্গকথা শোনাব যা গোপাল বলেছেন, বলেছেন বীরবল এবং মোল্লা নাসিরুদ্দিনও, তবে স্থানান্তর, পাত্রান্তরজনিত কারণে কাহিনিটিতে সামান্য অভিনবত্বের ছোঁয়া লেগেছে, যা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না।

গোপালকে দিয়েই শুরু করা যাক :

ধড়িবাজ গোপালকে জব্দ করার জন্য মহারাজ একদিন তাঁকে সভায় ডেকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা গোপাল, বলতো আকাশে কত তারা আছে?'

গোপালের চট জলদি জবাব ছিল, 'মহারাজ, আপনার মাথায় যত চুল আছে, আকাশের তারার সংখ্যাও ঠিক ততই।'

উত্তর শুনে মহারাজ নিজেই জব্দ হলেন।

এবার আসি বীরবলের রঙ্গকথায় :

বাদশা আকবর বীরবলকে ডেকে জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা বীরবল, বল তো দিল্লি শহরে ঠিক কত সংখ্যক কাক আছে?'

যে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই এই অদ্ভুত ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বিচলিত বোধ করা স্বাভাবিক, কিন্তু বীরবল তো সাধারণ মানুষ নন। তিনি অতএব সহজেই জানালেন 'জাঁহাপনা, দিল্লি শহরে মোট ন'লক্ষ ন'হাজার ন'শো নিরানব্বইটা কাক আছে। আপনি নিজেই পরখ করে নিতে পারেন। যদি দেখেন গণনায় কিছু বেশি কাক আছে, তবে বুঝবেন ওরা মফস্বল থেকে শহরে বন্ধুদের কাছে বেড়াতে এসেছে। যদি দেখেন আমার বলা সংখ্যা থেকে কিছু কম হয়ে যাচ্ছে, তবে জানবেন শহুরে কাকেরা মফস্বলের বন্ধুদের কাছে আড্ডা দিতে গেছে।'

বীরবলের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর শুনে আকবরের গলায় আর বাক্যি সরে না।

সবশেষে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের রঙ্গকথাটি শোনাই :

বাদশা কয়েকটি রাজ্যের পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কিছু প্রশ্নের উত্তর জানাই তাঁর আমন্ত্রণের কারণ।

বাদশার প্রথম প্রশ্ন, 'পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু কোথায়?'

বিভিন্ন রাজ্যের পণ্ডিতেরা প্রশ্নটি শুনলেন বটে, কিন্তু কেউই উত্তর দিতে পারলেন না। তখন মোল্লা নাসিরুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। দূরে বাঁধা তাঁর বাহন গাধাটিকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ গাধাটার পেছেনের দিকের ডান পায়ের তলার জমিটাই হল পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু।'

'ডাহা মিথ্যে কথা হুজুর, আমরা ওর কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না'—পণ্ডিতেরা সকলে মিলে মোল্লার কথাকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন।

মোল্লা কিন্তু একটুও ঘাবড়ালেন না। তিনি মুচকি হেসে উপস্থিত পণ্ডিতদের উদ্দেশে বললেন, 'বেশ তো বিশ্বাস না হয়, আপনারা নিজে গিয়েই মেপে দেখে নিন।'

পণ্ডিতেরা হতবাক।

বাদশার দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'আকাশে তারার সংখ্যা কত?'

এবারও পণ্ডিতেরা নীরব। আবারও মোল্লা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমাদের বাদশার দাড়িতে যত চুল আছে, আকাশে তারার সংখ্যা ঠিক তার দ্বিগুণ। একটিও কম বা বেশি নয়।'

বাদশা মোল্লার জবাব শুনে রীতিমত চটে গেলেন। বললেন, 'এ হতেই পারেনা মোল্লা, বল তো আমার দাড়ির চুল সংখ্যায় কত?'

মোল্লা আবার তাঁর গাধাটিকে দেখিয়ে বললেন, 'হুজুর, আমার ঐ-গাধাটার লেজে যত চুল আছে, আপনার দাড়িতেও ঠিক তত চুলই আছে।'

—'বেয়াদপ-বুরবাক, যত সব আজে-বাজে কথা।'

—'হুজুর অযথা রাগ করবেন না, আপনার সভায় তো এত পণ্ডিত আছেন, ওঁদের লাগিয়ে দিন না আপনার দাড়ির চুল আর আমার গাধার লেজের চুল গণনায়। তাহলেই বুঝতে পারবেন আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি।'

এবার বাদশার মুখে আর রা-টি নেই।

তিনটি কাহিনিরই টাইপ—৯২১ : রাজা ও চাষার ছেলে। রাজার প্রশ্ন, আকাশে কত তারা, নদীতে কত ঢেউ ইত্যাদি এবং চাষার ছেলে বুদ্ধিদীপ্ত জবাব।

সবশেষে শোনাব একটি বিচারকাহিনি — এখানে গোপাল, বীরবল এবং প্রতিবেশী উত্তর-পূর্ব ভারতের রামো পাইলিনো জনগোষ্ঠীর লোককথা হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে বলি গোপালের বিচার কাহিনিটি :

একটি ছোট্ট ছেলে। ছেলেটির দাবিদার দুই নারী। দু'জনেই দাবি জানাচ্ছে, সন্তানটি তার বচসা চলতে থাকায় চারধারে লোক জমে যায়। তারা বিবাদ-নিষ্পত্তির জন্য বাচ্চা আর নারী দু'টিকে নিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে হাজির করে। কৃষ্ণচন্দ্র দু'টি নারীর একজনকে জিজ্ঞেস করেন, 'ছেলেটি কার?' নারীটি সঙ্গে সঙ্গে জানায়, 'এটা আমার ছেলে, হুজুর।'

—'কোন প্রমাণ দিতে পার তোমার দাবির সমর্থনে?'

—'ঐ দেখুন হুজুর ছেলেটা মা-মা বলে আমার দিকে তাকিয়ে কাঁদছে।'

সত্যিই সে-সময়ে ছেলেটা মা-মা রবে কাঁদছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র এবার অপর নারীটিকে শুধান, 'বল, তোমার দাবির পক্ষে কি সবুদ আছে?' দ্বিতীয় নারীটিও প্রথমটির মত একই কথা বলে। তখনও ছেলেটি মা-মা বলে অঝোরে কেঁদে চলেছে, এবং থেকে থেকে দ্বিতীয়া নারীটির দিকে চাইছে।

মহারাজ খুবই বিপাকে পড়লেন। কৃষ্ণচন্দ্র এবার জানতে চাইলেন ছেলেটির বাবা বা অন্য কোন নিকটাত্মীয় কেউ আছে কি না। দু'টি নারীই প্রায় একই ভাষায় জানাল যে তারা বাইরে থেকে এসেছে, এখানে কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। উত্তর শুনে মহারাজ অকূল পাথারে। পাশে বসে থাকা-গোপালের দিকে তিনি অসহায় চোখে তাকালেন। গোপাল তৎক্ষণাৎ মহারাজকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আপনি একটুও চিন্তা করবেন না মহারাজ, আমি এখুনি এ-সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি।'

গোপাল এর পর জল্লাদকে ডেকে বললেন, 'এই বাচ্চাটাকে সমান দুই ভাগে কেটে দু'জনকে ভাগ করে দাও।'

গোপালের আদেশে জল্লাদ সত্যিই ছেলেটিকে কাটতে উদ্যত হলে, প্রথম নারীটি কোন আপত্তি জানাল না। কিন্তু দ্বিতীয় নারীটি গোপালের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে,

কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হুজুর, আমার দাবি আমি তুলে নিচ্ছি, বাচ্চাটাকে আমার চোখের সামনে কাটাছেঁড়া করবেন না।'

গোপাল তখন হাসতে হাসতে ছেলেটিকে দ্বিতীয় নারীর কোলে তুলে দিয়ে, কৃষ্ণচন্দ্রকে বললেন, 'মহারাজ, ইনিই হলেন ছেলেটির প্রকৃত মা।'

মিথ্যে বলার অভিযোগে প্রথম নারীটিকে মহারাজ তখন কারাগারে পাঠালেন।

এ-কাহিনির টাইপ—৯২৬ : ছেলে কেটে সমানভাগে ভাগ করে, কার ছেলে বিচার।

এবার আসি বীরবলের বিচারকাহিনিতে। এটি অবশ্য সন্তান-সংক্রান্ত নয়, বৃক্ষ-সংক্রান্ত :

বাদশা আকবরের দরবারে শঙ্কর নামে এক ব্যক্তি তাঁর প্রতিবেশী দাত্তুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। শঙ্করের বাড়ির সীমানায় বেড়ে-ওঠা একটা আমগাছকে কেন্দ্র করে এই অভিযোগ। শঙ্করের বক্তব্য অনুসারে আমগাছটি তিনি নিজেই পুঁতেছিলেন। এখন সেটি বেশ বড় হয়ে উঠেছে। গাছে এখন প্রচুর আম ফলে। প্রতিবেশী দাত্তু সেই আমগাছের ফল একাই ভোগ করছেন। তিনি বলে বেড়াচ্ছেন যে আমগাছটি নাকি তিনিই পুঁতেছিলেন। শঙ্কর তাই ন্যায়বিচারের আশায় বাদশার দরবারে হাজির হয়েছেন।

বিব্রত বাদশা সমস্যাটি সমাধানের ভার দিলেন সভাসদ বীরবলের ওপর।

বীরবল দাত্তুকে তলব করলেন এবং গাছটির মালিকানা-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলেন। দাত্তু শপথ করে বললেন, 'হুজুর, গাছটি আমার, আমিই ওটা পুঁতেছিলাম।'

বীরবল তখন ওঁদের দু'জনকেই বাড়ি ফিরে যেতে অনুমতি দিলেন। বললেন, 'প্রয়োজনে আপনাদের আবারও ডাকতে হতে পারে।'

শঙ্কর আর দাত্তু দরবার ছেড়ে চলে গেলে, বীরবল তাঁর এক বিশ্বাসী চৌকিদারকে ডেকে বললেন, 'তুমি আজ দাত্তুর বাড়ির কাছে যাবে, ওর বাড়ির সীমানাব কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলবে — দেখ দেখ চোরেরা গাছ থেকে আম তুলে নিয়ে পালাচ্ছে।'

আর এক বিশ্বাসী চৌকিদারকে ডেকে বললেন বীরবল, 'তুমিও আজ ওর সঙ্গে দাত্তুর বাড়ি যাবে এবং বাইরে থেকে কান পেতে শোনার চেষ্টা করবে দাত্তুর বাড়ির লোকেরা কি বলছে।'

বীরবল চৌকিদার দু'জনকে শঙ্করের বাড়িতেও একই ঘটনার পুনরাবর্তন করতে বললেন।

সেই রাতেই চৌকিদার দু'জন দাত্তুর বাড়ির কাছে এল। একজন বাড়ির পাশেই এক জায়গায় গা-ঢাকা দিল। অন্যজন তখন চিৎকার করে বলে উঠল, 'দেখ দেখ, চোরেরা গাছ থেকে আম পেড়ে নিয়ে পালাচ্ছে।'

এই চিৎকার শুনেও দাত্তু কিন্তু বাড়ির বাইরে এলেন না। অন্য চৌকিদারটি কান

পেতে শুনল, দাত্তু তাঁর স্ত্রীকে বলছেন, 'চোরেরা যত খুশি আম নিক, তাতে আমাদের কি এসে যায়, গাছটা তো আর সত্যিই আমাদের নয়, তাই আমাদের ও-বিষয়ে মাথা-ব্যথাও নেই।'

এরপর চৌকিদার দু'জন শঙ্করের বাড়ির কাছে গেল। এখানেও একজন চৌকিদার আগের মত 'চোর-চোর' বলে চিৎকার করল। শঙ্কর সেই ডাক শোনামাত্র লাঠি হাতে চোর ধরতে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু অন্ধকারে কাউকে দেখতে না পেয়ে, আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। স্ত্রীকে তিনি বললেন, 'দেখ এখন থেকে আমগাছটাকে শুধু প্রতিবেশীদের হাত থেকেই নয়, চোরেদের হাত থেকেও বাঁচাতে হবে। গাছটার ওপর আমার বিশেষ মায়া আছে, কেননা আমি নিজের হাতে ওটা পুঁতেছি।'

আড়াল থেকে চৌকিদার শঙ্করের স্ত্রীকে বলা সব কথাই শুনল এবং পরদিন বীরবলকে গিয়ে সবকিছুই জানাল।

বীরবল তখুনি শঙ্কর আর দাত্তুকে ফের তলব করলেন। ওঁরা দরবারে এলে, বীরবল বললেন, 'আমি এখনও সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি আমগাছটা আসলে কার। কেননা, আপনারা দু'জনেই দাবি করছেন যে গাছটি পুঁতেছেন। যাই হোক, এজন্য আমি মনস্থ করেছি যে গাছের আমগুলো তুলে সমান দু'ভাগে ভাগ করে আপনাদের দেব। এরপর গাছটাকে কেটে, কাঠও সমান দু'ভাগে ভাগ করে আপনাদের দেওয়া হবে। আপনারা কি আমার এ-প্রস্তাবে সায় দেবেন?'

দাত্তু সঙ্গে সঙ্গে সে-প্রস্তাবে রাজি হলেন, কিন্তু শঙ্করের সম্মতি মিলল না। তিনি বললেন, 'গাছটা কাটার চেয়ে ভালো হবে যদি আমি আম গাছটার অধিকার প্রতিবেশী দাত্তুকে দিয়ে দিই। দোহাই হুজুর, আপনি গাছটা কাটবেন না।'

বীরবল তখন শঙ্করকেই গাছটার মালিক বলে রায় দিলেন।

সবশেষে রামো-পাইলিনো জনগোষ্ঠীর বিচারকাহিনি :

এক গাঁয়ে এক বুড়ো থাকত। তার ছিল এক পুরুষ মিথুন। ঐ গাঁয়েই থাকত এক বুড়ি। তার ছিল এক মিথুনী। একবার বুড়োর মিথুন আর বুড়ির মিথুনী একসঙ্গে মাঠে চরতে গেল। তাইতে মিথুনী হল গর্ভবতী। বুড়ি তো তখন বেজায় খুশি। সে মিথুনীকে খাওয়াবার জন্য নিজেই বেরিয়ে পড়ত মাঠ থেকে ঘাস-পাতা আনতে।

ওদিকে বুড়োটা সুযোগ খুঁজছিল, কী করে বুড়ির মিথুনীটা বাগে আনা যায়। বুড়োর অদ্ভুত ধারণা, ওর মিথুনটাই যখন মিথুনীর পেটে বাচ্চা এনেছে তখন বাচ্চাটার দাবিদার ওই, বুড়ি নয়।

যাই হোক, একদিন বুড়ি যখন মিথুনীটার খাবার জোগাড় করবার জন্য বাইরে বেরিয়েছে, বুড়ো তখন চুপিচুপি মিথুনীটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওর নিজেরে বাড়িতে হাজির হল। আর কী আশ্চর্য, বুড়োর বাড়িতে এসেই মিথুনীটা বাচ্চা বিয়ালো।

বুড়ো খুব তাড়াতাড়ি মিথুনীটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে আবার রেখে এল বুড়ির বাড়িতে।

বুড়ি কিছু জানতেও পারল না। বুড়ো সবাইকে ডেকে ডেকে বলে, 'দেখ দেখ, আমার মিথুনের কেমন সুন্দর বাচ্চা হয়েছে।'

বুড়িকেও বুড়ো একই কথা শোনায়। বুড়ি তাকে বলে, 'আমার মিথুনীরও শিগগিরি বাচ্চা হবে।'

ওদিকে, দিনের পর মাস যায়। মিথুনীর পেট আস্তে আস্তে চুপসে যেতে থাকে। বুড়ির মনে তখন সন্দেহ জাগল, নিশ্চয় কিছু একটা গড়বড় হয়েছে।

একদিন একজন গ্রামবাসী বুড়ির সন্দেহকে উশকে দিয়ে বলল, 'বুড়োই তোমার মিথুনীর বাচ্চা চুরি করে নিয়ে গেছে। মিথুনের কখনও কি বাচ্চা হয়?'

বুড়ি গ্রামবাসীটির কথায় সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক কথা বলেছ, আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম।'

শেষ পর্যন্ত বুড়ি রাজার কাছে বুড়োর বিরুদ্ধে মিথুনীর বাচ্চা চুরি নিয়ে নালিশ ঠুকে দিল।

রাজা বুড়োকে দরবারে তলব করলেন। বুড়ো আসতেই রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাচ্চাটা কার?'

—'কার আবার? আমার।'

—'সাক্ষী আছে?'

—'গাঁয়ের সবাই সাক্ষী। সকলেই দেখেছে।'

রাজা এবার বুড়িকে বললেন, 'তোমার কোন সাক্ষী আছে?'

বুড়ি অনেক ভেবে, শেষে বলল, 'আমার সাক্ষী খুঁটি। খুঁটিতেই তো মিথুনীটা বাঁধা থাকে।'

খুঁটি সাক্ষী শুনে রাজা খুবই বিরক্ত হলেন। তিনি রেগে গিয়ে বুড়িকে দরবার থেকে বের করে দিলেন।

বুড়ি তো মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদাতে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। পথে এক কুকুরের সঙ্গে তার দেখা হল। কুকুর এগিয়ে এসে বুড়িকে শুধায়, 'বুড়িমা তুমি কাঁদছো কেন?'

বুড়ি কুকুরকে তার দুঃখের কথা বলে। কুকুর সব কিছু শুনে বুড়িকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'আবার যাও রাজার কাছে। গিয়ে বল, তোমার সাক্ষী এক কুকুর।'

বুড়ি ফিরে এসে রাজার কাছে তার নতুন সাক্ষী কুকুরের কথা বলল। রাজা বুড়িকে বললেন, 'বেশ তো, কাল সকালে তুমি কুকুরটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।'

পরের দিন সকালে বুড়ি দরবারে ঠিকই এল, কিন্তু কুকুরের কোন পাত্তা নেই। অথচ বুড়িকে সে কথা দিয়েছে দরবারে আসবেই।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রাজা বিরক্ত হয়ে বুড়িকে বললেন, 'বুড়ি তোমার সাক্ষী সেই কুকুর কই?'

বুড়ি ব্যাকুল চোখে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। রাজার এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। রাজা বুড়িকে বললেন, 'বুড়ি তুমি মিথ্যে বলেছ, রাজার কাছে মিথ্যে বলার শাস্তি তোমার জানা আছে কি?'

এই সময় কুকুর হাঁপাতে হাঁপাতে সভায় হাজির। রাজা তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত দেরি হল কেন?'

কুকুর জলদি জবাব দিল, 'নিয়াং নদীতে আগুন জ্বলছিল দাউ-দাউ করে। সেই আগুন নিবিয়ে আসতেই দেরি হয়েছে।'

রাজা কুকুরের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'সে কি! নদীতে আবার আগুন জ্বলে নাকি?'

কুকুর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'রাজামশাই মিথুনের পেট থেকে যদি বাচ্চা হতে পারে তবে নদীতে আগুন জ্বলবে না কেন?'

রাজা তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে বুড়িকে মিথুনীর বাচ্চা ফেরৎ দিলেন। মিথ্যে বলার জন্য বুড়োকে কারারুদ্ধ করলেন। ঠিক বিচারের হদিস দেওয়ার জন্য কুকুরটিকে যথোচিত পুরস্কারও দিলেন।

একটি কাহিনির আধারে আসলে এটি দু'টি কাহিনি। প্রথম কাহিনিটি মিথুনী চুরি পর্যন্ত, যার টাইপ—১৫৩০ : চাতুর্য ও প্রতারণা। পরবর্তী অংশের টাইপ—১৯২০ : মিথ্যে বলার প্রতিযোগিতা।

আমার কথাটি ফুরিয়েছে, তবু নটে গাছটি এখনও মুড়োয় নি। বিচক্ষণ পাঠকের নিশ্চয় নজর এড়িয়ে যায়নি যে এখানে গোপালের নির্বাচিত রঙ্গকথাগুলির অধিকাংশেরই টাইপ নির্ণয় সম্ভব হয়েছে, ব্যতিক্রম কয়েকটিতে মোটিফ উল্লেখ করা গেছে। লোককথার টাইপ নির্ণয় কেবল সেইসব কাহিনিতেই সম্ভব যেসব কাহিনিতে নিটোল গল্প আছে। শুধু তাই-ই নয়, সেই নিটোল গল্পের মধ্যে পরম্পরাগত ঐতিহ্যও সেখানে আবশ্যিক। গোপালের ওপর যে লোকসমাজের প্রভাব প্রভূত তা প্রস্তাবনায় বলার চেষ্টা করেছি। গোপাল তাঁর রঙ্গকথার অনেক কাহিনিতেই লোককথাকে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন। পাঠক লক্ষ্য করুন, গোপালের রঙ্গকথাগুলির কিছু অংশের সঙ্গে বীরবল ও মোল্লা নাসিরুদ্দিনের — এমনকি এ-বাংলার অখ্যাত ভাঁড় মহেশ দাসের রঙ্গ কথাগুলির আশ্চর্য সাদৃশ্য!

আমার বিবেচনায়, এ-সাদৃশ্যের পেছনে একটি কারণ হতে পারে এই, তুরস্কের মোল্লা কিংবা দিল্লির বীরবল অথবা নদিয়ার গোপালের নামে চলে আসা কাহিনি একই লোককথার কাছে ঋণী। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যুক্ত করে এই ধরনের কাহিনিসৃষ্টি বস্তুত লোককথারই এক বৈশিষ্ট্য। এর কবল থেকেও আগেও বলেছি, ওদেশের শেক্সপিয়র-বার্নাড শ' যেমন নিজেদের রক্ষা করতে পারেননি, তেমনি এদেশের কালিদাস-বিদ্যাসাগরও!

বাংলা রসসাহিত্য : লোকরঙ্গকথা

একটা সময় ছিল যখন মানুষ লিখতে পড়তে জানত না। তখন সে সাপুড়ে শিকারিদের বীরত্বের কথা, ভূতপ্রেতের উপদ্রবের কথা, গ্রহ-নক্ষত্রের রহস্যকথা ইত্যাদি তার মতো করে প্রতিবেশীকে শুনিয়ে নিজে হালকা বোধ করত। যেহেতু তখনকার মানুষ এখনকার মতো বিজ্ঞানসচেতন ছিল না, তাই কার্য-কারণ সম্পর্ক যথাযথ বুঝতে না পারায় প্রকৃতির অনেক ঘটনাই তার চোখে সেদিন রহস্যময় ঠেকত। সুতরাং কি করে বৃষ্টি হয় থেকে কিভাবে চাষ হয় —যেমন তার গল্পকথার বিষয় হয়ে উঠত, তেমনি ভূতপ্রেতের বীভৎস কার্যকলাপ অথবা শক্তিশালী মানুষের অসামান্য বীরত্বের কথাও সহজেই ঠাঁই পেত সে গল্পকথায়; আর এসব কথায় যদি রঙ্গরসের স্পর্শ থাকত তবে তো কথাই নেই—মুখে-মুখে অতি দ্রুত অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে পড়ত তা। সে সময় সাহিত্য মানেই ছিল শুধু লোকসাহিত্য, কথা মানে শুধুই লোককথা।

এরপর একটা সময় এল যখন মানুষ লেখাপড়া শিখতে শুরু করল। যারা শিক্ষিত হয়ে উঠল তাদের কাঁধে তখন চাপল একটা বাড়তি দায়িত্ব। এটা হল, শোনা কথাগুলিকে লিপিবদ্ধ করা এবং সেই লিপিবদ্ধ কথারূপকে আবার চাহিদা মতো শ্রোতাদের শোনানো। ব্যাপারটা বস্তুত তেমন অভিনব কিছু ছিল না। হয়তো কথা শোনার ফাঁকে লিপিকরের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে লিপিবদ্ধকরণে কিছু পরিবর্তন ঘটে যেত। মূল পাঠের সঙ্গে সে প্রভেদ যৎসামান্যই। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবেই এই দ্বিতীয় পাঠটি অভিনব হয়ে উঠল, যখন কথাকাররা স্মৃতিতে ধরে রাখা প্রচলিত লোককথাকে সময়ের উপযোগী করে ভেঙে-গড়ে তাকে আধুনিক জীবনের নানাবিধ জটিলতার বাহন করে তুললেন। সেই শুরু হল আধুনিক সাহিত্যের জয়যাত্রা। সময়টা খ্রিস্টীয় উনিশ শতাব্দের একেবারে গোড়ার দিক।

জন্মলগ্ন থেকেই আধুনিক সাহিত্য আর লোকসাহিত্যের মধ্যে একটা মূলগত ফারাক চোখে পড়ল। আধুনিক সাহিত্য ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি, লোকসাহিত্য সমষ্টির তথা সমাজের। প্রথমটির ক্ষেত্রে স্রষ্টার ভূমিকা প্রধান, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে গৌণ। অবশ্য তলিয়ে দেখলে কোন ব্যক্তির সুখ-দুঃখবোধ আকাশকুসুম কিছু নয়, সমাজ থেকেই উঠে আসা। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি যেমন প্রবল এবং স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ, লোকসাহিত্যে তেমন কি? বস্তুত লোকসাহিত্যের স্রষ্টাদের নিয়ে আমরা আদৌ মাথা ঘামাই না। ঘামাবার দরকারও হয় না। কেউ হয়তো গোড়ায় একটি ছোট্ট কথা ফাঁদল। তা শুনে কোন শ্রোতা হয়তো কিছুটা রঙ চড়ালো তাতে। এভাবেই এ-মুখ থেকে সে-মুখ যেতে যেতে হ্রস্বায়তন কথাটি দীর্ঘতর হয়ে ওঠে। কঙ্কালের অঙ্গে লাগে মাংসের প্রলেপ।

এই মুহূর্তে তিন বন্ধুর হাড় খন্ডগুলিকে মন্ত্রবলে জোড়া দিয়ে সুন্দরী কন্যায় রূপান্তরিত করার সেই লোককথাটি (টাইপ—৪৭০ : প্রাণের বন্ধু) এক প্রতীকী তাৎপর্য নিয়ে হাজির হচ্ছে। লোককথার জন্মরহস্য লুকিয়ে আছে যেন ঐ ধাঁধামূলক কথায়। রেওয়াজ অনুসারে কথাটি শোনানোর পর শ্রোতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় মন্ত্রলব্ধ ঐ সুন্দরীর প্রকৃত মালিক কে। তিন বন্ধুর একজন রাজপুত্র, একজন কোটালপুত্র, অন্যজন দর্জি। কোটালপুত্র প্রথম প্রহরে খণ্ড হাড়গুলি জোড়া লাগিয়ে তাতে মন্ত্রবলে মাংসের আমদানি করল—ক্রমে একটি সুন্দরী মেয়ে গড়ে উঠল। দর্জি সেই মেয়েটির গায়ে নানা রকম মানানসই জামা-কাপড় তৈরি করে পরালো, আর রাজকুমার সবশেষে করল সেই নিষ্প্রাণ পুত্তলিতে প্রাণসঞ্চার। প্রশ্ন হল, আসল কৃতিত্ব কার? কে এই সুন্দরীর ন্যায্য দাবিদার? শ্রোতাদের জবাব যেমনই হোক না কেন, আমার জবাব—কোন একজন নয়, সুন্দরী কন্যার ন্যায্য দাবিদার তিন বন্ধু সম্মিলিত ভাবেই।

আধুনিক সাহিত্য কিন্তু এমন নয়। আধুনিক সাহিত্যে স্রষ্টার নাম সর্বাগ্রে। আমরা মনে রাখতে না চাইলেও, সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়েই আধুনিক সাহিত্যকারেরা আমাদের মনে ছাপ রাখতে চান। আধুনিক মনুষ্যসমাজে প্রতিটি ব্যক্তিই যেহেতু অদ্বিতীয় অতএব তাঁদের রচনারীতিও অনন্য। একের সঙ্গে অন্যের মেলে না। সাহিত্যে রচনারীতি তো আসলে ব্যক্তিমানসের স্বাতন্ত্র্যকেই চিহ্নিত করে। আধুনিক রঙ্গকথায়ও তাই দেখি মাইকেলের (১৮২৪-'৭৩) প্রহসন এক রকমের, দীনবন্ধুর (১৮৩০-'৭৩) অন্য রকমের। ত্রৈলোক্যনাথের (১৮৪৭-১৯১৯) রসরচনার সঙ্গে বহিরঙ্গে কিছু কিছু মিল সত্ত্বেও পরশুরামের (১৮৮০-১৯৫৯) রচনার স্বাদ ভিন্নতর। একজনের কাহিনির পটভূমি গ্রামীণ, অন্যজনের নাগরিক। আধুনিক রঙ্গকথা নিয়ে বিশদ আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র এটি নয়, কিন্তু একটা কথা এখানে না বললেও নয়। সেটা হল, আধুনিক রঙ্গকথাকারদের মধ্যে রচনারীতি নিয়ে যত অমিলই থাকুক না কেন, যতই প্রতিফলন ঘটুক না কেন ব্যক্তিমানসের স্বাতন্ত্র্য, একটা ব্যাপারে প্রত্যেকের মধ্যে কম বেশি মিল চোখে পড়ে—এঁদের সকলের রচনাতেই পড়েছে লোককথার প্রভূত প্রভাব। কারও বিষয়বস্তুতে, কারওবা রচনারীতিতে, কারওবা উভয়তই।

এ-প্রভাব অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয় আদৌ। কারণ একটু আগেই বলেছি, আধুনিক সাহিত্যের সূত্রপাত লোকসাহিত্য থেকেই। তদুপরি দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি সহাবস্থানের একটা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া তো থাকবেই। এখানে একটা কথা বোধ হয় ভুললে চলবে না—লোকসাহিত্যের প্রচার ও প্রসার যদি হয় গ্রামীণ পরিবেশে, আধুনিক সাহিত্যের তবে নগরে-শহরে।

তবু শহুরে সাহিত্যিকদের অনেকেরই শৈশব কাটে ঘটনাক্রমে গ্রামীণ পরিবেশে। যেকোন সাহিত্যিকের রচনা-কর্মে শৈশবস্মৃতি দুর্বার প্রভাব ফেলে। ফলে আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টিতেও গ্রামীণ লোককথা আপনা থেকেই জায়গা করে নেয়। তাই দেখি আপাদমস্তক আধুনিক মাইকেল তাঁর 'বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে লোককথার

প্রচলিত অভিপ্রায় বা মোটিফকে অস্বীকার করতে পারেন না। বৃদ্ধ জমিদার ভক্তবাবু নিরামিষাশী বৈষ্ণব হলে হবে কি, নারীমাংসে আসক্তি তার প্রবল। খাজনা আদায়ের কালে প্রজাপীড়নে তার ধর্মচেতনার কোন বালাই থাকে না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রজার ওপরই তার খড়্গহস্ত নেমে আসে। কিন্তু সেই অবকাশেও কোন যুবতী মেয়ের দেহের গন্ধ পেলে তার সাত খুন মাপ করে দেয় এই কামান্ধ জমিদার।

হানিফ গাজি ভক্ত জমিদারেরই একজন প্রজা। তার অনাদায়ী খাজনা মুকুবের কাতর আবেদন অগ্রাহ্য করে জমিদার ভক্তবাবু তাকে কারাগারে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু সাগরেদ গদাধরের কাছে সে যখন জানতে পারে হানিফের ঘরে যুবতী বৌ আছে—হানিফকে দয়া দেখালে তার বৌকে বাগাতে সুবিধা হবে, তখন ভক্তবাবু অক্লেশে হানিফের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে হানিফের শাস্তি মুকুব করে দেয়, আর কুটনি পুঁটিকে লাগিয়ে দেয় হানিফের বৌকে কব্জা করার কাজে। পুঁটি হানিফের বৌ ফতেমার সঙ্গে জমিদারের কুপ্রস্তাব নিয়ে যোগাযোগ করে, এবং তাকে সে-প্রস্তাব গোপন রাখতে পরামর্শ দেয়, কিন্তু বুদ্ধিমতী ফতেমা স্বামীর কাছে তা ফাঁস করে দেয়। হানিফ প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পঞ্চানন বাচস্পতির সঙ্গে পরামর্শ করে এক ফন্দি আঁটে। ঠিক হয়, পুঁটির প্রস্তাব গ্রহণ করে ফতেমা যা টাকা-পয়সা পাবে আদায় করে নেবে, এবং জমিদাবের সঙ্গে কোথায় কখন দেখা হবে তাও আগে ভাগে জেনে নেবে। সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে পুঁটির কাছে টাকাকড়ি আদায় করে, জমিদারের কাছে যাবার আগে ফতেমা তার স্বামীকে সবিস্তারে সব কথা জানায়। হানিফ গাজিও ওঁৎ পেতে থাকে।

যথা সময়ে নারীলোলুপ জমিদার ভক্তবাবু প্রস্তাবিত ভগ্নমন্দিরে আসে। ফতেমাকে দেখে সে 'ওগো সুন্দরী—ওগো সুনয়নী' ইত্যাদি নানা রকম মধুর বচন শোনাতে থাকে। গাছের আড়ালে ভাঙামন্দিরের ওপর থেকে কে যেন তখন গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, 'বটেরে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার।'

অদৃশ্য কণ্ঠের সেই আকস্মিক আস্ফালনে জমিদার ভক্তবাবু খুবই ঘাবড়ে যায়—তার মেজাজও নষ্ট হয়ে যায়। ইতিমধ্যে কুটনি পুঁটি এসব ভূতের কাণ্ডকারখানা ঠাউরে রামনাম নিতে নিতে মূর্ছা গেছে। হেনকালে সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা একটি মূর্তি এসে জমিদার ভক্তবাবুকে এলোপাথারি কিল-ঘুঁষি মেরে তার সাগরেদ গদাধরকে প্রচণ্ড লাথি কষিয়ে ভূপাতিত করে অতি দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যায়। জমিদার ভক্তবাবু আর তার সাগরেদ গদাধর 'বাঁচাও-বাঁচাও' রবে আকুল আবেদন জানাতে থাকে। অকুস্থলে তখন হাজির হয় পঞ্চানন বাচস্পতি মশায়। ক'দিন আগেও স্ত্রীবিয়োগে শ্রাদ্ধকার্যের জন্যে টাকা চেয়ে সে জমিদারের কাছে বিফলমনোরথ হয়ে এসেছিল। যেন সে ঘটনার কিছুই জানে না, এইভাবে জমিদারকে শুধাল, 'হলটা কি?'

বেকায়দায় পড়ে ভীত জমিদারবাবু বাচস্পতি মশায়কে সত্যি ঘটনা কবুল করে এবং পাছে সাতকান হয়, সে কারণে বাচস্পতি মশায়কে কিছু অর্থ দেবার প্রলোভনও

দেখায়। বাচস্পতি চলে গেলে হাজির হয় সেখানে নিপাট ভালো মানুষের মতো হানিফ গাজি। তাকেও অর্থ দিয়ে মুখবন্ধের প্রস্তাব দেয় জমিদার।

'বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের এই কাহিনিটির মূল অভিপ্রায় বা মোটিফ কে ৪৪৩.২—চালাক স্ত্রী লম্পটের কাছে অর্থ আদায় করে এবং লম্পটকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়। তাছাড়াও আছে কে ৭৩৫—ফাঁদে ফেলে বন্দি করা, কে ১৮৬০.২—ঠিক সময়ে ঠকানো, টি ২১৫—দুর্দিনেও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অটুট বিশ্বাস ইত্যাদি মোটিফ।

মাইকেল-পরবর্তী দীনবন্ধু মিত্রও তাঁর 'নবীন তপস্বিনী' এবং 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-তে প্রায় একই ধাঁচের দৃশ্য দেখিয়ে রঙ্গসৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। 'বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ'-র জমিদার ভক্তবাবুর মতো 'নবীন তপস্বিনী'-র বৃদ্ধ মন্ত্রী জলধরও ছিল নারীলোলুপ লম্পট। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-র বুড়ো রাজীবলোচন অবশ্য ভক্তবাবু বা জলধরের মতো লম্পট নয়, কিন্তু নারীলোলুপ বটে। ফলে এদের ঘিরে আখ্যায়িকাগুলোও মাইকেলের 'বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ'-র মতই শেষাবধি লোককথার টাইপ ও মোটিফ সমূহকে অনুসরণ করেই এগিয়ে চলে।

প্রহসন-পালা ছেড়ে এবার কথাসাহিত্যের প্রসঙ্গে আসি। বিচিত্র প্রকারের রঙ্গরস সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) জুড়ি মেলা ভার। তাঁর রচনায় কোথাও কোথাও স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গের ছোঁয়া থাকলেও—যেমন 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে কোট-প্যান্ট-হ্যাট-বুট পরা ব্যাঙের চরিত্র—কাহিনির বহিরাঙ্গিক কাঠামোয় কিন্তু পশুকথার প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। অন্তরঙ্গেও অন্বেষণ করলে লোক-প্রভাব বেশ টের পাওয়া যায়। এই 'কঙ্কাবতী'-তেই ব্যাঙের আধুলি ভাগের কাহিনিটি স্মরণ করুন। একটি প্রসিদ্ধ বাংলা প্রবাদকে সামনে রেখে ত্রৈলোক্যনাথ সেখানে অসামান্য স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। প্রচলিত লোকবিশ্বাস, রাতে অপদেবতার নাম নিতে নেই। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে এক মুসলমান বাজিকরের বৌ রাতে স্বামীর ভোজবাজির সামগ্রী নিতে যাচ্ছিল, তখন তার স্বামী তাকে নিষেধ করে বলেছিল, 'ওটা নিসনে, এক্ষুনি লুল্লুভূত ধরবে।' ভেবেচিন্তে বলেনি। নেহাতই কথার কথা ছিল সেটা। কিন্তু না জেনে লুল্লুভূতের নাম উচ্চারণ করায় স্বয়ং লুল্লু এসে বৌয়ের ঘাড়ে চেপেছিল এবং তাকে নিয়ে ভেগে ছিল। ঐ গল্পেই এক তাঁতির চরিত্র আছে যার বেসুরো গলার গান শুনে ভূতেরা পালাবার পথ পায় না। এটি লোককথায় ১১৬৪ সংখ্যক টাইপ।

সময়ের কিছুটা ব্যবধান থাকলেও, ত্রৈলোক্যনাথের পরে অবধারিতভাবে যার নাম মনে আসে তিনি অবশ্যই পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৫৯)।

পরশুরামের জীবনাভিজ্ঞতা শহরেই সীমাবদ্ধ অতএব গল্পের পটভূমিও শহরকেন্দ্রিক। তাঁর মানসিক পক্ষপাত ধ্রুপদীরচনার প্রতিই নিবদ্ধ। সুতরাং তাঁর রচনায় লোককথার তেমন প্রভাব না থাকাই স্বাভাবিক। বস্তুত সে অর্থে তাঁর রচনায় লোককথার প্রভাব নেইও। তবু ভূতেদের তিন জন্মের গিন্নিরা এবং স্বামীরা যখন পরস্পরের মধ্যে গ্রাম্য

ভাষায় ঝগড়া-কলহ ও নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে তাঁর 'ভূশণ্ডীর মাঠে' গল্পে (তারপর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুকাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী এই ডবল ত্র্যহস্পর্শ যোগে ভূশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল। ভূত-প্রেত-দৈত্য-পিশাচ-তাল-বেতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল। স্পূক, পিক্সি, নোম, গব্‌লিন প্রভৃতি গোঁফ কামানো বিলাতি ভূত বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন-জান-আফ্রিদ মারীদ্‌ প্রভৃতি লম্বা দাড়ি-অলা কাবুলী ভূত দাপাদাপি আরম্ভ করিল। চিং-চ্যাং ফ্যাচাং ইত্যাদি মাকুন্দে চীনে ভূত ডিগবাজি খাইতে লাগিল।) কিংবা ভূতেরা যখন গান গায় (চা ঢ়া রা রা রা / আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগ্‌লুকে বিটিয়া কেক্‌রাসো সাদিয়া হো কেক্‌রাসো হো ও ও ও... ... ইত্যাদি), তখন ত্রৈলোক্যনাথকে ছুঁয়ে পাঠকেরা হাজির হয়ে যান লোককথার দরবারে।

পরশুরামের 'পরশ পাথর' গল্পটির বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক কোনটাই লোককথামূলক নয়, কিন্তু সমস্ত কাহিনিটি ভর করে আছে যে পরশপাথরটির ওপর—যা পথে কুড়িয়ে পেয়ে পসারহীন উকিল পরেশবাবু রাতারাতি ক্রোড়পতি, সেই অলীক পাথরের পরিকল্পনাটি তো লোককথা থেকেই নেওয়া। লোককথার পরশপাথর এমন একটি বস্তু যার জাদুস্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়। 'পরশ পাথর' গল্পে দেখাও গেছে , ঐ কুড়িয়ে পাওয়া পাথরের দৌলতে পরেশবাবুর ভাগ্যপরিবর্তন হয়েছিল।

'পরশ পাথর' গল্পে যেসব মোটিফ বা অভিপ্রায় ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল : বি ৭২২—ম্যাজিক পাথর, ডি ১৬৭৩—ভাগ্য পরিবর্তনকারী পাথর, ডি ৬৯৯—ইন্দ্রজালিক উপায়ে রূপ পরিবর্তন, এন ২০৩--ভাগ্যবান মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

রঙ্গকথার আলোচনা হবে অথচ সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) সেখানে থাকবেন না, তা কি করে হয়? হোক না সে আলোচনা লোককথার আলোকে। একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই, পিতা উপেন্দ্রকিশোর যেমন গল্প লিখতে গেলে গ্রামবাংলার নাড়ির টান অনুভব করতেন, গ্রামীণজীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত পুত্র সুকুমারে তা আশা করা যায় না। তবু গল্পে গ্রামবাংলার পটভূমি, তিনিও এড়াতে পারেননি, পারেন নি এড়িয়ে যেতে লোককথার দুর্নিবার প্রভাব।

'সূদন ওঝা' গল্পটির কথাই ধরা যাক। সূদন একজন জাত-জুয়াড়ি। জুয়া খেলাই তাঁর নেশা, জুয়া খেলাই তার পেশা। হাটে-বাটে সকলের সঙ্গেই সে জুয়া খেলে বেড়ায়। শেষে তার এমন হাল হল যে জুয়া খেলতে হবে সেই ভয়ে তাকে দেখলেই লোকজন ছুটে পালায়।

সেদিন সূদনের কোন খেলার সঙ্গী জোটেনি। বড় চিন্তার পরে গেছে সে। সঙ্গী জোটাতে না পারলে কেবল মনই তো নয়, পেটও তো ভ্‌রবে না তার। জুয়া খেলায় কাউকে হারিয়ে সামান্য যা জোটে—তা দিয়েই যে তার গ্রাসাচ্ছাদন হয়। ভাবতে

ভাবতে তার মনে পড়ে মহাদেব মন্দিরের পুরোহিতের কথা। অন্য কাউকে না পেলেও, সেই পুরোহিত যাবে কোথায়?

সূদন মন্দিরের দিকে যায়। সূদনকে মন্দিরে আসতে দেখে পুরোহিত তার মতলব বুঝে ফেলে এবং আতংকে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। অনেক ডাকাডাকি করেও পুরোহিতের কোন খোঁজ না পেয়ে সূদন অগত্যা স্বয়ং মহাদেবের সঙ্গেই জুয়া খেলবে মনস্থ করে। মহাদেবের পাষাণ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'খেলায় আমি হারলে তোমাকে এক সেবাদাসী এনে দেবো, আর তুমি হারালে, আমাকে সেবাদাসী এনে দিতে হবে — কেমন?'

মন্দিরের দাওয়ায় বসে সূদন খেলার গুটি সাজাতে থাকে। এক দিকে তার গুটি, অন্যদিকে মহাদেবের। নিজের চাল দিয়ে সে মহাদেবের চালও নিজেই দিয়ে দেয়— এভাবেই খেলা এগিয়ে চলে। শেষে তারই জয় হয়। খেলার শর্ত অনুসারে এবার সূদন মহাদেবের কাছে সেবাদাসী দাবি করে। পাষাণমূর্তি কোন কথা বলে না। সূদন ক্ষিপ্ত হয়ে এক দেবীর মূর্তি তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকে। সূদনের সাহস দেখে মহাদেবের চক্ষু চড়ক গাছ। তিনি সূদনকে এই বলে আশ্বস্ত করেন, 'দেবীর মূর্তি যথাস্থানে রেখে আজ বাড়ি ফিরে যাও। কাল সকালে এসো, দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি।'

সূদন মহাদেবের কথামত দেবীমূতি যথাস্থানে রেখে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে আসে।

ওদিকে, রম্ভাসহ বেশ ক'জন অপ্সরা সে-রাতেই মহাদেবের সঙ্গে মন্দিরে দেখা কবতে এসেছিল। ফিরে যাবার সময় মহাদেব শুধু রম্ভাকে মন্দিরে থেকে যেতে বললেন।

পরদিন সকালে সূদন মন্দিরে এলে, শর্ত রক্ষা করে মহাদেব তার হাতে অপ্সরা রম্ভাকে তুলে দিলেন। সূদন খুশিতে ডগমগ হয়ে রম্ভাকে তার ঘরে নিয়ে আসে। ঘর তো নয়, ভাঙ্গা চালা। রম্ভা মায়াবলে তাকে প্রাসাদ বানিয়ে, সেখানেই দু'জন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সুখে দিন কাটাতে থাকে।

কিন্তু সমস্যা থেকেই যায়। অপ্সরা মাত্রেরই সপ্তাহে অন্তত একবার ইন্দ্রের সভায় নাচ-গানের জন্য হাজিরা দিতে হয়। রম্ভাকেও সেখানে যেতে হবে। কিন্তু সূদন বাধা দিয়ে বলে, 'তুমি স্বর্গে গেলে, আমিও সঙ্গে যাব।' স্বর্গলোকে মানুষের ঠাঁই নেই। অথচ সূদন নাছোড়বান্দা। অতএব এ-সমস্যার মীমাংসা এভাবেই হল যে রম্ভা মায়াবলে সূদনকে গলার হার করে স্বর্গে নিয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত তাই-ই হল। সভায় পৌঁছে, রম্ভা আবার সূদনকে তার মনুষ্যরূপ ফিরিয়ে দিল। সূদন লুকিয়ে লুকিয়ে ইন্দ্রসভায় অপ্সরাদের নাচ-গান দেখল, শুনল। সভাশেষে ফের রম্ভার গলার হার হয়ে সূদনের মর্তে প্রত্যাবর্তন। বাড়ির কাছাকাছি নদীতীরে এসে সূদন ফের রম্ভার মায়াবলে মানুষ হয়ে গেল। সে জায়গাটা ছিল ত্রিভুবন তীর্থ। সেখানে নদীতে দেবতারাও আসেন স্নান সারতে। তখনও এসেছিলেন বেশ ক'জন বিখ্যাত দেবতা---যাঁদের কাউকে কাউকে সূদনও চিনতে পারল। সে রম্ভাকে তখন বলল, 'তুমি বাড়ি ফিরে যাও, আমি স্নান-আহ্নিক সেরে একটু পরেই ফিরছি।'

রম্ভা একাই ফিরে গেল। এরপরই ঘটল এক মহা অঘটন। স্বর্গ-ফেরৎ রম্ভাপতি সূদন নিজেকে এখন কেউকেটা বোধ করছে। নদীতীরে দেবতারা নিজের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। তাঁরা সূদনের উপস্থিতির কোন গুরুত্বই দিচ্ছিলেন না। এতে সূদন নিজেকে খুব অপমানিত মনে করে। সে তখন করে কি, গাছের একটা ডাল ভেঙে দেবতাদের প্রচণ্ড পেটাতে থাকে। প্রহৃত দেবতারা ইন্দ্রের কাছে রম্ভাপতি সূদনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে ছোটেন।

সূদন বাড়ি ফিরে এসে, হাসতে হাসতে রম্ভার কাছে তার কীর্তিকলাপ শোনায়। রম্ভা সূদনের কথা শুনে ভয় পেয়ে যায়। আবারও তো তাকে ইন্দ্রের সভায় যেতে হবে — তখন?

ইন্দ্রের কাছে যখন দেবতারা সূদনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছেন ঠিক তখনই রম্ভা সেখানে যায়। তাকে দেখামাত্র ইন্দ্র গর্জন করে ওঠেন, 'তোমার স্পর্ধা তো কম নয় — অপ্সরা হয়ে মানুষকে বিয়ে করেছো, শুধু কি তাই? তাকে গোপনে এ-সভায় এনে অপ্সরাদের নাচগান উপভোগ করিয়েছো। তাতেও তোমার সাধ মেটেনি, মানুষ স্বামীকে দিয়ে দেবতাদের লাঞ্ছনা করিয়েছো? অতএব আজ থেকে তুমি আমার অভিশাপে দানবী হয়ে যাবে — যতদিন না কেউ বারাণসীর সাতটি বিশ্বেশ্বর মন্দিরকে ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি করে দেয় ততদিন তুমি মুক্তি পাবে না।'

ইন্দ্রের শাপে দানবীরূপে রম্ভা ফের মর্তে ফিরে আসে। সূদনকে সে ইন্দ্রের শাপবৃত্তান্ত সবিস্তারে জানিয়ে বলে, 'আমি এখন এদের রাজকন্যার ওপর ভর করব। এর ফলে সে পাগল হয়ে যাবে। রাজা নিশ্চয় হাকিম-বদ্যি ডাকবেন, কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে না। নিরুপায় রাজা তখন ঘোষণা করবেন যে তাঁর মেয়েকে সুস্থ করতে পারবে, তার সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন —সেই সঙ্গে তাঁর রাজ্যের অর্ধেক অংশ। সেই ঘোষণা শুনে তুমি ওঝা সেজে রাজকন্যাকে সারাতে আসবে। তোমার উপস্থিতিতে রাজকন্যার পাগলামি কিছু উপশম হবে। রাজা অতএব উৎসাহিত বোধ করবেন। তাঁর মনে তোমার ঝাড়ফুঁকের প্রতি আস্থা জাগবে। সেই সুযোগে তুমি রাজার কাছে আর্জি জানাবে এই বলে যে যতদূর তোমার করণীয় তুমি করেছো — রাজকন্যার সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য অতঃপর রাজাকে বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের সাতটি মন্দির ভেঙে পুনর্গঠন করতে হবে। রাজা অবশ্যই তোমার প্রস্তাবে সায় দেবেন। ব্যস, কেল্লা ফতে হবে—আমি রাজকন্যার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব। আমার শাপমুক্তি হবে — আমি স্বর্গে ফিরে যাব। আর তুমি রাজকন্যাকে সুস্থ করেছো বলে রাজা তোমার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবেন। অর্ধেক রাজ্যও দান করবেন। তোমরা রাজা-রানি হয়ে সুখে দিন কাটাবে।'

দানবী রম্ভার পরামর্শমত সূদন ওঝা যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে সত্যিই রাজকন্যাকে রোগমুক্ত করে এরপর রাজা হয়ে গেল — রাজকন্যাকেও রানি হিসেবে পাশে পেল। রম্ভাও রাজার সাত-মন্দির ভেঙে পুনরায় গড়ে তোলার ফলে শাপমুক্ত হয়ে অপ্সরা রূপ ফিরে পেল এবং স্বর্গে ফিরে গেল।

সূদন ওঝার এই কাহিনিতে ইন্দ্র-মহাদেব-অপ্সরাদের আমদানি করে যতই পৌরাণিক প্রলেপ দেওয়া হোক না কেন, এটি আসলে 'ব্রহ্মদৈত্য ও ব্রাহ্মণ যুবক'-এর সেই জনপ্রিয় লোককথারই রূপান্তর মাত্র। ব্রহ্মদৈত্যের ভূমিকা নিয়েছে এখানে অপ্সরা রম্ভা, ব্রাহ্মণ যুবকের ভূমিকায় আছে সূদন জুয়াড়ি। গায়ক গজানন না থাকায় অবশ্য বাড়তি মজাটা মাঠেই মারা গেছে। তা যাক। এ-কাহিনির টাইপ—৫০৩ : অপ্সরার সাহায্য।

এবার শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসায় এক পণ্ডিতকে নিয়ে সেই মস্করা-কাহিনি। পাঠশালার ছাত্র কেষ্টা পণ্ডিতমশাইকে ইংরেজি কথার মানে জিজ্ঞেস করছে :

কেষ্টা।। 'আই গো আপ, উই গো ডাউন' — মানে কি?

পণ্ডিত।। 'আই—আই' কিনা চক্ষুঃ, 'গো' গ-য়ে গো—গৌ গাবৌ গাবঃ ইত্যমরঃ, আপ কিনা আপঃ সলিলং বাহি, অর্থাৎ জলে। গরুর চক্ষে জল অর্থাৎ কিনা গরু কান্দিতেছে। কেন কান্দিতেছে? না, উই গো ডাউন, কিনা উই অর্থাৎ উই পোকা, গো ডাউন অর্থাৎ গুদামখানা। গুদামখানায় উই ধরে আর কিছু রাখলে না, তাই না দেখে 'আই গো আপ' অর্থাৎ গরু কেবলই কান্দিতেছে (ঝালাপালা)। এ-কাহিনির সঙ্গে দারুণ মিল আছে 'গব্য গড়াং' শব্দাবলির অর্থোদ্ধারে উদ্ভাবিত লোককথাটির। এ কাহিনিতে যে মোটিফটি প্রকট তা হল এক্স—৯০০ : মিথ্যে বলে হাস্যসৃষ্টি।

এবার সুকুমার রায়ের 'চালিয়াৎ' থেকে কিছুটা :

শ্যামচাঁদের বাবা কোন একটা সাহেব অফিসে মস্ত বড় কাজ করিতেন, তাই শ্যামচাঁদের পোশাক পরিচ্ছদে, রকম সকমে কায়দার আর অন্ত ছিল না। সে যখন দেড় বিঘৎ চওড়া কলার আঁটিয়া, রঙিন ছাতা মাথায় দিয়া, নতুন জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দে গম্ভীর চালে ঘাড় উঁচাইয়া স্কুলে আসিত, তাহার সঙ্গে পাগড়ি বাঁধা তকমা আঁটা চাপরাশি এক রাজ্যের বই ও টিফিনের বাক্স বহিয়া আনিত, তখন তাহাকে দেখাইত ঠিক যেন পেখমধরা ময়ূরটির মতো! স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা হাঁ করিয়া, অবাক হইয়া থাকিত, কিন্তু আমরা সবাই এক বাক্যে বলিতাম চালিয়াৎ।

বয়সের অনুপাতে শ্যামচাঁদ একটু বেঁটে ছিল। পাছে কেহ তাকে ছেলে মানুষ ভাবে এবং যথোপযুক্ত খাতির না করে। এজন্য সর্বদাই সে অত্যন্ত বেশি রকম গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং কথাবার্তায় নানা রকম বোলচাল দিয়া এমন বিজ্ঞের মতো ভান প্রকাশ করিত যে স্কুলের দারোয়ান হইতে নীচের ক্লাশের ছাত্র পর্যন্ত সকলেই ভাবিত, নাঃ লোকটা কিছু জানে। ... ...

সেদিন সে ক্লাশে আসিয়া কালো চোঙার মতো কি একটা বাহির করিল। মাস্টার মহাশয় সাদাসিধা ভালো মানুষ, তিনি বলিলেন, 'কিহে খোকা, থারমোমিটার এনেছ যে! জ্বর-টর হয় নাকি?'

শ্যামচাঁদ বলিল, 'আজ্ঞে না, থারমোমিটার নয়—ফাউন্টেন পেন।' শুনিয়া সকলের তো চক্ষুস্থির। ফাউন্টেনপেন। মাস্টার এবং ছেলেরা—সকলেই উদগ্রীব হইয়া দেখিতে

আসিল ব্যাপারখানা কি। শ্যামচাঁদ বলিল, 'এই একটা ভালকেনাইট টিউব—তার মধ্যে কালি ভরা আছে।'

একটা ছেলে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, 'ও বুঝেছি, পিচকিরি বুঝি?'

শ্যামচাঁদ কিছু জবাব না দিয়া খুব মাতব্বরের মতো একটুখানি মুচকি হাসিয়া, কলমটিকে খুলিয়া তাহার সোনালি নিবখানি দেখাইয়া বলিল, 'ওতে ইরিডিয়াম আছে—সোনার চেয়েও বেশি দাম।' তারপর যখন সে একখানা খাতা লইয়া, সেই আশ্চর্য কলম দিয়া যখন তরতর করিয়া নিজের নাম লিখিতে লাগিল তখন স্বয়ং মাস্টার মহাশয় পর্যন্ত বড় বড় চোখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর শ্যামচাঁদ কলমটিকে তাঁর হাতে দিবামাত্র তিনি বলিলেন, 'কি কলমই বানিয়েছে, বিলিতি কোম্পানি বুঝি?' শ্যামচাঁদ চট্‌পট্ বলিয়া ফেলিল, 'আমেরিকান স্টাইলো এ্যান্ড ফাউন্টেনপেন কোং ফিলাডেলফিয়া।'

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে শ্যামচাঁদের কথাবার্তা এবং কার্যকলাপের মধ্যে চালিয়াতি আছে ঠিকই, কিন্তু সর্বদা তা মিথ্যাচার বা মিথ্যে বলা নয়। আসলে তার হাব-ভাব-ভঙ্গিই এ-গল্পে হাস্যরসের মূল উপাদান। এ-গল্পে যেটুকু অংশে বাড়িয়ে বলা বা অতিশয়োক্তি আছে তার মোটিফ এক্স—১০২০। সুকুমারের 'সবজান্তা' গল্পটি কিন্তু সর্বাংশে অতিশয়োক্তিতে ভরা, অতএব এক্স—১০২০ সংখ্যক মোটিফের লক্ষণাক্রান্ত। লেখকের জবানিতেই চরিত্রটির কথা শোনা যাক :

সবজান্তা দুলিরামের বাবা কোন একটা খবরের কাগজের সম্পাদক। সেইজন্য আমাদের মধ্যে অনেকের মনেই তাহার সমস্ত কথার উপরে অগাধ বিশ্বাস দেখা যাইত। যে কোন বিষয়েই হোক, জার্মানির লড়াইয়ের কথাই হোক আর মোহনবাগানের ফুটবলের ব্যাখ্যাই হোক, দেশের বড়লোকদের ঘরোয়া গল্পই হোক, আর নানারকম উৎকট রোগের বর্ণনাই হোক, যে কোন বিষয়েই সে মতামত প্রকাশ করিত। একদল ছাত্র অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সকল কথা শুনিত। মাস্টার মহাশয়ের মধ্যেও কেহ কেহ এ-বিষয় তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। দুনিয়ায় সকল খবর লইয়া সে কারবার করে, সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয় তাহার নাম দিয়াছিলেন 'সবজান্তা'। আমার কিন্তু বরাবর বিশ্বাস ছিল যে সবজান্তা যতখানি পান্ডিত্য দেখায় আসলে তাহার অনেকখানি উপর চালাকি। দুই-চারিটি বড় বড় শোনা কথা আর খবরের কাগজ পড়িয়া দু'দশটা খবর, এইমাত্র তাহার পুঁজি, তাহারই উপর রঙচঙ দিয়া, নানারকম বাজে গল্প জুড়িয়া, সে তাহার বিদ্যা জাহির করিত।

পরবর্তী পর্যায়ে এলোমেলোভাবে কিছু আধুনিক রঙ্গকথার নমুনা এবং তার সঙ্গে যুক্ত লোককথার মোটিফ আর টাইপ উল্লেখ করা হবে। উদ্দেশ্য, আধুনিক রঙ্গকথায় লোককথার প্রভাব দেখানো। প্রথমেই ধরা যাক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) 'মাস্টার মহাশয়' গল্পটির কথা। গোঁসাইগঞ্জ আর নন্দীপুর গ্রাম দুখানির নানাবিধ দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে প্রভাতকুমার যে সরস কাহিনিটি উপহার দিয়েছেন, এক কথায় তা অনবদ্য। যথাসম্ভব কাহিনি মূল ভাষায় রাখার চেষ্টা করছি :

নন্দীপুর-ফেরৎ রামচরণ গোঁসাইগঞ্জ গ্রামের মাতব্বর হীরু দত্তকে জানায়, 'নন্দীপুরে হুস্কুল হয়েছে।'

সবাই অবাক হুস্কুল কি? জানা গেল হুস্কুল বলতে বোঝাচ্ছে ইস্কুলকে। এক 'মাস্টার' তার ভাষায় সেখানে 'ইঞ্জিরি' পড়াচ্ছে। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে গোঁসাইগঞ্জের পক্ষে অপমানকর। কেননা তারা তখনও ইস্কুল গড়ে তুলতে পারেনি। হীরু দত্ত সহজে সে অপমান সহ্য করার পাত্র নন। তিনি ঐ ঘটনার কিছুকাল পর কলকাতায় গিয়ে একজন ইংরেজি মাস্টার জোগাড় করে গোঁসাইগঞ্জেও ইস্কুল বানিয়ে ছাড়লেন।

এরপর দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মতো দুই ইস্কুলের মাস্টারদের মধ্যেও রেষারেষি শুরু হল :

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাস্টার নাকি বলিয়াছেন—ঐ বেজ বুঝি ওদের মাস্টার হয়ে এসেছে, তা এ্যদ্দিন জানতাম না। ওটা তো মহামূর্খ! ছেলেবেলায় কলকাতায় আমরা এক ক্লাশে পড়তাম কিনা। আমরা যখন সেকেন বুক পড়ি, সেই সময় ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর তো ও ইংরেজি পড়েনি। ... ...

ব্রজ মাস্টার একথা শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, একেই বলে কলিকাল! সেকেন বুক পড়িবার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ওই ছেড়ে দিয়েছিল? ... ...

তা শুনে নন্দীপুরের মাস্টার বললেন, 'মাস্টার ওকে একদিন একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে, ও বলতে পারল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই আমি বলতে পারলাম। আমার কথা বিশ্বাস না হয় দু'জন মাতব্বর আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে, তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখ, কার কথা সত্যি আর কার কথা মিথ্যে।'

এই কথা শুনিয়া ব্রজ মাস্টার হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, 'হাঁ এই কথা বলেছে? ওসব বিলকুল 'ফলসো'—মিথ্যে কথা। সেই মাস্টারের কাছে ভজিয়ে দেবে? তিনি কি আর বেঁচে আছেন? গেল বছরের আগের বছর তিনি যে 'হেভেন'—স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি 'ইনাভাইট'—নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন যে। একেবারে 'সানইকোয়েল'—পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরা আজও ব্রজদাদা বলতে 'ইগ্নোরেন্ট'—'অজ্ঞান'।

উভয় মাস্টারের পরস্পরের প্রতি তীব্র এই অপবাদ প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব-স্ব মাস্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল কোন প্রকাশ্য স্থানে দুইজনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক। ... ...

কিন্তু উভয় গ্রামের লোকই ইংরেজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে কাহারো মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে এমন একটি সরল বিচার

প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে মাস্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরেজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তার উভয়েই তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইলে পরিবর্তে তিনিই জয়মাল্য পাইবেন। ... ...

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন মাস্টার প্রথমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে? উভয় গ্রামই জিজ্ঞাসার দাবি করিল। কোন পক্ষই নিজ দাবি ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন। হীরু দত্ত একটি ছড়ি ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে ছুড়িয়া দিন। ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাস্টার প্রথম মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবে। ... ...

হাতের কাছে যে ছড়িটি পাইলেন, তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল। গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চুন হইয়া গেল।

নন্দীপুরের হারাণ মাস্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ মাস্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল : কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে তিনি সে ভাব প্রকাশ করিতে দিলেন না। হারাণ মাস্টার তখন বলিলেন, 'আচ্ছা বল দেখি এর মানে কী—হর্নস অব এ ডিলেমা!'

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাস্টার এই কূট প্রশ্নের উত্তর অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া, সহাস্যবদনে বলিলেন, 'এর মানে উভয়সঙ্কট—কেমন কিনা?'

'পেরেছে—পেরেছে—আমাদের মাস্টার পেরেছে' বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। এবার ব্রজ মাস্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল। ব্রজ মাস্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'শোন হারাণবাবু, আমি তোমাকে কোন কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। বেশ হেঁকে উত্তর দেবে, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা, এর মানে কী বল দেখি—আই ডোন্ট নো।'

হারাণ মাস্টার উচ্চস্বরে বলিল, 'আমি জানি না।'

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুলবেগে নৃত্য ও চিৎকার করিতে লাগিল। ... ...

কাহিনির উপস্থাপনায় যতই কারিকুরি থাকুক, 'আমি জানি না'-র শব্দার্থে দ্বিমাত্রিকতা আসলে লোককথার ১৯২০ সংখ্যক টাইপ। অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায় সেই লোককথাটি যেখানে 'মিথ্যে' বললে জরিমানা দিতে হবে কাউকে। একজন বলে,

'আমি তোমার কাছে পাঁচশো টাকা পাই।' পাছে 'মিথ্যে' বললে জরিমানা দিতে হয়, তাই অন্যজন বলে, 'এ-কথা মিথ্যে নয়।'

প্রথম জন তখন দ্বিতীয়জনের কাছে সত্যের সপক্ষে পাঁচশো টাকা দাবি করে।

হাল আমলের বাংলা রঙ্গকথার আলোচনায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯১৯) নাম অবিস্মরণীয়। তাঁর নাম উঠলে প্রথমেই যে রঙ্গকথাটির কথা মনে পড়ে, তাহল গণশা-ঘোঁৎনাদের বিবাহ অভিযান। নাটক-সিনেমা-টি.ভি সিরিয়ালের সৌজন্যে এই রঙ্গকথাটি আম-বাঙালির অন্তঃপুরেও স্থান করে নিয়েছে। এ-কাহিনির মধ্যে বিয়ে উপলক্ষ্যে মদ্যপান, বিয়ের লোকাচারে নাপিতের ছড়া শোনানো ইত্যাদি লোক-অনুষঙ্গ তো আছেই—কাহিনিতেও আছে বিশেষভাবে লোককথার বৈশিষ্ট্যাবলি। ত্রিলোচন অর্থাৎ তিলুর বিয়েতে বরযাত্রী গণশা-ঘোঁৎনা-রাজেন-কে. গুপ্ত-গোরাদের স্ত্রী-আচার দেখার বাসনা ডাকাত-ভ্রমে যেভাবে তাদের বিড়ম্বনায় ফেলেছিল—সে কি সহজে ভোলা যায়? রাতের অন্ধকারে তারা যখন বাসরঘরে গোপনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, কে বা কারা তখন সহসা 'ডাকাত-ডাকাত' রবে হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। গণশা-ঘোঁৎনারা প্রাণের ভয়ে পালাতে চায়। বাড়ি পেরিয়ে রাস্তা, তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে—পেছনে বন্দুক হাতে তিলুর খুড়শ্বশুর জগুবাবু, অন্যান্য লোকজন ধেয়ে আসছে। পথের ধারেই বিশাল একটা মজা পুকুর। হতচকিত এবং ভ্রান্তদৃষ্টি গণশা বন্ধুদের বলে, 'নে, মাঠের মধ্যে নেমে পড়।'

বন্ধুরা নেতার কথায় তক্ষুনি মাঠে নেমে পড়ে। কিন্তু হায়, এ-যে পচা পানার পুকুর!

ওদিকে খুড়শ্বশুর জগুবাবু এবং বিয়ে বাড়ির অন্যান্য লোকেরা পুকুরপাড়ে উপস্থিত। জগুবাবু বন্দুকে তাগ করে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বলছে, 'খবরদার কেউ পালানোর চেষ্টা করবি তো গুলি চালিয়ে দেব।'

গণশার নির্দেশে তখন বন্ধুরা ঘনঘন পাঁক-জলে মুখ ডুবুচ্ছে আর বার করছে। গণশাই এ-সময় বলে উঠল, 'উঃ, পচা-পানায় গা জ্বলছে।'

বন্ধুদের মধ্যে কে একজন বলে উঠল, 'তোর জন্যই তো এখন আমাদের এই হাল।'

গণশা তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'কি করব? চাঁদের আলোয় পুকুরের জলকে মাঠ মনে করেছিলাম।' এ-কাহিনির টাইপ—১২৯০ : চাঁদের আলোয় পুকুর মাঠ মনে হয়।

তিলুর বিয়েতে বরযাত্রীদের অভিজ্ঞতার কথা বললে, গোরার প্রথম শ্বশুড়বাড়ি যাওয়ার কথা কি না বলে পারা যায়?

গণশাকে নফর সাজিয়ে, বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে সে হাজির হয়েছে শ্বশুড়বাড়ি। আসতে একটু রাতই হয়ে গেছে, তার শ্বশুর দারুণ আফিং-খোর। নেশায় বুঁদ শ্বশুরমশাইকে অতিকষ্টে ডেকে তুললেও, নেশার ঘোরে তিনি ভৃত্যকে ডেকে বলেন,

'জামাই বাবাজিরা বোধ হয় হোটেল থেকে খেয়ে এসেছে, ওদের শোয়ার ব্যবস্থা করে দে।'

ভৃত্যটি কার দেখতে হবে তো। ভৃত্যটি আফিং-এর নেশায় বুঁদ হয়েই কোন রকমে মশারি টাঙিয়ে গোরাদের শোয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। লজ্জার মাথা খেয়ে গোরা শ্বশুরমশাইকে জিজ্ঞেস করে তাঁর মেয়েদের কথা। শ্বশুরমশাই 'ওরা সবাই বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্নে গেছে'—বলে পুনরায় শুয়ে পড়েন।

এদিকে গোরা ও গণশার পেট খিদের জ্বালায় জ্বলছে। গণশার পরামর্শে গোরা এবার চুপিচুপি রান্নাঘরে এসে ভেতর থেকে ছিটকিনি আটকে দেয় এবং শিকেয় ঝোলানো গামলা নামিয়ে দু'জনে হাপুস-হুপুস ক্ষীর সাঁটাতে থাকে। অতি ব্যস্ততায় গালে গামলার কালি লেগে যায়। পরস্পর সেই দৃশ্য দেখে হাসে।

তখন কি হাসির সময়?

ওদিকে বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রিতরা ফিরে এসে দেখে রান্নাঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তারা অবাক। সজোরে তারা দরজায় প্রথমে করাঘাত, পরে লাথি মারতে শুরু করে। যদিও শ্বশুরমশাই জানান জামাই বাবাজি এসেছে, কিন্তু সে-কথা নেশার ঘোরে প্রলাপোক্তি বলে সবাই উড়িয়ে দেয়। রান্নাঘরে চোর ঢুকেছে ভেবে তারা 'চোর চোর' চিৎকার করতে থাকে।

গণশার ঝটিতি নির্দেশে গোরা পেছনের দরজার খিল খুলে ঝোপের মধ্যে দিয়ে প্রাণপণ দৌড়তে থাকে। ওদিকে তখন 'চোর-চোর' রব আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। এ-কাহিনির টাইপ—১৩৩২ : চোর জামাই।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যয়ের (১৮৯৯-১৯১৯) 'জেনারেল ন্যাপলা' গল্পে দুটি ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে রেষারেষি নিছক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার তর্কযুদ্ধে পর্যবসিত নয়, বরং সত্যিকারের সম্মুখসমরেই পরিণত হয়। এবার সে কাহিনিরই কিছুটা :

শহরে দু'টি স্কুল ছিল। একটা টাউন স্কুল, তাতে নেপাল পড়ত। আর একটা মিশন স্কুল। এই দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি-মারপিট লেগেই থাকত। ফুটবল-হকি খেলা নিয়ে তাদের চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই রাস্তায়, মাঠে, গঙ্গার ধারে কোথাও দু'দল ছেলের মধ্যে দেখা হলেই প্রথম কথা কাটাকাটি, তারপর মারামারি বেধে যেত। আর অবধারিতভাবে মার খেত টাউন স্কুলের ছেলেরা। এই নিয়ে তাদের মনে ভারী দুঃখ।

সুধা বলে একটি ছেলে, সে নেপালের বন্ধু, সকলকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল 'সেদিন ন্যাপলা কিন্তু ওদের একটা ছেলেকে খুব জব্দ করেছে।'

গিরীন ফুটবলের ক্যাপ্টেন, বয়সেও সকলের বড়, জিজ্ঞাসা করল, 'কি করেছে ন্যাপলা তুই নিজেই বল না?'

সুধা বলে উঠল, 'উঃ সে ভারী মজা! ন্যাপলা করেছে কি, এক্‌টা টিনের কৌটায়;—এই ন্যাপলা তুই বল্ না?'

গুরু — অ পরিমল কও দেখি বল্লা যাইতে কত সময় লাগে?

পরিমল — শুকায় না পানিতে?

উকিল — ধর পানিতে। মানে বর্ষায় — নৌকায়।

পরিমল — এমনিতে না বাদামে?

গুরু — ধর বাদামে।

পরিমল — এক ঘুমটি না দুই ঘুমটি বাদাম।

গুরু — ধর দুই ঘুমটি বাদাম।

পরিমল — তাইলে ত ফটাস কইরা যামু গা।

পূর্ববঙ্গের এক পেশাদার ভাঁড়ের অভিনীত এই নাট্যাংশটি তাঁর শৈশব-স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। আপাতচোখে পাঠশালায় বসে গুরুমশায়ের সঙ্গে ছাত্রের এ-হেন বাক্যবিনিময় অবাস্তব বোধ হতে পারে। আসলে এ-নাটকের পূর্বদৃশ্যে এক ছাত্রীও ছিল যার নাম কুসুম। কুসুমের সঙ্গে পরিমলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। একদিন দু'জনের প্রচণ্ড বাগ-বিতণ্ডার অবকাশে পরিমলের মনোভাব অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই গুরুমশায় এই নাট্যাংশের অবতারণা করেছিলেন নিতান্তই ছলনার আশ্রয় নিয়ে।

বাংলার আধুনিক রসসাহিত্যে শিবরাম চক্রবর্তী একটি অবিস্মরণীয় নাম (১৯০৫-'৮০) এবং তাঁর সৃষ্ট হর্ষবর্ধন একটি স্মরণীয় চরিত্র। এবার শিবরামের 'যদ্দুর বেয়াড়া হতে হয়' নামের গল্প থেকে তাঁদের দু'জনের কিছু কথাবার্তা :

'আমি হর্ষবর্ধন। আপনি?'

'আমি শিব্রাম।'

'নিবাস?'

'আপাতত চেতালায় শানু মাসির বাড়ি।'

এভাবেই কলকাতায় নতুন-আসা হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শিব্রামের আলাপ পরিচয়। এর কিছুদিন পর এক দুপুরে হর্ষবর্ধন শিব্রামের কাছে এক ভালো ডাক্তারের খোঁজে আসলেন। শিব্রাম তাঁকে চেতলা অঞ্চলের এক প্রসিদ্ধ ডাক্তার রামবাবুর নামধাম বাতলে দিলেন। হর্ষবর্ধন সেই পথেই ডাক্তারবাবুরে চেম্বারে হাজির :

'ডাক্তারবাবু বাড়ি আছেন?'

তাঁর হেঁড়ে গলার হাঁকড়ানিতে একজন মুখ বাড়িয়েছেন, 'কাকে চাই?'

'ডাক্তারবাবুকে'

'ভেতরে আসুন।'

ভেতরে যেতেই 'কি কেস' প্রশ্ন করা হয়েছে তাঁকে।

'না কোন কেস নয়'—জবাব দিয়েছে হর্ষবর্ধন, 'কেস থাকলে তো উকিলের কাছেই যেতাম, ডাক্তারের কাছে আসব কেন?'

'মানে, হয়েছেটা কি?'

'আজ্ঞে আমাশা। তার ওপর একটু জ্বরের মতোও আবার।'

'নিন শুয়ে পড়ুন—শুয়ে পড়ুন চট করে'—আর একটি কথাও তাঁকে কইতে না দিয়ে, তাঁর মুখে থার্মোমিটার গুঁজে দেওয়া হয়। ... ... 'আমাশা হয়েছে বললেন না, সাদা আমাশা না রক্তামাশা?'

থার্মোমিটার মুখে নীরবে ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন। কী বোঝাতে চান, তিনিই জানেন।

'আমাশায়ে তো এমিট্রিন ইনজেকসন দেয় জানি, দেখি দেরাজের কোথাও আছে নাকি দাওয়াইটা।'

আলমারির ভেতর থেকে এমিট্রিনের অ্যামপিউলটা বার করে ইনজেক্সানের সিরিঞ্জে ভরা হয়।

মুখটি বুজে জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে দেখেন হর্ষবর্ধন।

'দেখি হাতখানা'।

হর্ষবর্ধনের হাতখানা করায়ত্ত করে তাঁর বাহুমূলে সিরিঞ্জের ছুঁচটা বসানো হয়। হর্ষবর্ধন থার্মোমিটার মুখে গোঁ-গোঁ করেন। ইনজেক্সানটা ঠুকে দেবার পর সিরিঞ্জটা তুলে নিয়ে ওর মুখ থেকে জ্বরকাঠিটাও তুলে নেওয়া হয়।

হর্ষবর্ধন হাঁ করেন, হাঁফ ছাড়েন, হাই তোলেন।

সেই ফাঁকে একটা ইয়া বড় ওষুধের গুলি তাঁর মুখগহ্বরে ফেলে দেওয়া হয়—'নিন গিলে ফেলুন চট করে। ওষুধটা পেটে গেলে উপকার হবে।' ...

থার্মোমিটারে চোখ রেখে তিনি জানান 'জ্বর নেই এখন—যাক তাতে অবশ্যি কোন ক্ষতি হবে না, এখন বলুন কি বলতে চাইছিলেন আপনি?'

'বলতে চাইছিলাম জ্বর আর আমাশা আমার হয়নি, হয়েছে আমার ভাইয়ের।'

'আপনি রোগী নন?'

'আজ্ঞে না।'

'যাক তাতে আর কী হয়েছে, আমিও ডাক্তার নই।'

হর্ষবর্ধন শুনে হতবাক—'সে কী আপনি ডাক্তার নন?'

'আজ্ঞে না, ডাক্তারবাবু কাছেই কোথায় গেছেন, আমাকে বসিয়ে রেখেছেন চেম্বারে, আর বলে গেছেন কোন রোগী-টোগী এলে যেন দেখাশোনা করি। সেই জন্যেই আপনাকে দেখেছি। উনি যেমনটি করে থাকেন, আমিও তাই তাই করেছি।'

বেখাপ্পা কথায় খাপ্পা হয়ে হর্ষবর্ধন শুধান, 'কিন্তু আপনি কে মশাই শুনি একবারটি?'

'আমি ডাক্তারবাবুর বেয়ারা—তাঁর ওষুধপত্রের ব্যাগট্যাগ বহন করে বেড়াই।'

'আচ্ছা বেয়াড়া বেয়ারা তো।' —হর্ষবর্ধন স্বগতোক্তির মতো কোন মতে কথাগুলি উচ্চারণ করেন।

শিব্রামীয় এ্যালিটারেশন এবং পান ইত্যাদি তো এখানে আছেই এবং যার হদিস লোককথায় মেলা ভার—সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে, এ-কাহিনির মূল অভিপ্রায় অর্থাৎ চিকিৎসা বিভ্রাটের ব্যাপারটি কিন্তু সরাসরি লোককথা থেকেই নেওয়া, এর মোটিফ—এক্স ৩৭২.৩ : পেটের অসুখে চোখের ওষুধ দেওয়া।

বাংলার আধুনিক রঙ্গসাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-'১৯) আর একটি উল্লেখযেগ্য নাম।

বিয়েবাড়ির কেলেংকারি নিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অনুসরণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও একদা হাসির হুল্লোড় তুলেছিলেন বাংলা সাহিত্যে। সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত 'সেরা সন্দেশ' থেকে তাঁর তেমনি এক কাহিনি 'হরিশপুরের রসিকতা'-র কিছু অংশ :

বিষ্টুপদর বিয়ে। হরিশপুরে। কলকাতার থেকে ট্রেনে ঘন্টা দেড়েকের পথ। বন্ধুদের সে নিমন্ত্রণ করেছে। নিতাই, নেপাল যাবেও ঠিক করেছে। তবে বরযাত্রী হিসেবে যেতে পারবে না। আফিস সেরে বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেরোলেই বিয়ের আগে ওখানে পৌঁছে যাবে।

বিয়ের দিন যথাসময়ে বন্ধুরা হাওড়া থেকে হরিশপুরগামী ট্রেনে উঠেছে। প্রথমে খুব ভিড় থাকলেও, হরিশপুরের তিন-চারটে স্টেশনের আগে থেকেই ভিড় পাতলা হয়ে এল। বলতে কি, তখন বিষ্টুপদর বন্দুদের কামরায় তারা ছাড়া আর মাত্র একজন বয়স্ক লোক।

বেশ পাকা আমটির মত ফরশা গোলগাল চেহারা, মুখে একজোড়া মানানসই কাঁচা-পাকা গোঁফ, মাথায় চকচকে টাক, দেখলেই ভক্তি আসে। সঙ্গে দু'টি বিরাট সাইজের মুখ-বাঁধা হাঁড়ি।

বন্ধুরা বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন নিয়ে নানা রকম রঙ্গরসিকতা জুড়ে দিয়েছিল। বয়স্ক সেই ভদ্রলোক এবার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবেন?'

বন্ধুরা বলল, 'হরিশপুর।'

—'বরযাত্রী বুঝি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বেশ বেশ। হরিশপুরের কদমতলার জগদীশ চক্কোতির মেয়ের বিয়েতে যাচ্ছেন, তাই না?'

বন্ধুরা অবাক হল একটু। নিতাই জিজ্ঞেস করলে, 'কি করে জানলেন?'

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, 'আমরা এ তল্লাটের লোক — সব রকম খবরই রাখি। ছেলেটির নাম বিষ্ণুপদ গোস্বামী — নয় কি?'

নেপাল চোখ কপালে তুলে বললে, 'তা-ও জানেন দেখছি!'

ট্রেন আর একটা স্টেশন পার হয়, আলাপ ও এগিয়ে চলে। হঠাৎ কথা থামিয়ে ভদ্রলোক শুধান, 'তা খরিশপুরেই নামবেন তো?'

বন্ধুরা বলে, 'খরিশপুরে যাব কেন, আমাদের যাবার জায়গাটার নাম তো হরিশপুর কদমতলা?'

—'জানি জানি, বাইরেব লোকেরা সবাই এই ভুলটাই করে। হরিশপুর কদমতলায় হরিশপুর নামটা আছে বলেই অবশ্য এ ভুলটা হয়ে যায়। আমাদের ঐ কদমতলায় যেতে গেলে, পরের স্টেশন খরিশপুরের নামাই সুবিধের। অবশ্য আপনারা যা ভাল বোঝেন'—

বন্ধুরা অগত্যা ভদ্রলোকের কথামত হরিশপুর ছেড়ে পরের স্টেশন খরিশপুরেই নামে। চেকার টিকিট দেখতে চাইলে, সেই ভদ্রলোকই তাড়াতাড়ি এসে টিকিট-চেকারকে বলে, 'ওরা খরিশপুরে আসতে চায়, ভুল করে হরিশপুরের টিকিট কিনে ফেলেছে, বলেন তো বাড়তি টাকাটা আমিই দিয়ে দিই।'

চেকার দেখা গেল ভদ্রলোকের খুবই পরিচিত। তিনি ভদ্রলোককে বলেন, 'না-না, আপনাকে আর দিতে হবে না -- তারপর আপনি এখানে যে?'

ভদ্রলোক কি যেন বলে, বন্ধুদের নিয়ে স্টেশন থেকে এগিয়ে এলেন, এবং যেতে যেতে, এক জায়গায় থেমে বলেন, 'দু'টো পিপুল গাছের তলা দিয়ে যে-রাস্তাটা বাঁদিকে গেছে — তাই ধরে এগুবেন। একটু জংলা মনে হবে পথটা, তাতে ঘাবড়ে যাবেন না, তারপরেই একটা ছোট্ট নালা—বাঁশের পোল রয়েছে—সেটা পেরুলেই'—

ভদ্রলোক চলে গেলেন। পিপুলগাছের তলা দিয়ে বন্ধুরা চলতে শুরু করে দিল। চলল তো চললই। পথে বিদ্যুৎ চমক দিয়ে প্রবল বৃষ্টি নামল। রাস্তা জলকাদায় ভরা। এবড়-খেবড়। নিতাই যেতে যেতে ভদ্রলোকের চোদ্দপুরুষ উচ্ছেদ করছিল। হঠাৎ তিন-চারটে টর্চের আলো পড়ল তাদের ওপর। দেখা গেল আট-দশজন লোক — হাতে তাদের লাঠি আর বল্লম।

'কারা আপনারা?'—তাদের মধ্যে একজন জানতে চাইল।

—'আমরা বরযাত্রী। কলকাতা থেকে আসছি, হরিশপুর কদমতলায় যাব'।

'বরযাত্রী—হরিশপুর-কদমতলা?' — লোকগুলো একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল, 'তা বেশ, গল্পটা শুনতেই ভালই—চলুন, আপনাদের অভ্যর্থনা করতেই আমরা আছি—বিয়েবাড়িতেই নিয়ে যাব।'

—'তার মানে?'

—'আমরা গ্রামের ডিফেন্স পার্টি'। তিনজন বিদেশি লোক এই দুর্যোগের রাতে শ্মশানের জঙ্গলে কেন ঘুরছিলেন তার একটা ভাল কৈফিয়ৎ দিতে হবে। থানায় চলুন'—

সত্যিই তাদের তারপর থানায় ধরে আনা হল। তারপর সারারাত ভিজে কাপড়-জামায়, খিদেয়, লজ্জায় আর ভয়ে তাদের কীভাবে যে কাটল তা না বললেও চলে। ... ...

সকালে উঠে তিনজন চুপচাপ জড়াজড়ি করে বসে আছি আর ভাবছি এরপর কপালে কী আছে — এমন সময় হাজতের দরজা খুলে দারোগা, বিষ্টুপদ আর —, সেই ভদ্রলোক। সেই মুখুজ্জে মশাই, সেই গোলগাল চেহারার লোকটি, পাকা আমের মত চেহারা — যিনি আমাদের হরিশপুর-কদমতলার সোজা রাস্তাটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'মিথ্যোবাদী, পাষণ্ড, ভণ্ড।

বিষ্টুপদ বললে, 'আরে আরে, কাকে কী বলছিস? উনি যে আমার খুড়শ্বশুর। সকালে চৌকিদার গিয়ে খবর দিতে উনিই তো আমায় তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে এলেন।'

আমরা আবার চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম। ভদ্রলোক একগাল হাসলেন। একেবারে নির্লিপ্ত অহিংস হাসি।

—'বরযাত্রীদের নিয়ে একটু রসিকতা করছিলুম মশাই, তারপর উল্টোদিকের ট্রেনটায় হরিশপুরে চলে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম একটু বাদে আপনারাও এসে যাবেন। কিন্তু এভাবে হাজতবাস করতে হবে সেটা ভাবি নি। এখন দয়া করে হরিশপুরে চলুন। চা-জলখাবার-গরম পোলাও-মাংস—সব তৈরি।

এ-কাহিনির মোটিফ—৯০০ : মিথ্যে কথা বলে হাস্যরস সৃষ্টি।

শব্দকে নিয়ে খুশিমতো খেলা করা কিংবা নতুন শব্দ সৃষ্টিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন তেমনি গল্পের বিষয়বস্তুতে কখনও কখনও শিবরামের মতোই লোককথার দ্বারস্থ হন, কিন্তু লেখার মুন্সিয়ানায় তা তেমন টের পাওয়া যায়না। হাতের কাছেই 'টেনিদা সমগ্র' রয়েছে। নমুনা হিসেবে তার প্রথম গল্প 'চারমূর্তি'-ই বেছে নেওয়া যেতে পারে :

টেনিদা, হাবুল, প্যালা, আর ক্যাবলা চার মূর্তি মিলে আউটিং-এর ছক কষছে। ক্যাবলার মেসোমশাই চার মূর্তির সে আলোচনায় যোগ দিয়ে রাঁচির কাছাকাছি তাঁর একটা বাড়িতে ওদের যেতে বললেন। টেনিদা পেটপুরে খেয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পড়েছিল, তড়াক করে উঠে বসল।

'—আমরা যাব। আমরা চারজনেই।

মেসোমশাই আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, সে তো ভালো কথাই। কিন্তু একটা মুস্কিল আছে যে।

—কি মুস্কিল?

—কথাটা হল — ইয়ে — বাড়িটার কিছু গোলমাল আছে।

—গোলমাল কিসের?

—ওখানকার সাঁওতালেরা বলে, বাড়িটা নাকি দানে-পাওয়া। ওখানে নাকি অপদেবতার উপদ্রব হয় মধ্যে মধ্যে। কে যেন দুমদাম করে হেঁটে বেড়ায় — অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে — অথচ কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। আমি অবশ্য বাড়িটা কেনবার পরে মাত্র বার তিনেক গেছি — তাও সকালে পৌঁছেছি আর সন্ধ্যাবেলায় চলে এসেছি। কাজেই রাত্তিরে ওখানে কী হয় না হয় কিছুই টের পাইনি। তাই ভাবছি—ওখানে যেতে তোমাদের সাহসে কুলোবে কি কুলোবে না।

টেনিদা বললে, ছো। ওসব বাজে কথা। ভূত-টুত বলে কিছু নেই মেসোমশাই। আমরা চারজনেই যাব। ভূত যদি থাকেই, তাহলে একেবারে রাঁচির পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ফিরে আসব কলকাতায়। আর—

কিন্তু তারপরেই আর কিছু বলতে পারলনা টেনিদা — হঠাৎ থমকে গিয়ে দু'হাতে হাবুল সেনকে প্রাণপণে জাপ্টে ধরল।

হাবুল ঘাবড়ে গিয়ে বললে, আহা-হা-কর কী, ছাইড়্যা দাও, ছাইড়্যা দাও। গলা পর্যন্ত খাইছি, ফাইটা ফাইটা যাইব যে।—

টেনিদা তবু ছাড়ে না। আরও শক্ত করে হাবুলকে জাপ্টে ধরে বললে, ও কী—ও কী—বাড়ির ছাদে ও কী।

আকাশে চাঁদটা ঢাকা পড়েছে এক ফালি কালো মেঘের আড়ালে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে পাশের বাড়িতে ছাতে কার যেন দু'টো অমানুষিক চোখ দপদপ করে জ্বলছে।...

সেই জ্বলন্ত চোখের মালিক এক লাফে ছাতের পাঁচিলে উঠে পড়ল, তারপর আর এক লাফে আর এক বাড়ির কার্ণিশে।...

মেসোমশাই বললেন, একটা হুলো-বেড়াল দেখেই চোখ কপালে উঠল, তোমরা যাবে সেই ডাকবাংলোয়—ভেংচি কাটার মতো খানিকটা খ্যাঁকখেঁকে হাসি হাসলেন ভদ্রালোক : বীর কী আছে গাছে ফলে।

টেনিদা দম নিচ্ছিল এতক্ষণ। সে বললে, সত্যি বলছি মেসোমশাই—ইয়ে—আমরা একদম ভয় পাইনি। এই প্যালাটা বেজায় ভিতু কিনা, তাই ওকে একটু ঠাট্টা করছিলাম।'

এখানে টেনিদার স্বভাবসিদ্ধ গুলবাজিতে যে নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের এক্স—৯০০ : 'মিথ্যে বলে হাসানো'র মোটিফটিকে মনে পড়িয়ে দেয়। এ-কাহিনি পড়তে পড়তে কেন জানিনা মনে পড়ে এক পশুকথা :

এক শেয়াল বাঘের কাছে নিজেকে সর্বজ্ঞ ও বীর প্রতিপন্ন করতে চায়। সে যখন নিজের বীরত্বের কথা বাঘকে জাহির করছিল তখন পাশ দিয়ে একটি শিঙঅলা হরিণ যাচ্ছিল। তাকে দেখে শেয়াল ঘাবড়ে যায়। বাঘ মজা করে জিজ্ঞেস করে, 'ভাগ্নে কি হল, থেমে গেলে কেন?'

শেয়াল আবার শুরু করল, 'মামা ও কিছু নয়। হরিণকে আমি ডরাই না। হরিণ শিকার আমার কাছে জলভাত।'—তার কথা শেষ না হতেই আর এক পাল হরিণকে দূরে আসতে দেখে সে নদীর জলে ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মামা অতিকষ্টে ভাগ্নেকে জল থেকে যখন ডাঙ্গায় তুলল তখন হরিণের পাল চলে গেছে। মামা সকৌতুকে ভাগ্নেকে শুধায়, 'কি হল ভাগ্নে, নদীতে ডুবে যাচ্ছিলে যে?'

—'ও কিছু নয়, নদীর জলে মাছ ধরতে নেমেছিলাম (টাইপ—৬৪)।'

শেয়াল নামক ভাগ্নেটি আর কেউ নয় — টেনিদাই।

মোটিফসূচি

এ

১৩৬.১.৩ — বৃষবাহন দেবতা (শিব)

৬৬১—স্বর্গ

বি

৪৫—আকাশচারী হাতি

১২০—বুদ্ধিমান পশু

১২০.২—বুদ্ধিমান শেয়াল

২১০—কথাবলা পশু

২১১.১.৫—কথাবলা গাই-বাছুর

২১১.২.১০—কথাবলা বানর

২১১.৩—কথাবলা পাখি

২১১.৩.৭—কথাবলা টুনটুনি

২৩১.৩—উপকারী বাঘ

২৪০—পশুপাখির রাজা (সিংহ)

২৪০.৫—বাঘ

৪৫০—উপকারী পাখি

৫৭১—মানুষের জন্য পশু কাজ করে

সি

৩১৩.০ ১—কোন পুরুষের মুখদর্শনে ক্ষতি

৪০০—কথা বলা নিষিদ্ধ

ডি

১০—নরের নারীতে কিংবা নারীর নরে রূপান্তর

৪২.২—ভূত মানুষের রূপ নেয়

৪৩৫.২.১—প্রতিমা প্রাণ পায়

৫২৫—অভিশাপে রূপান্তর

৭৩৩—ঘ্যানঘ্যান করা বৌ

৯৩১.১.২—জাদু ছাই

১১৭১.১—জাদু পাত্র

১৭১২—ভবিষ্যৎ বক্তা
১৮১২.৩.৩—স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখা

ই
১৮১—প্রেতলোক
৫৯৬.১—মানুষের হয়ে ভূত কাজ করে
৬০৭.১—মৃতের অস্থিসংগ্রহ করে জাদুবলে পুনর্জীবনদান

এফ
১১—দেবলোক যাত্রা
৩৫.২—স্বর্গের হাতির মর্তে আগমন
৬২.১—পরির সঙ্গে আগমন
৭৫—হাতির লেজ ধরে যাত্রা
২৬১.৩.৭—ইন্দ্রের সভায় অপ্সরা নাচ
৩০২—পরি বৌ
৩০৩—পরি ও মানুষের বিয়ে
৩৮৬.২—মানুষকে বিয়ে করার অপরাধে পরির শাস্তি
৪০২.৬.১—অসীম শক্তিশালী পুরুষ
৭১৫.২.৪—ক্ষীর নদী
৭৭১—অস্বাভাবিক ফল
৮১১—পিঠে গাছ
৮১৪.৩—কথাবলা ফল

জি
৮৪—হাঁউ মাঁউ কাঁউ
৫৩২—কৌশলে দৈত্য পরাজিত হয়

এইচ
৩০—চরিত্রবৈশিষ্ট্য কাউকে চেনা
৫০২—জ্ঞানের পরীক্ষা
৫০২.৩—জ্ঞানের পরীক্ষা : পূর্বপুরুষের নাম বলা
৫০৬.২—আগুন ছাড়া ভাত বাঁধা
৫৪০—ধাঁধার উত্তরদান
৫৫১—ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়ে রাজকন্যা লাভ
৫৭৮.০.১—ধাঁধার ঠিক উত্তর দিতে না পারায় প্রাণদণ্ড
৬৮০—পণ্ডিত ও মূর্খ
৬৮১.৩.১—প্রশ্ন : পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল

৬৮২.৪.২—প্রশ্ন : সমুদ্র কত গভীর
৬৯৬.১.৪—প্রশ্ন : নদীতে কত জল
৭০২.১—প্রশ্ন : আকাশে কত তারা
৯৮৪.১—ব্রহ্মদৈত্যকে দিয়ে কাজ বাগানো
১০১০—অসম্ভব কাজ
১২৩৩—অনুসন্ধানে সাহায্যকারী

২১.২.২—মেয়েদের কাছে গোপনকথা বলবে না
৯৫—যে সোজা পথে চলে সে খাদে পড়ে না
১১১২—বুদ্ধিমতী বৌ
১১৫১.১.২—ঝগড়ুটে মেয়েকে শান্ত করা
১১৯০.৭—মাস্তুলে চালের হাঁড়ি তবু রান্না হবে
১৩০৯.৩—বোকা জামাই : পুকুর কাটার পর মাটি যায় কোথায়
১৬০৩—পেটের রোগের চিকিৎসায় চোখের ওষুধ দেওয়া
১৭০৫.২—বোকা ব্রাহ্মণ
১৭০৫.৩—বোকা জোলা
১৭১৩.১—স্বামীর পিঠে ভাজার সংখ্যা জানা
১৭৫৮.১—ঘোড়া ভেবে বাঘের পিঠে চড়া
১৭৭২.১—বোকা জোলার ফুটিকে ঘোড়ার ডিম ভাবা
১৭৯১.৫—প্রতিবিম্বকে প্রতিপক্ষ ভেবে লম্ফন
১৮২০—ভুল বুঝে বেঠিক কাজ করা
১৯০৫.৫—বোকার গরুর বাঁট থেকে দই বার করার চেষ্টা
২০৩১—নিজেকে গণনার মধ্যে না আনায় গুনতিতে ১ কম হওয়া
২১৩২.৫.১—বাঘের লেজকে অন্য কিছু ভেবে ধরা ও আহত হওয়া
২১৩৩.৫.২—বোকা যাকে নিয়ে ঝোলে তা ছেড়ে দেয়
২৪৬২—বোকা জামাই আক্ষরিক অর্থেই উপদেশ পালন করে
২৫১১.১—নিশ্চুপ থাকার প্রতিযোগিতা
৬৩—পাথর চেবানো (আসলে বাদাম)
১০০—প্রতারণার মধ্যে লাভ
১১০—নকল জাদুবস্তু বেশিদামে বেচে অপরকে ঠকানো
১২১—ছাই সোনার দরে বিকোয়
১৩১.২—বার্তাবাহক পাখি বেচা
১৭২—রাগ দেখিয়ে লাভবান হওয়া
১৭৬—প্রতারণাময় লাভ : প্রথমে প্রণাম
৩০১—চতুর চোর

৩০৫—চুরির প্রতিযোগিতা
৩১১.৮.৩—মেয়ের বর সেজে চুরি করা
৩৩৫.১.১—গাছ থেকে কিছু পড়ামাত্র ডাকাতদলের প্রস্থান
৩৫৯.২.১—মাছি মিষ্টি : কত আর খাবে
৪৪৩.২—চতুরা স্ত্রীলোকের লম্পটের কাছে অর্থ আদায় ও উচিত শিক্ষাদান
৫২১.৫—লাউয়ের খোলে বসে পালানো
৫২৭—অন্য লোককে বসিয়ে রেখে পালানো
৬০৭.১—গুহা কথা বলে
৭১১—ছল করে থলিতে বন্দি করা
৭৩৫—ফাঁদে ফেলে বন্দি করা
৭৮৩.১—লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে শত্রুকে ঘায়েল করা
৮৩৭—পুরুষের পোশাকে মেয়ে
৮৪২—প্রতারিত ব্যক্তিকে বন্দির বদলে বস্তায় ঢুকতে বাধ্য করা
৯৩১.১—কুমিরছানার মাস্টারমশাই শেয়াল
১২১০—প্রতারিতা নায়িকা
১২১৮.৩—ফাঁদে পড়া প্রণয়ী
১৭১০—ছলনায় বিশ্বাস করে ভূত বোকা হয়ে যায়
১৮৬০—ঠিক সময়ে প্রতারণা
১৯১১—নকল বর
১৯১১.১—বরের গুণবর্ণনায় অতিরঞ্জন
১৯১১.১.২—বরের মিথ্যা পরিচয়দান
১৯১৫.১—নকল বরের নারীর সঙ্গে বাস
১৯৫১.১—এক কোপে সাতটা মারা (বাগাড়ম্বর)
২১১৫.১—মিথ্যা বলা
২১১৭.১—নিন্দিতা বৌ

এল

১০—কনিষ্ঠ সন্তান জয়লাভ করে
১১৩.৩—গরিব জোলা নায়ক
১২৩—কর্পদকশূন্য নায়ক
৩১০—সবলের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্বলের জয়

এম

১০—বিচার : সত্যের জয়
১০১—নিষ্ঠুর নিয়তি
২০৩—ভাগ্যবান মানুষ

২১১—হারানো জিনিস মালিকের কাছে ফিরে আসে
২৫০—ধারাবাহিক মন্দ কপাল
৩৯৩—আশীর্বাদ
৪৫৪—অভিশাপে লিঙ্গান্তর
৪৭১—গোপনকথা জেনেও বোকামি
৫৪৩.১—মাটির নীচে গুপ্তধন
৬১১—অকস্মাৎ অপরাধীর ধরা পড়া আর গণৎকারের কেরামতি
৮৪৩—সাহায্যকারী বন্ধু

পি

২৫৫—রাজার ছেলে
২৫৫.১—মন্ত্রীর ছেলে
২৫৫.২—কোটালের ছেলে
৪৮১—জ্যোতিষী

কিউ

১১২—অর্ধেক রাজত্বদান
২১২—চুরির কারণে শাস্তি
২৭০—দুষ্কার্যের জন্য শাস্তি
৪৭৩.৫.১—মাথায় ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে পথ-পরিক্রমণ

এস

১১.৪.৩—রানির ছেলে না হয়ে বেটি হলে, মা-বেটিকে হত্যা
৫১—নির্মম শাশুড়ি
৫৪—নির্মম বৌ
৫৫—নির্মম জামাই

টি

৫৩—ঘটক
৯১.৫.১—ধনী ঘরের মেয়ের সঙ্গে সাধারণ ঘরের ছেলের বিয়ে
২১৫—দুর্দিনেও দম্পতির সৌহার্দ্য
২৭৪—স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না
৪৭০—অবৈধ যৌন সম্পর্ক
৫১১.১—ফল খেয়ে গর্ভবতী
৫১১.১.৩—আম খেয়ে গর্ভবতী
৫৯১.২—আটকুড়ের মুখদর্শন অলুক্ষুনে
৫৫৪.৪—রানির গর্ভে বানরের জন্ম

ইউ

১০—বিচার ও অবিচার

১৩৬.১—অসন্তুষ্ট মানুষ কাজ বদল করে অসন্তোষ বাড়ায়

ডব্লিউ

১১১—কুঁড়েমির প্রতিযোগিতা

১১১.১.১—পি-পু-ফি-শু

১১১.১.১.৩—কত রবি জ্বলে কেবা আঁখি মেলে

এক্স

১০—নানারকম রসিকতা

১১১—কালাদের কথোপকথন

৩৭২.৩—পেটের অসুখে চোখের ওষুধ দেওয়া

৯০০—মিথ্যে বলে হাসানো

১০২০—বাড়িয়ে বলে হাসানো

১৫০৩—যে দেশে অসম্ভব যত কাণ্ড ঘটে

জেড

১১—যে গল্পের শেষ নেই

৩১.২.৩—কাকের মৃত্যু

৪১.২—শক্তিধর ও মহাশক্তিধর

৪১.১০—চড়াই ও কাক

৪৭.১—নাক-কাটা শেয়াল

৭১.৬—সংখ্যা : নয় লক্ষ ন'হাজার ন'শো নিরানব্বই

২০০—জাদুদ্বারা শত্রুবিতাড়ন